প্রসাদ।

(বিবিধ প্রবন্ধ।)

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

"Swedenborg's genius was the perception of the doctrine "that the Lord
's into the spirits of angels and of men ;" and all poets have signalized
r consciousness of rare moments when they were superior to themselves
when a light, a freedom, a power came to them, which lifted them to per-
rmances far better than they could reach at other times ; so that a religious
once told me that" "he valued his poems, not because they were his,
because they were not. He thought the angels brought them to him."
orals this is conscience ; in intellect, genius ; in practice, talent ;—
imitate or surpass a particular man in his way, but to bring out your
w way ; to each his own method, style, wit, eloquence." *Emerson.*

কলিকাতা,

মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, সমর্থকোষ প্রেসে, সেন এণ্ড সন্‌স্‌ দ্বারা মুদ্রিত, ও
২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, আনন্দ-আশ্রম
হইতে প্রকাশিত।

ফাল্গুন—১২৯৫ সাল।

উৎসর্গ।

শ্রদ্ধাস্পদ—শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ।

আর্য্য,

আপনার পবিত্র স্বভাবের মাধুর্য্য সংস্পর্শে এই পঙ্কিল পৃথিবীর অনেক মলিনতা দূর হইয়াছে ;—আপনার নিরহঙ্কার অমায়িক স্নেহমূর্ত্তি সন্দর্শনে অনেক জ্ঞানীর জ্ঞানগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে ;—আপনার ধর্ম্ম-জীবনের মধুর কীরণে হিন্দুসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। এ সকল স্মরণ করিলে পাপমগ্ন মলিন জীব আপনার নিকট অগ্রসর হইতে সাহস পায় না। কিন্তু আপনার অপরাজিত স্নেহ, সরলতা ও জাতীয় ভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের কথা স্মরণ করিলে, আপনার নিকটবর্ত্তী হইতে আর ভয় থাকে না। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিতে আপনি যেমন পুলকিত, এমন আর কে? বাঙ্গালা পুস্তক আপনি যেমন মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, এমন আর কে? এই সকল কথার জ্বলন্ত পরিচয় আপনার পত্রে পাইয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন যে,—"তুমি আমাকে পুস্তক উৎসর্গ করিবে,—আমি তোমাকে আমার হৃদয় উৎসর্গ করিলাম।" আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে এত ভালবাসেন যে, অতি সামান্য জিনিসের বিনিময়ে অমূল্য পদার্থ পুরস্কার দিতেছেন! আর্য্য, মহতের পক্ষে এ জগতে কিছুই অসম্ভব নয়।

আপনি একটী বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আপনি লিখিয়াছেন—"কিন্তু তোমার নির্ম্মল ও অকপট চরিত্র দেখিয়া আমি যে তোমাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি, তুমি বোধ হয় তাহা জান না।" এ আপনার কি অমার্জ্জনীয় ভ্রম! মহৎ ব্যক্তি সকলের মধ্যেই মহত্ত্ব দেখেন। এই জন্যই বোধ করি আপনার এই গুরুতর ভ্রম হইয়া থাকিবে। অথবা

আমি বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য যৎসামান্য চেষ্টা করিতেছি বলিয়া, অনুরাগ ও স্নেহের চক্ষে দেখার দরুণ বোধ করি এরূপ হইয়াছে। কেন যে ঐ কথা লিখিয়াছেন, আমি জানি না। কিন্তু ইহা জানি, দেশের অগণ্য লোক যাহাকে ঘৃণা করে, তাহাকে স্নেহের আলিঙ্গন দিয়া আপনি সময়ে সময়ে যে স্বর্গীয় মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, এ ভ্রম সে মহত্ত্ব-প্রসূত। আর্য্য, আপনার মহত্ত্ব দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়াছি।

আত্মহারা হইয়াছি বলিয়াই এই সামান্য বস্তু, এই অকিঞ্চিৎকর জিনিস আপনাকে উপহার দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিবর্ত্তে যদি আমার এই অসার হৃদয় আপনাকে উৎসর্গ দি, তবে তাহা আপনি লইবেন কি? না—আমি তাহা দিব কেন? আপনাকে আত্ম-ধন করিয়া হৃদয়ে চিরকাল পূজা করিতে পারিলেই কৃতার্থ হই। দিব ছাই, লইব সোণা;—ছাড়িব মাটীর অসার পুতুল, পূজিব—মহত্ত্বের খণি।

কিন্তু একটী কথা। "প্রসাদ" সংসার-মাটী হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহা দেব-প্রসাদ। বিধাতার কৃপায় যাহা পাইয়াছি, তাহাতে বিধাতার প্রিয়পুত্রেরই অধিকার। আপনি তাঁর প্রিয় পুত্র। প্রসাদ সেইজন্য আপনার। আপনার অধিকারের বস্তুই আপনাকে দিলাম।

আর আমিই বা কে? আমিও ত আপনারই; যাহাকে হৃদয় দিয়াছেন, আমিও ত সেই মলিন জীব। মলিন জীবের মলিন 'প্রসাদ' দেব-সেবায় লাগিলে কৃতার্থ হইব।

স্নেহ-ভিখারী—

দেবীপ্রসন্ন—

আনন্দ-আশ্রম।
ফাল্গুন—১২৯৫।

স্মূচী।

প্রসাদ

(বিবিধ প্রবন্ধ।)

পুনরুত্থান।

"Every man is not so much a workman in the world, as he is a suggestion of that he should be. Men walk as prophecies of the next age." *Emerson.*

যাহা সীমাবদ্ধ, জগতে তাহার আদর অল্প। যাহা জানিয়া ফেলিয়াছে,—জানিতে আর কিছুই বাকী নাই; তাহা লইয়া মানুষ ঘরকন্না করিতে ভাল বাসে না। এটী, ওটী, সেটী—এ সকল পুরাতন জিনিস, চির-পরিচিত,—এ সকল লইয়া মানুষ মজিয়া থাকিতে চায় না। * তার মন যেন সদাই কিছু নূতন, কিছু অনায়ত্ত, কিছু অদৃষ্ট বস্তু দেখিতে চায়। পুরাতনের ভিতরে যতদিন নূতনত্ব থাকে, তত দিন পুরাতন আদরের। পুরাতনের নূতনত্ব যখন বিলুপ্ত হয়, তখন পুরাতন তিরোহিত হয়। আবার নূতনের অনন্তত্ব যখন হ্রাস হয়, তখন আবার নূতন, আবার নূতন, আবার নূতনের উত্থান বা আগমন সম্ভব হয়। একটী লোক যেখানে আসিয়াছে, সেখানে আর একটী লোক আসিবেই আসিবে। একটী ঘটনা যেখানে ঘটিয়াছে, সেখানে আর একটী ঘটনা ঘটিবেই ঘটিবে। একটী দল যেখানে গঠিত হইয়াছে, সেখানে আর একটী দল গঠন অপরিহার্য্য। কারণ, এক জিনিস চিরকাল নূতন থাকে না। লোকের পর লোক, ঘটনার পর ঘটনা, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর, প্রকৃতিতে পুরাতনের পর এ সকল নূতন যে চক্রাকারে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, আসিতেছে, ইহার ভিতরে স্বষ্টির অসীম অনন্তভাব বিকশিত। পুরাতন, নূতনের জন্য চিরদিন পথ পরিষ্কার করিতেছে। অথবা এক দিন যাহা পুরাতন ছিল, তাহাই আবার সময়ে নূতন হইয়া আসিতেছে। আকাশের চাঁদ চিরদিন হাসে, কিন্তু নিত্য নূতন হাসে। এক দিনের হাসি আর এক দিন নাই। চাঁদের জ্যোতি প্রত্যহই কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। কোকিল প্রতি বসন্ত ঋতু-সমা-

* "Men cease to interest us when we find their limitations." *Emerson.*

গমে দিক পূর্ণ করিয়া মধুর ডাক ডাকে, কিন্তু সে ডাক, যতবার শুনি, ততবার যেন নূতন। পুরাতন যাহা—তাহা মৃত, তাহা অতীত, তাহা অনাদৃত, তাহা উপেক্ষিত। পুরাতনে যেখানে নূতনত্ব বিদ্যমান, সে পুরাতনে মাধুর্য্য আছে, অমৃত আছে, ভালবাসার জিনিস আছে। রাধিকার কাছে শ্যাম-বাঁশরী নিত্য নূতন তানে গান গায়। ঐ বাঁশরী যদি অনন্ত নূতনত্ব ধারণ করিতে না পারিত, রাধিকার সাধ মিটিত, পিপাসা চিরদিনের তরে মিটিত। কিন্তু বাঁশী যে নিত্যই নূতন গায়। ফুল যে নিত্যই নূতন রূপ ধরে। পাখী যে নিত্যই নূতন তান ধরে। নূতন মানুষের কাছে সকলই নিত্য নূতন। মানুষও প্রকৃতির সহিত প্রতি নিমিষে নূতনত্ব পায়। পুরাতন মরিয়া গিয়াছে—সীমা ডুবিয়া গিয়াছে—ঐ দেখ অনন্ত নূতন জগতে অনন্ত নূতনত্ব প্রভাত-অরুণের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত। পুরাতনের শেষ যাহা, নূতনের আরম্ভ তাহাই। যাই আরম্ভ, অমনি নূতন পুরাতনে গড়াইয়া পড়িল। তাই মানুষ অসীম অনন্ত নূতনত্বের উপাসক।

ছোট শিশু কথা বলে না, কেবল মুখ ফুটিয়া হাসে, হামাগুড়ি দিয়া চলে। দেখিতে দেখিতে তার সে রূপ তিরোহিত হইল। সে এখন আধ ভাষায় কথা কয়, সে এখন পা ফেলিয়া চলে। এ দিনও তার থাকে না। দেখিতে দেখিতে সে যুবক, সে প্রৌঢ়, সে বৃদ্ধ, ক্রমাগত নূতন হইতে নূতনতর জগতে যাইতে যাইতে শেষে আরো নূতন হইয়া অনন্ত জগতে মিলাইয়া অদৃশ্য হইল। এত দ্রুত গতিতে শিশু নানা অবস্থা অতিক্রম করে যে, জনক জননীর তাহা দেখিয়া আর সাধ মিটে না। মিটুক বা না মিটুক, কালের কাছে সে হিসাব নাই। সে অবস্থার পর অবস্থা, ঘটনার পর ঘটনা তুলিয়া কি যেন একটা করিবেই করিবে। কি ব্যাপার!!

এই যে মানুষ অবস্থার পর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাকে লোকে ক্রমোন্নতি বলে। কিন্তু এই ক্রমোন্নতি নিরঙ্কুশ নহে। ইহাতে অনেক বাধা বিঘ্ন আছে। মানুষের নিমিষে নিমিষে মহাপতন হইতেছে। মানুষের অন্তর-জগতের পরতে পরতে পাপের লেখা, সয়তানের কালীর দাগ রহিয়াছে। কত দাগ, কত পাপ! পৃথিবী যেন পাপেরই ক্রীড়া-স্থল! মানুষ যেন মানুষ নয়। কেবল পাপ, কেবল পতন, কেবল যেন কি বিভীষিকা! মানুষ চায় উঠিতে, কিন্তু তার পা ভাঙ্গা, সে অবস্থার দাস,

উঠিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে পাপ তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। পাপ লইয়া তার ঘরকন্না, পাপ লইয়া তার জীবন ধারণ। তার রূপ কত কদর্য্য, কত মলিন। মদ্যপায়ী ব্যভিচারী আর কত পাপ করে; অন্তরের ভিতরে মানুষ হিংসা বিদ্বেষ ও কূটবুদ্ধির তাড়নায় যে কত জঘন্য কাজ করে, তার আর পরিমাণ করা যায় না। যে লোক এই রূপ মহা পতনের ভিতরে পড়িয়াছে, সে কি আর উঠিবে না? উঠিবে বই কি। ভাল অবস্থার পরও মন্দ অবস্থা ঘটে, মন্দ অবস্থার পরও ভাল অবস্থা উপস্থিত হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তন, প্রকৃতির নিয়ম। এক অবস্থা চিরকাল থাকিবার নয়। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যার খুব পতন হইয়াছে, এক দিন তার আবার খুব উত্থান হইবে। মেঘের পর রৌদ্র খুব তীব্র। দুঃখের পর সুখ বড় মধুর, পতনের পর উত্থান বড় আশাপ্রদ। নিজের শক্তিতে আর কুলায় না, এ বোধ জন্মিলে অন্য শক্তির উপর আত্ম-নির্ভর করা স্বাভাবিক। এই জন্য কি তবে মানুষের পতন হয়? আমরা তাহা জানি না। কিন্তু ইহা জানি, দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপিয়া কৈকেয়ীর মনে যদি রামচন্দ্রের প্রতি বিরক্তির কারণ উৎপাদন না করিত, তবে রাবণ মহা-দস্যুর নিপাত হইত না। কিম্বা কৈকেয়ী শেষ জীবনে মাতৃস্নেহরূপিণী হইতে পারিতেন না। জানি, যদি সেই ইহুদীজাতির স্কন্ধে দুষ্ট বুদ্ধি স্থান লইয়া বিদ্বেষভাব উৎপন্ন করত মহামতি ঈশার রক্তপাতের কারণ না জন্মাইত, তবে বুঝি বা খ্রীষ্টধর্ম্মের উন্নতিতে ঐ জাতি এত পূজিত হইত না। মানুষ নিজের বুদ্ধিতে বা শক্তিতে চলিতে চলিতে যখন বুঝে যে, তাহার মহা পতন হইয়াছে, আর উঠিবার শক্তি নাই,—তখনই অনুতাপ উপস্থিত হয়। তখন নিজের শক্তি ভুলিয়া বিশ্বেশ্বরের মহাশক্তির উপর নির্ভর করে। তার পর তাহার উদ্ধার হয়। দস্যুশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির উত্থান এবং জগাই মাধাইর উদ্ধার, মহা পতনের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই হিসাবে দেখা যায়, পতনই উত্থানের সোপান। মানুষের পতন দেখিয়া মানুষ সতর্ক হয়। অথবা মানুষের পতন ধরিয়া মানুষ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। পতন ও উত্থান—তবে দুই কি প্রকৃতির নিয়ম?

অদ্বৈতবাদীরা পতনকে পতন বলিয়া বুঝেন না। তাঁহারা বলেন, 'পতন, উত্থানের সোপান, সুতরাং লীলাময়ের লীলা মাত্র। ঘোর-ফের বা উঁচু-নীচু বোধ, এ সকল বিকার-গ্রস্ত মানুষের বিকৃত মনের বিভিন্নরূপ

চিন্তার ফল। বাস্তবিক প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটনা,—সকলই ভাল; মন্দ বা অসৎ সৃষ্টিতে কিছুই নাই।" আমরা এ কথা স্বীকার করি বা না করি, স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সুখকে আরো মিষ্ট করিবার জন্য দুঃখের সৃষ্টি, আলোককে আরো প্রিয় করিবার জন্যই আঁধারের সৃষ্টি,—ধর্ম্মকে আরো মধুর করিবার জন্য অধর্ম্মের সৃষ্টি। মানুষকে আরো নির্ভর শিখাইতে, অধীনতার মহাজালে ঘেরিবার জন্য স্বাধীনতা-রূপী ক্ষুদ্র মানব-শক্তির বিকাশ। পাপ অধর্ম্ম না থাকিলে পুণ্য ও ধর্ম্মের আদর বাড়িত না। অথবা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে চির নবীন করিয়া রাখিবার জন্যই এত বিরোধী ঘটনা ও অবস্থার সমাবেশ। যে ব্যক্তি সকল ঘটনার ভিতরে বিশ্বেশ্বরের ভাব দেখে না, তার পক্ষে পুরাতনের দাস হইয়া থাকাই ভাল। সে দ্বৈতবাদী।

তুমি বা আমি, কার ভিতরে বল ত পতন নাই? বল ত কে চির পুণ্যবান? মানুষ অসম্পূর্ণ জীব। অসম্পূর্ণ করিয়া, একটু স্বাধীনতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যিনি, তিনিই মানুষের ভিতরে পতনের অঙ্কুর রোপণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি অন্ধ জড়ের ন্যায় মানুষকে চালাইতেন, তবে মানুষকে এত দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। এই চক্ষু কেন কু দেখে, এই হাত কেন মন্দ কাজে রত হয়, এই প্রাণ কেন অধর্ম্মে মাতে? এ গভীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সোজা কথা নয়। তিনি কেন মানুষকে এ সকলের অতীত করিয়া পবিত্র প্রেম-পুণ্যে চির উজ্জ্বল করিলেন না? সৃষ্টির এ প্রহেলিকা কে উন্মোচন করিতে সক্ষম? যাহা ঘটিতেছে, তাহা কেন অন্যরূপ ঘটে না,—চন্দ্র সূর্য্য কেন পশ্চিমে উদিত হয় না, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। তোমারও কথা শুনিবে না, আমারও কথা নয়, সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমেই ঢলিবে; পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগই করিবে; মানুষ রূপজ মোহে ভুলিয়া ধর্ম্মের বিনিময়ে অধর্ম্ম ক্রয় করিবেই করিবে। সাধ্য কি, মানুষ তুমি এই বিধানের অন্যথা কর;—এই গতি-স্রোত ফিরাও? কাহারও সে সাধ্য নাই। বিধাতা যাকে মারেন, তাকে রাখে কে? বিধাতার ইচ্ছা না হইলে, মানুষের সে সাধ্য নাই। কিন্তু বিধাতা কি মানুষকে অনন্ত নরকে, অনন্ত মরণে চিরকাল ফেলিয়া রাখেন? না—তাহাও অসম্ভব।

সূর্য্য পশ্চিমে ডোবে, পতঙ্গ আগুনে পুড়িয়া মরে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ,

আমরা যাহাকে পশ্চিম বলি, আমেরিকাবাসীরা তাহাকেই পূর্ব্ব বলে। আমরা আগুন আগুন বলিয়া ভয় পাই, কিন্তু ঐ পতঙ্গের নিকট ঐ আগুন যে স্নিগ্ধ নয়, তাহাই বা কে বলিতে পারে? সূর্য্য আমাদের নিকট যখন অস্তমিত, পৃথিবীর অন্য ভূভাগে তখন নবোদিত। অবস্থা, ঘটনা সম্বন্ধেও কি ঠিক এই রূপ নয়? একজন পড়িতেছে, সেই পতনের ভিতর হইতে আর এক জনের উত্থান হইতেছে। যে ডুবিল, সে আর একবেশে আর এক জগতে উঠিতেছে। পুণ্যাত্মা যে ছিল, সে পাপে ডুবিয়াছিল,—আবার পুণ্যবান হইয়া উঠিতেছে। ঐ পতনই তাহার উত্থানের কারণ হইতেছে। এ কথা যে না বুঝে, তাহাকে আর বুঝান যায় না। পাপ পুণ্য, আলোক আঁধার, পতন উত্থান—এ সকল অবস্থাগত মন-বিকারের ভিন্ন ভিন্ন রুচির পরিচয় মাত্র, বা বিভিন্ন অবস্থার নামকরণ মাত্র। প্রকৃত প্রেমিক কোনটাকে ভাল, কোনটাকে মন্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। প্রকৃত প্রেমিকের নিকট বিষ্ঠা চন্দন উভয়ই আদরের। অদ্বৈতবাদী বা যোগী ভিন্ন আর প্রেমিক নাই।

যতদিন মানুষ সংগ্রাম করে, ততদিনই পাপ-পুণ্যের অবস্থা। আমিত্ব-বোধ যতদিন, প্রকৃতি-বোধ যতদিন, সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে পৃথক-রূপ-দেখা-বোধ যতদিন, তত দিন মানুষ মহা মোহে নিমগ্ন। সে ততদিন একবার এটা করে, একবার সেটা করে। অথবা মানুষ যতদিন নিজে কর্ত্তা, তত দিনই পাপ করে। একবার উঠে, একবার বসে। তখনও মানুষ প্রেমের জগত হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে। তখন মানুষ মনে করে সে, যাহা করি, সমস্তই আমি করি। তখন মানুষের কতবার পতন, কতবার উত্থানের গণনা করা যায়। কত তরঙ্গ, কত আন্দোলন, কত বিভীষিকাপূর্ণ বিভিন্ন স্রোত জীবন-নদীতে। কিন্তু আন্দোলিত হইতে হইতে যখন এই নদী অকূল মহাসাগরে যাইয়া উপনীত হয়, যখন ইহার পৃথক অস্তিত্ব সেই অনন্ত সাগরে মিলিয়া গিয়াছে,—তখন আর বিভিন্নতা-বোধ নাই,—দিক নাই, কাল নাই,—মহা নিরাকারে সব নিরাকার করিয়া ফেলিয়াছে। জলে জলাকার। একে একাকার। এইরূপে যখন মানুষ সেই বিশ্বাধাররূপী অনন্ত-শক্তি-সাগরে আপন ইচ্ছাশক্তিকে বিসর্জ্জন দেয়, আমিত্ব-বোধ যখন তিরোহিত হয়, পিতাপুত্রে যখন মিলন হয়, তখনই অদ্বৈত-জ্ঞান বা অভেদাত্মক প্রেমের উদয় হয়। তখনই মানুষের ভব-বন্ধন মুক্ত হয়।

তখনই মানুষের প্রকৃত উত্থান হয়। সে উত্থানের পর মানুষ আর পতনে ডুবে না। সেই উত্থানই প্রকৃত উত্থান। সংসার-ক্রুশ-কাষ্ঠে রক্তাক্ত পাপ-ইচ্ছা-রূপ-দেহ পরিত্যাগ করিয়া ঈশা অনন্ত জগতের অনন্ত ইচ্ছা-শক্তিতে বিলীন; বিন্দু—মহাসিন্ধুতে একীভূত—বিমিশ্রিত। তিনি এখন খ্রীষ্ট। তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা আর এই পাপ পৃথিবীতে নাই। তাঁহার পক্ষে পাপকার্য্য করা এখন অসম্ভব; কারণ, তাঁহার নিজের ইচ্ছা উড়িয়া গিয়াছে। এক মহৎ ইচ্ছাতে তাঁহার ক্ষুদ্র ইচ্ছা মিশিয়াছে। বুদ্ধের নির্ব্বাণ-মন্ত্রের অর্থ ইহাই। রাধিকার শ্রীকৃষ্ণ-মিলনের অর্থ ইহাই। এক-বোধ, এক-ধ্যান, এক-জ্ঞান, এক-মন্ত্র, এক-শিক্ষা, এক-প্রাণতা লাভ করিতে না পারিলে উত্থান পতনে সমজ্ঞান জন্মে না,—সতের বিকার দেখিয়া প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, মহামায়ার ছলনে পড়িয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা করে। প্রকৃত প্রেমের উদয় তখন, যখন তন্ময়-জ্ঞান জন্মিয়াছে। দ্বৈতবাদীর জ্ঞান আছে, কিন্তু প্রেম নাই; কর্ম্ম আছে, মুক্তি নাই; আসক্তি আছে, বৈরাগ্য নাই; পাপ আছে, পুণ্য নাই। কিন্তু প্রথম অবস্থায় দ্বৈতজ্ঞান মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। প্রথম জ্ঞান মানুষের "আমি জ্ঞান"। "আমি জ্ঞানের চরমোৎকর্ষের অবস্থায় "তিনি জ্ঞান"। "আমি" রূপ নদী বহিয়া বহিয়া সেই অকূল অসীম অনন্ত "তিনি" সাগরে ডুবিতে হয়। প্রথমে মানুষের পাপ-পুণ্য-বোধ, উত্থান-পতনবোধ, ভেদাভেদ-বোধ, নানা-বোধ সম্ভব। কিন্তু তখনও প্রেম অনেক দূর। এই নানা বোধ যখন এক-বোধে পরিণত, এক ভিন্ন যখন মানুষের আর অন্য কোন বোধ বা অন্য কোন রূপ জ্ঞান থাকে না, তখনই অদ্বৈত প্রেমযোগে মানুষ যোগী হয়। তখন মানুষ ক্রমাগত দেবত্বে উঠিতে থাকে—আর নামে না। তখন আর পতন নামে কোন কথা নাই। তখন আর আয়ানের ভালবাসার মায়ায় রাধারাণী ফেরে না; তখন আর শিষ্য-গণের মন রাখিবার জন্য খ্রীষ্ট ক্রুশ হইতে অবতরণ করেন না। তখন কৃষ্ণ-যমুনায় রাধা-রাণী ঝাঁপ দিয়া কৃষ্ণময়ত্ব লাভ করিয়াছেন; খ্রীষ্ট তখন ঈশ্বর-ময়ত্বে উত্থিত হইয়াছেন। রাধিকা এখন কালরূপ দেখিলেই কৃষ্ণকে দেখেন। এখন যাহা দেখেন, তাহাতেই কৃষ্ণের রূপ। কৃষ্ণময় ভুবন। কৃষ্ণই মরণ, কৃষ্ণই জীবন, কৃষ্ণই সুখ, কৃষ্ণই দুঃখ। কৃষ্ণময়ী রাধিকা এখন অনন্ত প্রেমতটিনীর উপকূলে পৌঁছিয়াছেন। আত্ম বিসর্জ্জন প্রেমের আরম্ভ, একাত্মক-বোধ প্রেমের পরিণতি। ভক্তি এবং

ভগবানে কি পার্থক্য, এ দেশের মানুষ তাহা বুঝে না। এ দেশের লোক ভক্তিকেই ভগবানের অবতার বলিয়া চিরকাল পূজা করিয়া আসিয়াছে। আর্য্যভূমিতে ভগবানের দ্বাদশ অবতার এই জন্য শোভা পাইয়াছে। বাস্তবিক ভক্তি যেখানে, সেই খানেই ভগবান। নর-হরি, গৌর-হরি, প্রকৃত সাধক এ সকল কথাকে উড়াইয়া দিতে পারেন না।

যতদিন সেইরূপ তিনি-বোধ না জন্মে, ততদিন মানুষের পাপ-বোধ, উত্থান-পতন-বোধ, ভালমন্দ-বোধ,—এ সকল বোধের শেষ নাই। মানুষ আদিতে দ্বৈতবাদী না হইয়াই পারে না। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই আদিতে দ্বৈতবাদী ছিলেন, শেষে অদ্বৈতবাদিত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টের কথাই বল, আর চৈতন্যের কথাই বল, শাক্যের কথাই বল বা মহম্মদের কথাই বল, সকলেই দ্বৈতবাদের ভিতর দিয়া অদ্বৈতবাদে পৌঁছিয়া প্রেমযোগে মহাযোগী হইয়াছিলেন। আমরা দ্বৈতবাদী। আমরা পাপ গণি, পুণ্য গণি, ধর্ম্ম অধর্ম্ম—এ সকল গণনা করিয়া বৎসরের পর যেমন বৎসর যায়, আর হিসাব পত্র নিকাশ করি। এখনও আপন-পর-বোধ, এখনও লাভালাভ-গণনা করিয়া নাচি কিম্বা কাঁদি। এখনও আমরা ফলবাদী। দ্বৈতবাদীও যাহা, ফলবাদীও তাহা। এটা করিলে এরূপ হইবে, সেটা করিলে ঐ রূপ ধরিবে, এই চিন্তাতেই আমাদের বৎসর আসিল, বৎসর যাইল। সংসার, টাকা কড়ি, আত্মীয় পরিজন, সুখ দুঃখ, আদর তিরস্কার, এইরূপ কত অসার ভাবনা ভাবিয়া আমাদের দিন যাইতেছে। একবার উঠি ত দশবার পড়ি, দশবার পড়ি ত আবার দশবার উঠি। উচু-নীচু বোধ হাড়ে মাংসে জড়িত। অহঙ্কার সর্ব্ব দেহে। আপন-পর-ভেদাভেদ-জ্ঞান প্রাণময়। তাই পুরাতন এবং নূতনের ব্যাখ্যা, বা বৎসরের হিসাব গণিতেছি। কিন্তু এইরূপ করিতে করিতে, এই রূপ যাইতে যাইতে এমন দিন আসিবে—যে দিন তিনিময় হইব। তিনিময় হইবে তুমি;—তিনিময় হইবে ভুবন। সে দিন আশীর্ব্বাদ ও তিরস্কার সমান হইবে। তখন তিনিময়ত্বে ঝাঁপ দিয়া এমন উন্নতির রাজ্যে চলিয়া যাইব, যেখানে হিংসা বিদ্বেষ, জ্বালা যন্ত্রণা, পাপপুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, এ সকল কিছুই নাই, কেবল তিনি আছেন। অখণ্ড সচ্চিদানন্দে চিরনিমগ্ন হওয়াকেই পুনরুত্থান কহে। কিন্তু আমাদের জীবনে সে দিন, সে অবস্থা কবে ঘটিবে, কে জানে? কে জানে, কবে আমরা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরে

নিমগ্ন হইয়া অচ্যুতপদ লাভ করিব? কে জানে কবে, আমাদের প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত উত্থান লাভ হইবে। কে জানে কবে আমরা কর্ত্তাগিরি বা বালকের খেলা ছাড়িয়া সেই অনাদি অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় দেবতার চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া বিনীতভাবে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য, বা তাঁর ইচ্ছা পালনের জন্য অম্লানচিত্তে আপন স্বার্থ মমতা পরিহার করিয়া বৈকুণ্ঠধামের যাত্রিক হইব? কে জানে, কবে!! কিন্তু এই পতনের অবস্থাই যে অখণ্ড আনন্দের পূর্ব্বাভাস, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সে বিষয়ে যার সন্দেহ, সে কি লইয়া পৃথিবীতে থাকিবে! এই মায়ার ভিতরে আশার বাণী শুনিয়াই আমরা জীবিত রহিয়াছি। নচেৎ জগতের এই উন্নতির দিনে এত হীনাবস্থায় আমরা জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না;—করিতাম না। পতনেও যে মানুষ জীবন ধারণ করে, সে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা বই আর কি? পতনই পুনরুত্থানের পূর্ব্বাভাস। পতন স্মরণ করিয়া মানুষ অনুতপ্ত হও, নিশ্চয় পুনরুত্থিত হইতে পারিবে।

অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম।

"সবাই এক মায়ের ছেলে, কারে দেব ছেটে ফেলে
ভাই বলে সকলেরে হৃদয় মাঝে দিব ঠাঁই।"

চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ধর্ম্ম মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করা কিছু সোজা কথা নয়। এতদ্ভিন্ন আরো কত মত অপ্রচারিত রহিয়াছে। আকাশের নক্ষত্র এবং পাতালের বালুরাশির পরিমাণ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মানব সমাজের বিভিন্ন ধর্ম্ম মতের পরিমাণ হয় না। সংখ্যাতীত ধর্ম্মসম্প্রদায় এ জগতে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এত বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতের বিদ্যমানতা সত্বেও, সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই আশা করেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মমতই জগতের ভাবী ধর্ম্মমত হইবে। কথাটা আরো একটু স্পষ্ট করিয়া লিখি। খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিশ্বাসীগণ মনে করেন, জগতের সকলেই খ্রীষ্টিয়ান হইবে, মুসলমানেরা মনে করেন, জগতের ভাবী ধর্ম্ম ইস্লাম ধর্ম্ম। হিন্দু মনে

করেন, হিন্দু ধর্ম্মই জগতের সার ধর্ম্ম, বৌদ্ধ মনে করেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মই এক মাত্র সত্য ধর্ম্ম। যে যে মত মানে, সেই মতই জগতের ভাবী মত হইবে, স্বতঃ এবং পরতঃ ইহাই তাহার প্রাণগত বিশ্বাস। জগতে যখন যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত, বা প্রচারিত হইয়াছে, তখন সেই ধর্ম্মকেই সত্য ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মিথ্যা জানিয়া কেহ কোন ধর্ম্মমত মানে না। সুতরাং সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট আপনাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতই সত্য ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা থাকা সম্ভব। অতএব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, সকল ধর্ম্মই লোক বিশেষের নিকট সত্য ধর্ম্ম। সকল ধর্ম্মই যদি সত্য ধর্ম্ম হয়, তবে কোন্ ধর্ম্ম জগতের ভাবী ধর্ম্ম? কোন্ মত সকল মতকে উপেক্ষা বা পরাস্ত করিয়া জগতে স্থায়িত্ব লাভ করিবে? একথার উত্তর দেওয়া বড় সোজা নয়।

মানুষ বড়ই কল্পনার উপাসক। কল্পনার উপর পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম্ম-মত প্রতিষ্ঠিত। এই কল্পনাটা পৃথিবীতে অনেক স্থানে বিশ্বাস নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। যুক্তি তর্ক—এ সকল যা কিছু বল, এ সকল অধিকাংশ স্থলেই কল্পনার সহচর। তুমি খুব যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছ, পরকাল আছে; আর এক জন ততোধিক যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছেন যে, পরকাল নাই। একজন খুব যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছেন, ঈশ্বর আছেন, আর একজন ততোধিক যুক্তি সহকারে বলিতেছেন যে—ঈশ্বর নাই। একজন খুব যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিতেছেন, পূজা বা উপাসনার আবশ্যকতা আছে, আর একজন ততোধিক যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিতেছেন যে, পূজার প্রয়োজন মোটেই নাই। কার কথা সত্য বলত? যুক্তি উভয়েরই সমান তেজপূর্ণ, কেহ কাহাকে হটাইতে পারেন না। নিজের মনকে প্রবোধ দিবার জন্য, যিনি যাহাই মনে ধরিয়া লউন না কেন, যুক্তি তর্কতে লোকদিগকে হটান বড়ই শক্ত। আমি মনে করি, তুমি হটিতেছ, তুমি মনে করিতেছ, আমি হটিতেছি। সচরাচর এইরূপেই হইয়া থাকে। বাস্তবিক কেহই হটিবার নয়, কেহই হটে না। অন্ততঃ লোকের বিশ্বাস এইরূপ। আপন মত লইয়াই সকলে বসিয়া থাকে। সে মতটা কি? অধিকাংশ স্থলেই আপনার কল্পনা-প্রসূত কিছু। কল্পনা ভিন্ন সারবস্তুও কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অতি বিরল। অধিকাংশ মানুষই কল্পনাকে লইয়া জীবিত। প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া, কষ্টি পাথরে কষিয়া লইয়া ধর্ম্মমত গ্রহণ করে, অতি অল্প

লোকে। ভাসা ভাসা ভাব, ভাসা ভাসা ধর্ম্মমত। কল্পনার ভিত্তি, বালির ভিত্তি। কল্পনা লইয়া মানুষ জন্মিতেছে, কল্পনার সেবা করিয়াই মরিতেছে। খাটী ধর্ম্ম পৃথিবীতে বড়ই বিরল।

কল্পনার ধর্ম্মও যাহা, পৌত্তলিকতাও তাহা। কল্পনার ধর্ম্মের আর এক নাম পৌত্তলিকতা। জগতের প্রথম অবস্থায় অধিকাংশ লোকই পৌত্তলিক ছিল। পৌত্তলিকতা বা কল্পনার ধর্ম্ম লইয়া মানুষ অনন্ত জীবনের পথে যাইতে পারে না, সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে ভয়ানক ধর্ম্ম-সংগ্রাম উপস্থিত হয়। মানুষের প্রাণের ভিতরে যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সমাজে কোন না কোন সময়ে তাহারই ফুটন্ত ছবি প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসের কথা যাহা শুনা যায়, সে সকল আর কিছুই নয়, সে সকল কেবল সত্যের সহিত কল্পনার সংগ্রামের ফুটন্ত কাহিনী মাত্র। সত্যের সহিত অসত্যের সংগ্রাম চির-কাল চলিতেছে, আজিও তাহার বিরাম হইল না। সার পাইবার জন্য মানুষ কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত করিয়াছে, কিন্তু আজিও সারধর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইল না। আজিও কল্পনার পূজাই অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। পৌত্তলিকতা যে পৃথিবী হইতে কবে যাইবে, কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না।

নিরাকার একেশ্বরবাদ কি পৃথিবীতে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই? হইবে না কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মই বল, আর ইস্লাম ধর্ম্মই বল, উপনিষদের ধর্ম্মই বল, আর শিক ধর্ম্মই বল—এসকলই খাটী একেশ্বরবাদে পরিপূর্ণ। কিন্তু এ সকল ধর্ম্মের অবস্থা আজ এরূপ পঙ্কিলময় কেন? কলঙ্কিত মানুষের হৃদয়ে স্বর্গের পবিত্র জিনিষ কেমনে খাটী থাকিবে? মানুষের ব্যক্তি-গত কল্পনা এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে স্থান পাইয়া সারকে কত মলিন করিয়া ফেলিতেছে, একবার চিন্তার চক্ষে চাহিয়া দেখ। সত্যে অসত্য, সারে অসার মিশ্রিত হইয়া কত কদাকার ধারণ করিয়াছে, ভাবিলেও কষ্ট হয়! কল্পনার এতই আধিপত্য।

আবার একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইতেছে, আবার নিরাকার ব্রহ্মের উপা-সনা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু এখানেও কল্পনা আসিয়া সত্যের স্থান অধিকার করিতেছে। তাই আবার দলাদলির সৃষ্টি হইতেছে। দল ভাঙ্গিতে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয় তাহা আবার নূতন নূতন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে! দলের মূল কোথায়? কেবল ব্যক্তিগত ভাবে। ব্যক্তিগত ভাব কি? না অনেক স্থলে কল্পনার সমষ্টি। কল্পনাটা কি? না মোহ; আসক্তি।

ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছাতেই পৃথিবীতে দলের অভ্যুদয়। এক ঈশ্বর, সকল শাস্ত্রে বলে; অথচ পৌত্তলিকতা জগতে থাকে কেন ?—এই জন্য যে, ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ক্রমাগত চলিতেছে। যার একটু ক্ষমতা, যার একটু প্রতিভা, সেই অন্যকে দলস্থ করিয়া আপনার মতে গ্রাস করিতে চায়। আপনার মত প্রচারের চেষ্টা ভাল কি মন্দ, সে কথা এখানে তুলিব না। কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলিব, আপন মতে না চলিলে অন্যকে অপদার্থ ভাবা বড়ই অন্যায়। এই অন্যায় হইতেই পৃথিবীতে দলাদলির সৃষ্টি হইতেছে। মানুষের প্রাণে ভগবান যে সত্য প্রচার করেন, সে জিনিস অনাবিল, অতি পবিত্র, অতি সুন্দর, অতি মনোহর। কিন্তু সেই পবিত্র স্বর্গের কুসুমে সংসারের মোহ ও আসক্তিরূপ কল্পনাকীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে গোপনে গোপনে মলিন করে। জগতে মানুষের দ্বারা যে সত্য প্রচারিত হয়, তাহা সেই মলিনতা মিশ্রিত জিনিস। অর্থাৎ স্বর্গের পবিত্র জিনিসের সহিত মানুষ আপন স্বাধীনতা অর্জ্জিত অনেক নরকের পূতিগন্ধময় কালিমা মিশ্রিত করিয়া জগতে ঢালে। এই উভয়ের সংমিশ্রণে ধর্ম্মমত নূতন আকার ধারণ করিয়া জগতে শোভা পায়। এক নিরাকার চিৎস্বরূপই যদি ধর্ম্মের প্রস্রবণ,তবে ধর্ম্মমত এত বিভিন্ন প্রকার কেন ? তাহার কারণ এই, সত্য জিনিস অসত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া কিছু নূতন হয়। এই নূতন কীর্ত্তি যখন জগতে যায়, তখন মনের গতির বিভিন্নতানুসারে তাহা জগতে বিভিন্ন রূপ প্রতীয়মান হয়। অথবা একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের দোষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখায়। খাটী ধর্ম্মমতের সহিত ব্যক্তিগত মত প্রচারের যদি এত চেষ্টা না হইত, তবে পৃথিবীতে এত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইতে হইত কি না, সন্দেহ। স্বর্গের ধর্ম্মমতের সহিত ব্যক্তিগত মত প্রচারিত হওয়াতে জগতের যে অনিষ্ট হইয়াছে, এ কথা বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বলিতে হইতেছে। ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত প্রভুত্ব প্রচারের চেষ্টাতে, খাটী জিনিসের সহিত অনেক স্থলে ব্যক্তিগত দূষিত মত বা কল্পনার খেয়াল মিশ্রিত হইয়া অন্য ব্যক্তির বিষম অনিষ্ট করিতেছে। এ কথা অনেকেই জানেন, মানুষ অন্যের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া চলিতে সর্ব্বদাই লালায়িত। বড় বড় লোকদিগের প্রচারিত মত অনেকেই শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছে। এইরূপ গুরুবাদ বা অবতার-বাদের সৃষ্টি হইতেছে। মানুষ আপনার চিন্তা ও বিবেকের কথায় জলা-ঞ্জলি দিয়া, অপরের প্রদর্শিত পথে অবনত মস্তকে চলিতেছে। এই হইতেই

দলাদলি ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতেছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শেসে কত ঝগড়া বিবাদ চলিতেছে। সে সকল কথা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

এইরূপে দেখিতেছি, ক্রমে ক্রমে পৃথিবী খাটী ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে আসিয়া সরিয়া পড়িয়াছে! নানা মত, নানা ভাব, নানা প্রণালী, নানা অনুষ্ঠান,—কোন্‌টা মানি, কোনটাকে উপেক্ষা করি, বল ত? যাঁহারা সত্যের সেবক হইতে চান, তাঁহারা এইরূপ বিষম শঙ্কটে পড়িয়াছেন। জগতে বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বাসহীনতা, নানা প্রকার সন্দেহবাদ মানুষকে বিষম আক্রমণ করিতেছে। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের প্রাণ সদা সশঙ্কিত, বুঝি বা ধর্ম্ম আর জগতে টিকে কি না! ধর্ম্ম-প্রচারকেরা হতবুদ্ধি হইয়া এই প্রবল স্রোতের সম্মুখে আপন শক্তির লঘুতা অনুভব করিয়া স্থিরভাবে সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন! এই আন্দোলনের ভিতরে আবার কত চটুল ব্যক্তি গোপনে গোপনে নূতন ধর্ম্ম মতদ্বারা নূতন দল গঠনে চেষ্টা পাইতেছেন! হা বুদ্ধি, তোমার সীমা কোথায়? দলে দলে পৃথিবী উচ্ছন্ন গিয়াছে। আবার দল!! পৃথিবীতে এক বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। জগত সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে সার ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা যাহা ভাবিয়াছি, নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, পৃথিবীর গতি ক্রমাগত স্বাতন্ত্র্যের দিকে চলিতেছে। পৃথিবীতে দলের পরে ক্রমাগত যে দলবৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতেও প্রমাণ করে যে, স্বাতন্ত্র্যই জগতের লক্ষ্য। অনন্ত প্রকৃতির সকলই বিভিন্ন, এ কথা আমরা অনেকবার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। সকলই পৃথক পৃথক, ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়াতেই সকলের যেন সৌন্দর্য্য ও বিশেষত্ব রক্ষা পায়। একটী গোলাপ তুমি দেখ একরূপ, আমি দেখি অন্যরূপ। তোমার ভাব, তোমার দেখা আমা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সকলই পৃথক পৃথক। বিভিন্ন বিভিন্ন শোভায়, বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকৃতিতে, সেই এক অনাদি অনন্তের অনন্ত সৌন্দর্য্য এবং অনন্ত রূপ প্রতিফলিত হইতেছে। পৃথিবীর কোন দুটী বস্তু একরূপ নয়। সকলের ভিতরেই যেন কিছু কিছু বিশেষত্ব রহিয়াছে। একটী ফুল অন্য ফুল হইতে বিভিন্ন. একটী মানুষ অন্য মানুষ হইতে বিভিন্ন। প্রতি বস্তুতে, প্রতি কীট পতঙ্গে কত আকাশ-পাতাল বিভিন্ন রূপ শোভা পাইতেছে। খুব ধীর ও সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্থিররূপে ধারণা হয়,

ভগবানের এই যেন বিধান যে, প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক পথে হাটিবে, প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক চিন্তার পথ ধরিবে। এই যে দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতা চলিতেছে, অনুসন্ধান কর, দেখিবে, ইহার ভিতরের লোকদিগের ধর্ম্মমতেও কিছু বিভিন্নতা আছেই—কিছু কিছু পার্থক্য আছেই। দুই জনের সকল মত একরূপ নয়। ইহার কারণ কি? মানুষ মানুষের সহিত মিলিয়া একমত হইয়া যাইবে, ইহা যেন বিধাতার ইচ্ছা নয়। বিধাতা প্রত্যেকের ভিতরেই যেন কিছু নূতনত্ব প্রতিনিয়ত ঢালিয়া দিতেছেন। প্রতিনিয়তই যেন বৈষম্যের ভেরী বাজিতেছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, পৃথিবীতে কোন একটা ধর্ম্ম মত চিরকাল স্থায়িত্ব লাভ করিবে না, সময়ের গতিতে সকলই নূতন হইবে। অনন্ত জড় প্রকৃতির যেমন অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত মানুষের তেমনি অনন্ত ধর্ম্মমত। সকলই ক্রমবিকাশের অধীন। এই যে দলাদলি, বোধ হয়, ইহাও থাকিবে না, অনন্তের তরঙ্গাঘাতে অনন্তে যাইয়া বিলীন হইবে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম উঠিয়া যাইবে এবং বিধাতার অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত স্বরূপে দীক্ষিত হইয়া সেই অনন্তের দিকে সকলে ধাবিত হইবে। কিন্তু সে দিন কবে আসিবে, কে জানে?

এইরূপই যদি হয়, তবে কি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত প্রচারের আর প্রয়োজন নাই? আছে, আবার নাইও। আছে, এই জন্য বলি, প্রকৃতির বিনাশ সাধন করিবার আমরা পক্ষপাতী নই। প্রকৃতির ভিতর দিয়া বিধাতার যে খাটী জিনিস বাহির হয়, তাহা হউক, বাধা দিতে বলি না। কিন্তু ব্যক্তিত্ব প্রচার না হয়। আবার নাইও, এইজন্য বলি, ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়া স্বর্গের মত প্রচার করা বড় কঠিন, অতি অল্প লোকেই তাহা পারে। বিশেষতঃ লোক ধরিয়া দল বাঁধিবার জন্য প্রচার করিলে কিছুই পুণ্য লাভ হয় না। লোক আসুক বা না আসুক, সেদিকে মানুষের লক্ষ্য রাখা উচিত নয়; লক্ষ্য এই—"বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" তিনি প্রচার করিতে বলেন, কর; কিন্তু অন্য কোন কারণ সম্মুখে রাখিও না। তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া যে চলে, ফলাফলের দিকে তার দৃষ্টি যায় না। আমি দল করিব? আমি বাহাদুরী দেখাইব—ছি, এ নরকের কথা দূর হউক। তাঁর যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হউক। বিশ্বাসী ব্যক্তির এইরূপ উক্তি। তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, জগতকে বিশ্বাসের পথে রাখিবেন, কেহ অবিশ্বাস-বিষ দিয়া প্রকৃতিকে জর্জ্জরিত করিতে পারিবে না। আর তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, সকলকে অবিশ্বাসী করিয়া

রাখিবেন, কাহারও শক্তি নাই, জগতকে বিশ্বাসের পথে স্থায়ী করিয়া রাখে"? প্রকৃত ধর্ম্মই এ নয়। তর্ক যুক্তি করিয়া যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস উৎপন্ন, তাহাই কল্পনার ধর্ম্ম। তিনি আপনি যদি মানুষের প্রাণে প্রকাশিত না হন, কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারে না। বিধাতার কৃপায় বিধাতাকে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া তাঁর প্রদর্শিত পথে চলাই প্রকৃত ধর্ম্ম। প্রকৃত ধর্ম্মে সমাজ নাই, দল নাই, ঝগড়া নাই, বিবাদ নাই, কিছুই নাই। আছেন,—প্রত্যক্ষ জীবন্তভাবে কেবল এক অবিনাশী সত্য পুরুষ। তাঁতেই সঞ্জীবিত, তাঁতেই নিমগ্ন, বিশ্বাসী সন্তান। তিনি উঠিতে বলিলে, ভক্ত উঠেন। তিনি বিপদে ফেলিলে, তাহাই ভক্তের নিকট স্নেহের আশীর্ব্বাদ। তাঁর কথা যে শুনে নাই, তাঁর সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, সেই ব্যক্তিই অন্যের প্রদর্শিত কল্পিত ধর্ম্মপথে চলিতে চায়, চলিতে পারে; কিন্তু যে তাঁকে দেখিয়াছে, তাঁকে যে প্রাণে পাইয়াছে, সে আর কাহারও কথা শুনিয়া বা কল্পনা লইয়া জীবন পথে চলিতে চায় না। সে প্রতিনিয়ত কেবল একের ইচ্ছাতেই ডুবিয়া থাকিতে চায়। সে আর কিছু জানে না, আর কিছু বুঝে না। বিধাতার ইচ্ছাকেই সে জয়যুক্ত হইতে দেখিতে চায়।

কিন্তু তাঁকে সকলে কিছু একভাবে পাইবে না। অনন্তরূপিনীর সকল স্বরূপ একজনে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে কি না, সন্দেহ। তিনি যাহাকে যা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহাই হইতে হইবে,—কাহাকে ভক্ত, কাহাকে জ্ঞানী, কাহাকে কর্ম্মী—কাহাকে সংসারী, কাহাকে সন্ন্যাসী ইত্যাদি। তিনি কাহাকে কি করিতেছেন, আমরা জানি না। সুতরাং কে তাঁর প্রিয় সন্তান, কে নয়, সে বিচারও আমারা করিতে পারি না। যাকে আমরা ভয়ানক পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতেছি, সে যে বিধাতার কৃপাস্রোতে পড়ে নাই, একথা আমরা মনে করিতে পারি না। সুতরাং তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখা উচিত নয়। লীলাময়ের অনন্ত লীলা, মানুষ কি বুঝিবে? অমুক বড়, অমুক ছোট, অমুক পুণ্যাত্মা, অমুক পাপী, এ সকল গণনা না করিয়া, আমাকে তিনি যে আদেশ করেন, তদনুসারে চলাই উচিত। তাঁর আশীর্ব্বাদ সকলের প্রতি। আমাকে উদ্ধার করিতেছেন, তোমাকে মারিয়া ফেলিবেন? না—এ বিশ্বাস আমরা রাখি না। তিনি সকলকেই উদ্ধার করিবেন। তিনি সকলকেই কৃপার হস্তে রক্ষা করিতেছেন। মোট কথা, তাঁর হাতের পুতুল হইতে না পারিলে, কিছুতেই মঙ্গল নাই। তাঁকে কে কি ভাবে পূজা করিবে,

কে কিরূপে দেখিবে, আমরা কিছুই জানি না। তিনি যাহার নিকট যেরূপে প্রকাশিত, মানুষ সেই রূপেরই পূজা করুক। অন্যথা করিলেই কল্পনার পূজা হয়। সাম্প্রদায়িকতা জগতের লক্ষ্য নয়, দলাদলিও লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য—এই অনন্ত স্বাতন্ত্র্য, এই অনন্ত দেবতার অনন্ত বিভিন্নস্বরূপে অনন্ত লোকমণ্ডলীর দীক্ষা। এই অনন্ত প্রকৃতি ভাঙ্গিয়া যিনি একত্ব সাধনে যত্নবান, তিনি যে বিধাতার লীলা-মাহাত্ম্যের কি ভয়ানক অনিষ্টকারী জীব, আজ জগত না বুঝিলেও এক দিন তাহা বুঝিবে। এই অনন্ত স্বাতন্ত্র্যের ভিতরেই এক-চিন্ময়ত্ব বিদ্যমান। মানুষ যখন তাঁতে নিমগ্ন হয়, তখন মানুষ সকল ঘটেই তাঁকে দেখে, অন্য কিছুই দেখে না। একমেবাদ্বিতীয়ম নামের গভীর সত্য তখনই উপলব্ধি হয়। তখনই মানুষ কল্পনা ছাড়িয়া, উপধর্ম্ম ছাড়িয়া, একের কোলে মাথা রাখিয়া অটল বিশ্বাসী হয়। তখন আর কেহকেই পর বলিয়া মনে হয় না, তখন সকলকেই একের হাতের জিনিস জানিয়া সে মধুরভাবে প্রেমালিঙ্গন করে। তখনই একতা এবং সাম্যের ভেরী প্রাণে বাজিয়া উঠে, তখনই জাতিভেদ উঠিয়া যায়। যত দিন তাহা না হয়, ততদিন পৌত্তলিকতা, উপধর্ম্ম, কল্পনার রাজত্ব এবং দলাদলি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি থাকিবেই থাকিবে। হাজার চেষ্টা করিলেও জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে না।

আমরা এই যে উদার জীবন্ত ধর্ম্ম মতের কথা বলিতেছি, ইহাকে যে কথায় অভিহিত করিতে চাও, কর, আপত্তি নাই। আমরা ইহাকেই অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া বুঝি। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম,—দলাদলির ধর্ম্ম নয়। দল ভাঙ্গিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি। দল ভাঙ্গিবার জন্য যে ধর্ম্মের অভ্যুদয়, স্বতন্ত্র দলে পরিণত হওয়া তাহার পক্ষে উচিত কি না, এই এখন প্রশ্ন। আমাদের বিবেচনায়, উচিত নয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ভাবে, যে রূপে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে ইহা দল গঠনেই যে অধিক মনোযোগী, ইহাই বোধ হয়। দল গঠনে মনোযোগী হওয়ায় ইহা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। এই এক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি হইতেছে। এখন এত দূর শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, এখন আদান প্রদান, আহারাদি সম্বন্ধেও বাদ বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষে নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য যে সকল সম্প্রদায়ের উত্থান হইয়াছিল,

কালে জাতিভেদের এক নূতন শাখায় তাহাদের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের মনে আশঙ্কা হয়, সময়ে এই ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাও বুঝি বা সেইরূপ হয়। উদারতা দিন দিনই লোপ পাইতেছে, তৎস্থানে দল গঠনের সঙ্কীর্ণ সামাজিকতা আসিয়া স্থান লইতেছে। বড়ই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। অহঙ্কার, আত্মাভিমান হাড়ে হাড়ে জড়িত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আকাশ হইতেও মহান, অতি পবিত্র, অতি সুন্দর। যাহার ভিতরে যাহা ভাল, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। পৃথিবীর যেখানে যে সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের। পৃথিবীর সমস্ত নর নারী—এই ধর্ম্মভুক্ত ;—এখন এবং অনন্ত কাল। আমি, তুমি, সে, সকলেই বিধাতার ইচ্ছা-স্বরূপ-সাগরে নিমগ্ন, সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে তাঁর ধর্ম্মে দীক্ষিত। শাক্ত, বৈষ্ণব, খ্রীষ্টান, মুসলমান, সকলেই কতক ব্রাহ্ম। ভেদাভেদ মানি না, ভেদাভেদ জানি না। একের ধর্ম্ম—বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ভাষার বিভিন্নতায় তাঁকে নানা জনে নানা কথায় ডাকিয়াছে, কিন্তু এক বই আর দুই নাই। সকল ডাকের লক্ষ্যই তিনি। তাঁর ধর্ম্মই জগতের ধর্ম্ম। এই উদার ধর্ম্ম অনন্তকাল ধরিয়া সেই উদার দেবতা প্রচার করিতেছেন। অনন্ত প্রকৃতিতে ইহা পরিস্ফুট। কেহই এ ধর্ম্ম ছাড়া নয়। অনন্ত দেবতার অনন্ত লীলা অনন্তভাবে প্রকৃতিতে পরিস্ফুট। যে ইহাকে নূতন দলরূপ গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ রাখিতে চায়, সে মূর্খ বই কি ? যে এই উদারধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়াও অহঙ্কারী হয় এবং পৃথিবীর অপর সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে, সে ভ্রান্ত বই আর কি ? ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম নয়—ইহা উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। পৃথিবীর সকলেই কোন না কোনরূপে এই ধর্ম্মভুক্ত। এক দেবতা জগন্ময়—এক ধর্ম্ম ভুবনময়। অনন্তের অনন্তত্ব, মহানের মহত্ব যে সম্প্রদায়ের গণ্ডিরমধ্যে নিবদ্ধ থাকিবার নয়, একথা আবার বলিতে হইবে কি ?—যে ব্যক্তি ইহাকে সম্প্রদায়ের নিগড়ে দলাদলির সঙ্কীর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে চায়, সে আজও ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মতে দীক্ষিত হয় নাই। মানুষ, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া অনন্ত দেবতার অনন্তলীলার পানে তাকাও, একবার হৃদয়পুরে প্রবেশ করিয়া তাঁকে চিনিয়া লও ; ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মতে তবেত মজিতে পারিবে। ছি, বালকের ধূলা খেলা, ঝগড়া বিবাদ লইয়া চিরকাল থাকিবে ? খুটী নাটী ছাড়িয়া এখন একবার অনন্ত-রূপিনীর অনন্ত স্রোতে ডুব দিয়া পবিত্র হও, সমাহিত হও। কল্পনা ছাড়িয়া একবার সারধর্ম্মের গভীরতায় ও উদারতায় নিমগ্ন হও।

ভালবাসা ও ভক্তি।

ভালবাসা এই দাবদগ্ধ সংসারের একটা উৎকৃষ্ট সৃষ্টি ;—বিষের সাগরের সুমিষ্ট ঢেউ, কণ্টকাকীর্ণ মৃণালে অতি কোমল, অতি মনোহর, অতি আশ্চর্য্য প্রস্ফুটিত পদ্ম। পঙ্কিল মানব হৃদয়ে ইহার উৎপত্তি বটে, কিন্তু ইহার সহিত তুলনা হয়, জগতে এমন জিনিস আর নাই। এই জিনিসটা যে কি, কোন কবি, কোন দার্শনিক তাহা আজ পর্য্যন্ত সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। পৃথিবীতে এই অত্যুত্তম জিনিসের যে সকল ব্যাখ্যা আছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে এই জিনিসের কিছুই সৌন্দর্য্য বাড়াইতে পারে নাই ; বরং ইহাকে নিষ্প্রভ করিয়াছে। ইহার প্রকৃতরূপ ব্যাখ্যা হয় না—ইহা চিন্তার অতীত, ভাবের অতীত, ভাষার অতীত, এক স্বর্গীয় মন্দাকিনী। এই পৃথিবীতে যে কিছুর ব্যাখ্যা হয়, তাহা পার্থিব ; যাহা স্বর্গীয়, তাহার ব্যাখ্যা হয় না। ভালবাসা সংসারের একটা আশ্চর্য্য সৃষ্টি।

স্বর্গের জিনিস হইলেও পৃথিবীতে কিন্তু এই ভালবাসার একটা অপবাদ আছে। অপবাদই বল বা বিকৃতিই বল। ভালবাসার নামে এখানে একটা প্রকাণ্ড ব্যবসা চলিতেছে। এই ব্যবসায়ে অবাধে ভালবাসা পণে স্বার্থ বিনিময় হইতেছে। ভালবাসা এখানে বিনিময়ের মূলধন ; আদান প্রদান হইতেছে—স্বার্থ। এই অমূল্য ধন এখানে খুব সস্তা। একটু হাসিয়া, একটু প্রাণ কাড়িয়া, একটু দাঁড়াইয়া মানুষ এখানে কেনা বেচা করিয়া আবার কোথায় নিমেষের মধ্যে সরিয়া পড়ে! এ বাজারে ভালবাসাটা যেন স্বেচ্ছার একটা খেয়াল বিশেষ ; নিমেষে আকর্ষণ, নিমেষে বিসর্জ্জন। নিমেষে মিলন, নিমেষে বিচ্ছেদ। নিমেষে আসা, নিমেষে যাওয়া। আজ তোমার ঘরে একটু সৌন্দর্য্য আছে, একটু সৎগুণ আছে, একটু লোকের দাঁড়াইবার ঠাঁই আছে, আজ তোমার ঘর লোকে লোকারণ্য, দলে দলে বান্ধব দল আসিতেছে, দলে দলে আসিয়া তোমাকে স্বর্গে তুলিতেছে, প্রশংসার স্তুতিবাদে আকাশ ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু হায়, বান্ধবদলের স্বার্থের পথে একটা বাধা দেও, হায়, নিমেষে পৃথিবীর ধূলি বালির খেলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর কেহ তোমার কাছে নাই ; তুমি যে একাকী, সেই একাকী। বন্ধুত্বের যে একটা স্থায়ী বন্ধনের শক্তি আছে, দিন দিন একথাটাও কাল্পনিক বলিয়া বোধ হইতেছে। বন্ধুত্বটা

এ সংসার বাজারে একটা বিনিময়ের ফন্দি বিশেষ হইয়া উঠিতেছে। স্থায়ী রূপে নিঃস্বার্থভাবে অতি অল্প লোকই অল্প লোককে ভালবাসে। দিন দিন ভালবাসাটা বড়ই চঞ্চল প্রকৃতির হইয়া উঠিতেছে—যেন পদ্ম পত্রের জল, যেন সৌদামিনীর কোলে ক্ষণবিদ্যুৎ, যেন উষ্ণ প্রস্তরে বারিবিন্দু। এই আছে, এই নাই। এই ছিল, এ তার চিহ্নও নাই। এই চঞ্চলতার ভিতরে থাকিয়াও, এত স্বার্থের ঝনঝনানি শুনিয়াও, মানুষ কিন্তু এই অমিয়া পিপাসায় কাতর। বার বার প্রতারিত হইয়াও মানুষ এই বাজারে পুনঃ পা ফেলে। স্বর্গের জিনিসের প্রতি কি মধুর আকর্ষণ! সুধা ভ্রমে গরল, স্বর্ণ ভ্রমে কাচ পাইয়াও, মানুষ স্বর্গের অমিয়ার আশা ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে না, বাঁচিতে চায়না। কোন কবি বলিয়াছেন—"ভালবাসার জন্য যে পাগল নয়, সে মানুষ নয়, সে পশু।" ভালবাসার প্রতি মানুষের কি সুন্দর টান!

আর একটী ছবি আছে। এই মর্ত্ত্যভবনে প্রকৃত ভালবাসার আকর্ষণ একটা সঞ্জীবনী শক্তি। ভালবাসা বিহনে কাহারও জীবন ধারণে ইচ্ছা থাকে না। ইচ্ছা থাকে না, তা নয়; মানুষ ভালবাসায় বঞ্চিত হইলে বাঁচিতে পারে না। দেখিয়াছি, কত স্ত্রী, স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া দিন দিন জীর্ণশীর্ণ হইতেছেন, অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে দিন দিন রক্ত মাংস ও তেজোহীন হইতেছেন! হায়, তারপর এই সংসারের সুখকে তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন! বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা মানুষের পক্ষে বড়ই অসহ্য। এরূপ অবস্থায় তাহারা ইচ্ছা-বর্জ্জিত জড়-প্রকৃতিক। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, এ বোধ তাহাদের থাকে না। ঐ একের জন্যই যেন তাহাদের জীবন, ঐ একের অভাবেই মরণ। এইরূপ কত সতী যে পতির দুর্লভ ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া, অকালে পৃথিবীর মায়া ছিন্ন করিয়াছেন, এই ভারতবর্ষে তাহার সংখ্যা হয় না। নিরাশ-প্রণয়ে স্ত্রীকুলের যে দুর্দ্দশা ঘটে, পুরুষ-কুলের সেরূপ না ঘটিলেও, দেখা গিয়াছে, রমণীর সুস্নিগ্ধ মধুর প্রণয়ে হতাশ্বাস হইয়া কতজন আত্মঘাতী হইয়াছেন। যাহাকে যে ভালবাসে, তার অদর্শন, তার মলিন বদন, তার অসুখ সে সহিতে পারে না। সেখানে নিমগ্ন ভাব। সেখানে আত্মবোধ-হীনতা। সেখানে অহং বলিতে কিছু নাই, সেখানে কেবল "সে"। সে আছে, তাই আছি। সে হাসে, তাই হাসি। তার মুখ খানি, পৃথিবীর আর সকলে কুৎসিৎ বলে, কিন্তু প্রণয়ীর নিকট এমন সুন্দর আর কিছুই নাই। সে মুখ

অতি সুন্দর, অতি সুন্দর। তার তুলনা নাই। এমন সুন্দর আর জগতে কিছুই নাই। জগৎই বা কোথায়? সেখানে জগৎ নাই, সেখানে কেবল ‘সে’। এক ভিন্ন দুই নাই। সেখানে আত্ম নাই, সেখানে জগৎ নাই, সেখানে কেবল ‘সে’। তার অভাবে প্রণয়ী বাঁচে না। ভালবাসা এই জগতে একটা সঞ্জীবনী শক্তি।

কেবল শক্তি? না, তা নয়। ভালবাসায় মুক্তি। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির প্রণয়ে বিমুগ্ধ। সেই প্রণয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য একত্রিত। একদা দারুণ ঝটিকা বহিতেছে, সন্ধ্যাকাল নিদারুণ বিদ্যুৎ চমকিতেছে। এমন সময়ে উত্তাল তরঙ্গময়ী নদী শবাশ্রয়ে উত্তীর্ণ হইয়া, ভীষণ বিষধরের লেজ ধরিয়া প্রাচীর পার হইয়া চিন্তামণির নিকট যখন বিল্বমঙ্গল উপস্থিত হইলেন, তখন চিন্তামণি অবাক। চিন্তামণিকে না দেখিলে তার দিন বৃথা যায়। বিল্বমঙ্গল অনিমেষ নয়নে চিন্তামণির মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সে দৃষ্টিতে পলক নাই। সেইরূপ অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি অমন করিয়া কি দেখিতেছ? চিন্তামণি বার-রমণী, বিল্বমঙ্গলের স্বর্গীয় গভীর প্রেমের মর্ম্ম বুঝে নাই, তাই জিজ্ঞাসা করিল, অমন করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া কি দেখিতেছ? বিল্বমঙ্গল উত্তর করিলেন, “তুমি কি বুঝিবে? জানি না, তুমি দেবী না রাক্ষসী, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর।” যে স্বরে, যে ভাবে, যে উন্মত্ততায় বিল্বমঙ্গল এই কথা কয়টী বলিলেন, তাহাতে চিন্তামণির চৈতন্য হইল, সে এতদিন পর বিল্বমঙ্গলের প্রণয়ের গভীরতা বুঝিতে পারিয়া বলিল,—“তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাসিয়াছ, এইরূপ যদি হরিকে ভালবাসিতে, তোমার ইহকাল এবং পরকালের মঙ্গল হইত।” ইহার পর প্রেম-বিহ্বল বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদের ন্যায় হরির অন্বেষণে বহির্গত হন, এবং শেষজীবনে রাখালরূপী হরিকে পাইয়া বিল্বমঙ্গল কৃতার্থ হন। সংসারের আসক্তিময় প্রণয় কিরূপ সুন্দরভাবে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিল! প্রেম কেবল শক্তি নয়, প্রেমই মুক্তির পথ।

এই আখ্যায়িকায় প্রণয়ের যে কি গভীরভাব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শত লেখনীরও তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। চিন্তামণিকে না দেখিলেই নয়—তাকে দেখিতে হইলে সাঁতার দিয়া একটা নদী পার হইতে হয়, খেয়া নৌকা নাই, সন্ধ্যা হইয়াছে;—ভীষণ সন্ধ্যা। আকাশে দারুণ মেঘ।

মেঘে দারুণ বজ্রনিনাদ, শিলাবৃষ্টি, প্রবল বায়ু—গভীর গর্জ্জন, এ সর্কল গণনা তোমার আমার নিকট। আমি তুমি মনে করিতে পারি বটে যে, চিন্তামণি বয়স্কা বেশ্যা, তেমন রূপ নাই, তেমন যৌবন নাই, মন মজাইতে পারে তাতে তেমন কিছুই নাই। কলঙ্কের উপর কলঙ্ক, তার উপর আরো কলঙ্ক। ঘৃণার উপর ঘৃণা, তার উপর আরো ঘৃণা। এসকল তোমার আমার গণনা। কিন্তু বিল্বমঙ্গল তন্ময়—তাঁর নিকট সংসারের ঝড়, বৃষ্টি, শিলা, তরঙ্গ-গর্জ্জন, বজ্রনিনাদ, এ সকলে ভয়ের কিছুই নাই। যে আপন-বর্জ্জিত, তার আবার ভয় কিসের? যাহার আপনার জ্ঞান নাই, এ পৃথিবীতে তার আর কিসের জ্ঞান আছে? বিল্বমঙ্গলের প্রাণ চিন্তামণিময়। ঐ প্রণয়ে, ঐ রূপে, ঐ কলঙ্কে, ঐ ঘৃণায় তিনি নিমগ্ন। তাঁর মরণের ভয় নাই। তাঁর জীবন ধারণেরও চিন্তা নাই। এক চিন্তা—চিন্তামণি! এই চিন্তামণিকে ভালবাসিয়া শেষে বিল্বমঙ্গল হরিভক্তিতে মাতোয়ারা হইতে পারিলেন। ধন্য প্রেম, ধন্য বিল্বমঙ্গল!

কিন্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এরূপ ভালবাসা মিলে না। পরন্তু আজকাল এই ভালবাসা বড়ই দুর্লভ। ভালবাসিত জনকে দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যাইতে,—তার কথা শুনিতে শুনিতে সংসার ভুলিয়া যাইতে, আজ কাল বড় দেখা যায় না। আজ কাল ভালবাসা একটা ব্যবসার ন্যায়। একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লোকেরা বলে, একজনকে ভালবাসিলে প্রাণের সকল অভাব পূর্ণ হয় না। দশটা বন্ধু বা দশটা স্ত্রী বা দশটা দেবতা চাই! কি ঘৃণার কথা! একজনকেও যে ভালবাসিতে পারে নাই, সে দশজনকে কখনও ভালবাসিতে পারিবে না। এক জনকে ভালবাসিলে হয় না, একথা যে বলে, সে ভালবাসার মর্ম্ম আজও বুঝে নাই; প্রেম-রাজ্যে সে অতি বালক। অভাব পূর্ণ হবে?—এ গণনা ব্যবসাদারের; প্রকৃত প্রেমিকের কাছে এরূপ গণনা নাই। কি লাভ হইবে, কি পাইব, এ সকল গণনা প্রকৃত প্রণয়ীর নাই। যার মধ্যে এ গণনা আছে, সে ধনীকে ধনের জন্য ভালবাসিতে পারে, রিপুচরিতার্থ করিবার জন্য যুবতীকে ভালবাসিতে পারে, কিন্তু প্রেমের আস্বাদনে সে চিরবঞ্চিত। প্রেম কি কিছু চায়? না, প্রেমের স্বভাবই তা নয়। কি পাইলাম, কি উপার্জ্জন হইল?—এ সকল ব্যবসাদারের গণনা। প্রেমিকের গণনা, "কি দিলাম?—দিতে কি পেরেছি, সর্ব্বস্ব কি বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে?—তার জন্য ধন,

জন, মান অভিমান, লজ্জা, শরম, ভয় ভাবনা, সব কি ভুলাইতে পারিয়াছি।” প্রকৃত প্রেমিকের কেবল এই গণনা সার। কেন তাঁকে দেখি, কেন তাঁর ধারে বসি, কেন তাঁর কথা শুনি—জানি না। সুখ পাই, আনন্দ পাই? না, তাও জানি না। তাঁকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না, তাঁর ধারে না বসিয়া পারি না, তাঁর স্বর না শুনিলে প্রাণ অস্থির হয়, তাই তাঁকে দেখি, তাই তাঁর ধারে বসি, তাই তাঁর কথা শুনি। এখানে আসক্তি আছে, কিন্তু স্বার্থ নাই। “কেন”—এই কথার উত্তর দিতে প্রেমিক জানে না। তাঁকে দেখিয়া আশ মিটে না, তাঁর কথা শুনিয়া বাসনা পূরে না। সে আশ,—সে বাসনা অনন্ত। হাজার বৎসর, কোটী বৎসর তুচ্ছ কথা,—চিরকাল দেখিলে, চিরকাল তাঁর কথা শুনিলেও এ আশ মিটিবার নয়। কেন? তিনি কি দেন? আমি তা জানি না। শান্তি দেন, আরাম দেন, তিনি নিষ্পাপ করেন? না, আমি তা কিছুই জানি না। আমি তাঁকে না দেখিয়া পারি না, আমি তাঁকে প্রাণ না সঁপিয়া থাকিতে পারি না। না,—তা আমার দ্বারা হবে না। আমি দরিদ্র? তাঁর জন্য আরো দরিদ্র হতে চাই। আমি মুর্খ? তাঁর জন্য আরো মুর্খ হইব। আমি বিপন্ন? তাঁর জন্য আরো বিপদ মস্তকে করিব। আমি দুঃখী? আমি তাঁকে পাইবার জন্য সর্ব্ব দুঃখকে সার করিব। গৈরিক আন, ভেক আন, আমি তাঁর জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়িব। আমি তাঁর জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া ভিখারী হইব। আমি কেবল তাঁকে চাই। তোমার সুখ দুঃখ, আনন্দ বা নিরানন্দ, পাপ বা পুণ্য, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম—আমি ও সকল কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, আমি কেবল চাই তাঁহাকে। আমার প্রাণ যিনি, আমার জীবন যিনি, তাঁহার বিনিময়ে কিছু কিনিব? ছি, এমন কথা মুখেও আনিও না। তিনি যে আমাকে ভালবাসেন, তার ভিতরে তাঁর কোন স্বার্থ নাই। তিনি স্বামী, তিনি দেবতা। যিনি আমার লজ্জা রাখেন, তিনি কদাপি মানুষ নন্। তিনি আমাপেক্ষা অনেক উপরে। আমি কত নিম্নে, কিন্তু তবুও তিনি আমাকে ভালবাসেন। কি মহত্ব কি দেবত্ব! আমি পাপী, নরাধম, ঘৃণিত, তার মলিন ভিখারী জীব, আমার কাছে কোন্ আশায় তিনি? কাঙ্গালের গৃহে স্বর্গের দেবতা! পাপীর সহিত তাঁর মিত্রতা কেন? “কেন” শব্দের উত্তর নাই। তাঁর স্বভাবই এই। তাঁর এই প্রকৃতি, তিনি পাপীর সহিত ক্রীড়া করিতেই ভালবাসেন।

আমারও এই প্রকৃতি কেন হবে না যে, আমি কেবল তাঁর চরণে মাথা রাখিব। তিনি আমার, তাঁরই এ প্রাণ, এ হৃদয়, এ দেহ, এ মন, সকলই। তিনি আমাকে কিছু দিবেন বলিয়া ভালবাসিব? আমি কে? আমার স্বাধীনতা কোথায়? আমি যে তাঁরই দাসানুদাস, পদানত ভৃত্য। আমি যে তাঁরই গোলাম। এ কেবল গোলাম-গিরি। আমার স্বাধীনতা নাই। আমি পৃথক নাই। আমার পৃথক ইচ্ছা নাই। এইরূপ তন্ময় হইয়া যে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন, তিনিই সতী এবং এইরূপ তিনিময় হইয়া যে জন বিধাতাকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন, তিনিই যোগী, তিনিই ঋষি। আর সতী বা যোগীর অস্তিত্ব মানি না। এইরূপ যে জন নির্লিপ্ত, অনাসক্ত ও নিষ্কাম হইয়া, তাঁরই জন্য তাঁর হইয়া, তাঁতে নিমগ্ন হইতে পারিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই মুক্ত জীব, তিনিই প্রকৃত ভক্ত। আর আমি তুমি যে ভালবাসার ব্যবসা চালাইতেছি, এটা সেটা পাইবার আশায় এঁকে তাঁকে বারম্বার ডাকিতেছি, আমরা প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত প্রণয়ের একটুও আস্বাদন আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। যে প্রকৃত আস্বাদন পাইয়াছে, সে নরকবাসী হইয়াও বৈকুণ্ঠের মুক্ত জীব।

ভালবাসার পণ আত্মত্যাগ,—আপনাকে ভুলা, আপনাকে বিসর্জ্জন দেওয়া। আপনাকে বাঁচাইয়া ভালবাসা পাওয়া যায় না। "দিয়াছি, দিয়াছি, দিয়াছি, সব দিয়াছি;—দেহবস্ত্র, লজ্জা মান, ধন জন, বিদ্যা গৌরব, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, আসক্তি এবং বৈরাগ্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম—সব তাঁকে দিয়াছি।" শ্রীরাধিকার এদেশে এত আদর কেন? কুল ত্যজিয়াও এত গৌরব তিনি পাইলেন কেন?—কেবল এইরূপ আত্মত্যাগে। চৈতন্যের নামে আজ বঙ্গে সহস্র সহস্র নরনারী ভক্তির অশ্রু ফেলে কেন? কেবল এই আত্মত্যাগে। মহাত্মা শাক্যসিংহ এবং খ্রীষ্টের জন্য কোটী কোটী নর-নারী উন্মত্ত কেন? সেও এই আত্মত্যাগে। আর বিল্বমঙ্গল? বেশ্যার প্রণয়ে কলঙ্কিত হইয়াও আজ এত আদরের কেন? সেও এই আত্মত্যাগে। "দিয়াছি ত সব দিয়াছি। স্বামি, তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই কর্ম্ম, তুমিই জ্ঞান, তুমিই গরিমা, তুমিই ভূষণ, তুমিই দেবতা, তুমিই স্বর্গ"—এইরূপ ভাবিয়া যে সাধ্বী স্বামীময় হইয়া স্বামীপদ সেবা করে, সে এই প্রেমের মর্ম্ম কিছু বুঝিয়াছে। আর যে ভক্ত জগজ্জননীকে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া কেবল তাঁতে ডুবিয়া সুখী হইতে পারিয়াছে, সে এই গভীর নিষ্কাম ভালবাসার মর্ম্ম কিছু

বুঝিয়াছে। কিন্তু এই ভালবাসার ব্যবসার দিনে, এই চাটুকারিতার দিনে, এই গভীর ভালবাসার মর্ম্ম লোকে কি বুঝিবে! স্বামী বিয়োগে আবার স্বামী খোঁজে, স্ত্রীবিয়োগে আবার পত্নী অন্বেষণ করে, বন্ধু বিয়োগে আবার বন্ধুর তল্লাসে বেড়ায় যে হতভাগ্য দেশের লোক, সে দেশের লোক নিস্বার্থ প্রেম, স্বর্গের ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিবে, আশা করা যায় না। ভালবাসা লইয়া তাই কত তর্ক বিতর্ক। আজি কালিকার দিনে তর্ক যুক্তি করিয়া আবার ভালবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। ধর্ম্ম, হা প্রেম, হা স্বর্গ!!

আমরা বলিয়াছি, ভালবাসার পণ—আত্মত্যাগ। আমরা ইঙ্গিতে বলিয়াছি, ভালবাসা মলিন হয়, কেবল স্বার্থে। স্বার্থ কি?—না আমিত্ব। আমিত্ব যেখানে, সেই খানেই স্বার্থ। পাইব, নিব, উপকৃত হইব,—এখানকার কথা এই। এইরূপ স্বার্থের দূষিত বায়ু-সংস্পর্শে স্বর্গের এই প্রেম অপবিত্র হয়, মলিন হয়। তাকে ভালবাসি, সে কেন আমার এই কাজ করিবে না? তাকে ভালবাসি, সে কেন আমার অভাব পূরাইবে না?—এ সকল স্বার্থপূর্ণ-কথা প্রকৃত প্রেমিকের নয়;—স্বার্থপর প্রেমব্যবসায়ীর। প্রেমিকের কথা এই—"বাসনা পূরাও বা না পূরাও, আমি ভালবাসিবই বাসিব। আমি ভালবাসিয়াই সুখী। দেখা দেও বা না দেও, আমি তোমার পানে চাহিয়া থাকিবই থাকিব। তুমি যে পথে, আমার নয়ন মন সেই পথে। পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু মন ত বাঁধিতে পার না। তুমি কিছু দেও বা না দেও, আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিব। ধন, মান, গৌরব—সব দিব। লোকে ঘৃণা করিবে, লোকে তিরস্কার করিবে? প্রেম-ভিখারিণী রাধিকা তাহা গণিবে না। যে যা বলে, বলুক, আমি চিরদিনই তোমার।"

কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী রাধিকা আরো কি বলেন শুন;—

"মণি নও মাণিক নও, হার করে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ,
নারি না করিত বিধি, তুঁয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।"

আবার স্থানান্তরে———"আমার মত তোমার শতেক গোপিনী,
তোমার মত বঁধু তুমিই গুণমণি,
দিনমণির আছে শত কমলিনী,
কমলিনীর একা দিনমণি ওই।"

এ সব কথা স্বর্গের কথা, প্রকৃত প্রেমিকার কথা। তোমার আমার সহস্র জন, কিন্তু রাধার ঐ এক জন ভালবাসার পাত্র। তাই রাধিকার নাম প্রেমময়ী। যে জন ডুবিতে জানে না, মজিতে পারে না, সে প্রেমের মর্ম্ম কি বুঝিবে।

এখন প্রশ্ন এই, প্রেমে মান অভিমান থাকে কি না? আমাদের মতে, মান অভিমান স্বার্থমূলক। রাধাকৃষ্ণের মান অভিমানের কথা যখন পাঠ করি, তখন যেন এই প্রেমে স্বার্থের পূতিগন্ধময় চিত্র দেখিতে পাই। তখন যেন এ প্রেমকে আদর্শ মনে করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃত স্বার্থহীন নিষ্কাম প্রেম-ব্রতে মান অভিমান কিছুই থাকে না। মান? "আমি তাঁকে ভালবাসি বলিয়া তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ করাইব? ছি, এ যে মহা কলঙ্কের কথা। আমি এই চাই, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। তাঁর কথাই থাকুক। তাঁর জেদ্‌ই রক্ষা পাউক।" প্রকৃত প্রেমিক এই রূপ বলেন। এই হিসাবে রাধিকার প্রেমেও আমরা কিছু কলঙ্ক দেখিতে পাই। আদর্শ প্রেম, খ্রীষ্টের, চৈতন্যের, বিল্বমঙ্গলের, ম্যাট্‌সিনির।

পৃথিবীতে ভালবাসার নামে অনেক কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। সকলেরই মনে রাখা উচিত, সে কিন্তু প্রকৃত প্রেম নয়। "তুমি তাঁকে ভালবাস,তুমি তাঁর জন্য কি করিয়া থাক? এইরূপ প্রশ্ন অনেকের মুখে শুনা যায়। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা প্রেমের মর্ম্ম বুঝেন নাই। কর্ত্তব্য পৃথক, ভালবাসা পৃথক। এই কার্য্য করা উচিত, এটা জ্ঞানের বা বিবেকের কথা; কাহাকে ভালবাসা,—হৃদয়ের স্বভাব। একটা কর্কশ, নীরস, শুষ্ক, কঠোর; আর একটা সরস, কোমল, মধুর। একটা পুরুষ, একটা প্রকৃতি, দুয়ে কোন মতেই তুলনা হয় না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানুষ যে কাজ করে, ভালবাসার অনুরোধে তেমন কাজ করিতে পারে না। আবার ভালবাসার অনুরোধে যাহা পারে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানুষ তাহা পারে না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানুষ পৃথিবীর অনেক উপকার করিতে পারে,—তোমার আমার অনেক উপকার করিতে পারে,—ধন ঐশ্বর্য্য ব্যয় করিতে পারে, কিন্তু প্রাণ দিতে পারে না। প্রাণ দিতে পারে লোক কেবল প্রেমের মায়ায়। প্রেমের স্বভাবই—আত্ম বিসর্জ্জন। প্রেম উপকার, অনুপকার, এ সকল তর্কযুক্তির কথা জানে না। সে জানে, কেবল প্রাণ দিতে। কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি পূজ্য কি প্রেমিক পূজ্য? আমরা তাহার মীমাংসা করিতে পারি না। তবে

প্রেমিক ম্যাট্‌সিনি প্রেমের টানে ইটালীতে যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, কর্ত্তব্যপরায়ণ বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন বা আর কোন ব্যক্তি তাহা পারেন নাই, ইহা জানি। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ খ্রীষ্ট ও চৈতন্য পৃথিবীর যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর অতি অল্প লোকেই পারিয়াছেন। দেশের জন্য বা মানব সমাজের জন্য প্রাণ দিতে পারেন, প্রকৃত প্রেমিক; উন্নতি বা উপকার সাধন করিতে পারেন, জ্ঞানী বা কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। একের সহিত অপরের আকাশ পাতাল প্রভেদ।

জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা কর, এ কার্য্য কর কেন? সে বলিবে, ইহাতে জগতের উপকার, মানবের উপকার হইবে, ইত্যাদি। প্রেমিককে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে, না করিয়া থাকিতে পারি না, তাই করি। অথবা বলিবে, এই কার্য্য করিতেই জন্ম, করিয়াই মরিব। মাতৃপ্রেম দেখ—কত মধুর, কত আত্মত্যাগমূলক, কত স্বার্থ-বিবর্জ্জিত। পিতৃ-কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখ—কত কঠোর, কত স্বার্থ-জড়িত, কত উচ্চ, কত মহৎ। মা প্রকৃতি, মা প্রেমময়ী। পিতা পুরুষ, পিতা কর্ত্তব্যপরায়ণ। এক স্বার্থ বিবর্জ্জিতা, অন্য স্বার্থ জড়িত। কিন্তু জ্ঞান এবং প্রেম, পুরুষ এবং প্রকৃতি,—পিতা এবং মাতা উভয়ই আদরের। কোনটীকে ছাড়িলে চলে না। অতএব জ্ঞান ও প্রেম, এ দুইই চাই। কিন্তু পিতা শ্রেষ্ঠ, কি মাতা শ্রেষ্ঠ, জানি না। তবে মা যে মধুর, মা যে অতি মিষ্ট—কে না তাহা স্বীকার করিবে? মাতার স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে কে না মাতোয়ারা? কোন আশা নাই, কোন কামনা নাই—মা ছেলেকে দেখিয়াই সুখী। সৃষ্টির কি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! কি এক সঞ্জীবনী শক্তি! মা ভিন্ন জগতের মুখ দেখিতেও পারিতাম না। মাতাই সঞ্জীবনী মন্ত্র। মায়ের ন্যায় জগতে আর কিছুই আপন নয়। প্রেমময়ী মাকে কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতি লইয়া কেহই চিনিতে পারে নাই, কেহ পারিবে না। প্রেমের গভীর সাধনা ভিন্ন মাতৃদর্শন অসম্ভব। কারণ, প্রেম ভিন্ন প্রেমময়ীকে কে চিনাইতে পারে? পুরুষ প্রকৃতি জ্ঞানমূলক, এই জ্ঞান জমিয়া জমিয়া, আরো জমিয়া আরো জমিয়া যখন প্রেমরূপ ধরে, অথবা প্রেম যখন জ্ঞানের বিকাশে পরিণতি পায়, তখনই হর-গৌরীর যুগল-মিলন হয়, তখনই জগন্মাতার প্রকৃত স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়। জ্ঞান-পুরুষ যখন প্রেম-স্ত্রীতে মিলিয়া একাত্মক হয়, তখন সেই একাত্মক ভাবের ভিতর দিয়া জগন্মাতার আরাধনার স্তব উঠে। সংসার-

মহাশ্মশানে মহা-বৈরাগ্যরূপী হর, মহামায়া-রূপিনী গৌরীর সহিত একাত্মক হইয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করেন। হর গৌরীর ন্যায় যুগল ভক্ত সৃষ্টিতে আর নাই।

মা ডাক যেমন সরল, যেমন মিষ্ট, এমন আর কোন ডাক নয়। এই ডাকের ভিতরেই প্রেম জীবন্ত-রূপিনী। মা, মা, মা, বলিয়া তিনবার ডাকিয়া দেখ, তারপরও কঠোর হৃদয়ের কঠোরতা আছে কি না? যদি থাকে, বুঝিবে, ঐ ডাকে-সিদ্ধিলাভ এখনও তোমার ঘটে নাই। "এ আবার কি নুতন কথা? পৃথিবীতে যার মা নাই, এমন লোক কে আছে? মা বলিয়া ডাকিয়া যার কণ্ঠ শীতল হয় নাই, এমন লোক পৃথিবীতে নাই। সুতরাং মা নাম ডাকায় সিদ্ধিলাভ অসিদ্ধিলাভ আবার কি?" অনেকেই এই কথা বলিতে পারেন বটে। আমরা যে কথা বলিতেছি, তাহা এই; মা সকলেরই আছে বটে, কিন্তু তবুও মা নাম উচ্চারণে অনেকের অসিদ্ধি আছে। মা, পবিত্রতার মূর্ত্তি। কার নিকট? কেবল পুত্রকন্যার নিকট। মা আর সকলের নিকট অপরাধিনী থাকিতে পারেন, ভয়ানক দুষ্কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু মা সন্তানের নিকট পবিত্র-রূপিনী। মা যখন সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়াছেন, তখন পাপ প্রলোভন, ত্রিতাপ জ্বালা যন্ত্রণা মায়ের নিকট হইতে অন্তর্হিত। রিপুর উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া অনেক স্বামী স্ত্রীর বক্ষে ছুরিকার আঘাত করিয়াছেন, শুনা গিয়াছে। হিংসার ভীষণ পরাক্রমে সতিনের মুখে কালি দিবার জন্য অনেক স্ত্রী স্বামীর রক্ত শোষণ করিয়াছেন, ইহাও শুনিয়াছি; কিন্তু উন্মত্ত অবস্থায়, বা আর কোন অবস্থায় মা সন্তানকে ক্রোড়ে পাইয়া বধ করিয়াছেন, এমন কথা শুনি নাই। ভ্রূণ-হত্যা এদেশে হয় বটে, কিন্তু তাহা মাতৃ ইচ্ছায় নয়। গর্ভপাতের দৃষ্টান্ত এদেশে আছে বটে, কিন্তু তাহা সন্তান প্রাপ্তির পূর্ব্বে। সন্তান প্রাপ্তির পর—সন্তান ক্রোড়ে মা—জগন্মাতার রূপ ধরিয়াছেন, তিনি তখন অন্নপূর্ণা, তিনি তখন নিষ্পাপ। স্ত্রীলোকের যৌবন-মূর্ত্তি দেখিয়া মানুষ রিপুব উত্তেজনায় মত্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই স্ত্রীলোক যখন সন্তান ক্রোড়ে পাইয়া গণেশ-জননী, তখন তাঁর পানে কলুষিত নেত্রে কেহ চাহিতে পারে না। এ সকল সোজা কথা—খুব সরল কথা। মা যেমন সন্তান ক্রোড়ে পাইয়া নিষ্পাপ হন, মাতার কোলে যত দিন সন্তান, তত দিন সন্তানও তেমনি নিষ্পাপ। মা ও ছেলে, উভয়ে একত্রে যখন, তখন

উভয়েই নিষ্পাপ। কৃষ্ণ যখন দেবকীর ক্রোড়ে, তখন তিনি স্বর্গের শিশু কিন্তু কংসের ভয়ে যখন যশোদার গৃহে তিনি প্রতিপালিত, তখন তাহাতে সংসারের মলিনতা ছিল। সংসার-কংসের তাড়নায়, দুর্ভাগ্যক্রমে, এই পৃথিবীতে অনেক সন্তান মাতৃ-ক্রোড়-চ্যুত। ইহা বিধাতার লীলা কি না জানি না। পৃথিবীতে পাপ-সংগ্রামে জয়লাভে অসমর্থ হইয়া আমরা অনেকেই মলিন, নিস্তেজ, নির্বীর্য্য। মা অনেক দূরে। ক্রমে ক্রমে আরো দূরে, আরো দূরে, আরো দূরে। সংসারের পর সংসার, পাপের পর পাপ, রিপুর 'পর রিপু, স্বার্থের পর স্বার্থ,—সব যেন মহা পারাবার, সব যেন অনন্ত। অকূল পারাবারের পরপারে—মা। তাই আমাদের হৃদয় কত মলিন, কত নিস্তেজ। এই নিস্তেজ কণ্ঠে মাতৃ নাম ফুটিয়াও ফুটে না। কত ডাকি, কিন্তু সে ডাক কিছুতেই পবিত্র হয় না। কি যেন একটা কল্পনা-আঁধার, কি যেন একটা ভয়মাখা কর্কশ রব ডাকের সহিত ফুটিয়া উঠে। এই মা নাম শিশুর কণ্ঠে যেমন মিষ্ট, বয়স্ক ব্যক্তির কণ্ঠে তেমন মিষ্ট লাগে না। শিশুর মাতা যেন শিশুর বুকের ভিতর। যুবকের মা, সংসার পারাবারের পর পারে। যুবকের বন্ধুবান্ধব, স্ত্রীপুত্র কত আসক্তি আছে ;—তার ভালবাসা শতধা ; কিন্তু শিশুর সম্বল কেবল মা। যুবকের ডাক কত উচ্চ, কত গগনস্পর্শী—সপ্তম ছাড়িয়াও উপরে উঠিয়াছে ; কিন্তু শিশুর ডাক পঞ্চমেরও নিম্নে। যুবকের ঐ উচ্চ ডাকও জননী শুনেন কি না, সন্দেহ ; আর শিশুর ঐ মৃদু ডাকে, যাহা পৃথিবীর আর কোন লোক শুনিতে পায় কি না সন্দেহ, মা অস্থিরা। শিশুর ডাক অনন্যগতি-ব্যঞ্জক, যুবকের ডাক অন্যগতি-ব্যঞ্জক। সে যেন আর মায়ের নয়। সে যেন আর কার হইয়া গিয়াছে। সে যেন আর কার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে। তাই যুবকের ডাকে মা অস্থিরা নহেন—অনেকবার শুনেন না, অনেকবার শুনিলেও তার প্রতি কর্ণপাত করেন না। আর অনন্যগতি শিশুর মধুর ডাক,—হায়, উহার নিকট জননী আত্মবিক্রীত ; ঐ ডাক কাণে গিয়াছে কি তিনি অস্থিরা। শিশুর ডাকের পরেই মা যেন বিকল অঙ্গ প্রাপ্ত, তিনি যেন আর তিনি নন, কি যেন হইয়া গিয়াছেন। কেন বল ত ? শিশুর আর যে কেহ নাই। মা জানেন, শিশুর মুখের দিকে তাকাইতে তিনি ভিন্ন আর যে কেহ নাই। শিশু আর কাকেও যে চিনে না। সে অনন্যগতি, সে কেবল মাকে জানে, কেবল মাকে ডাকে। সে

নিষ্পাপ, তাই সে ডাকে কেবল মা, কেবল মা। এইরূপ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ না হইলে, মা ডাকে সিদ্ধিলাভ হয় না। নিষ্পাপ এবং অনন্যগতি হইয়া যখন মানুষ মা মা বলিয়া ডাকে, তখন স্বর্গ সেখানে অবতীর্ণ হয়। তখন মাতার মাতা বিশ্বমাতা সন্তানের সমক্ষে প্রকাশিত হন। এইরূপ মাতৃ ডাকে সিদ্ধিলাভ করিয়াই মানুষ দেখে, এই পৃথিবীতে পর কেহই নাই, শত্রু কেহই নাই, সকলই মায়ের ছায়া; মায়ের সন্তান। সকলই মায়ের রূপ। সকলই মায়ের মায়া। মা স্ত্রীরূপে, মা স্বামীরূপে, মা সন্তানরূপে, মা পিতা মাতা রূপে, মা বন্ধুরূপে, মা আত্মীয়রূপে। মা শাসক রূপে, মা শাসনরূপে। মা অনন্তরূপিনী, মায়ের অনন্ত রূপ। কিন্তু এও প্রেমের জমাট নয়। প্রেমের জমাটরূপ ভক্তি। প্রেম মজিতে মজিতে ভিন্নত্ব ঘুচিয়া যখন একরূপ জগন্ময় হয়, তখনই প্রেম জমাট বাঁধে। তুমি ভাই, তুমি ভগিনী, তুমি বন্ধু—তখন আর এ বোধ নাই। তখন কেবল মা-বোধ। মাই তখন সর্ব্বস্ব। শিশু ত মা ভিন্ন আর কিছু জানে না। সংসারে কোটী কোটী পৃথক বস্তু আছে, কিন্তু শিশু জানে কেবল—মা। মাতৃ নামে সিদ্ধি লাভ করিলে নিষ্পাপ যুবকও সেইরূপ মা ভিন্ন আর সবই ভুলিয়া যায়। সে স্ত্রীকেও মায়ের ন্যায় ভাবে, ভাইকেও মা ডাকে, সে বন্ধুকেও মা ডাকে, শত্রুকেও মা ডাকে। সে উন্মত্ত। সে সংসারের গণনা—সংসারের সম্বন্ধের ইতর বিশেষ জানে না। সে জিতেন্দ্রিয়, সে ত আর রিপুর অধীন নয়, সুতরাং তাঁর নিকট সকলই সমান—সকলই একরূপ—সর্ব্বত্রই কেবল মা। এই মা-গত একপ্রাণতাকেই ভক্তি কহে। এই গভীর প্রেমের সাধনা যে সহজ, মনে করে, সে আজও প্রেমের আস্বাদন কিছুই পায় নাই। যাহারা স্বার্থ বা রিপুর উত্তেজনায় ভালবাসার কেনাবেচা করিয়া বাজারে বেড়াইতেছে, তাহারা প্রতারক ভিন্ন আর কিছুই নয়। গভীর প্রেমের সাধক পৃথিবীতে অতি বিরল। যে গভীর প্রেমের মর্ম্ম বুঝে নাই—ভক্তির মর্ম্ম সে কোন রূপেই বুঝিতে পারে না। তাই প্রকৃত ভক্ত পৃথিবীতে এত দুষ্প্রাপ্য।

প্রকৃত ভালবাসায় মান অভিমান নাই, লজ্জা ভয় নাই, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু জোর জবরদস্তি বা আদর আব্দার, ভক্তির জগতে কিছু আছে বলিয়া মনে হয়। "তুমি দেখা দিবে না?—দেখি, কেমনে না দিয়া পার। তুমি একাজ করিবে না? দেখি, কেমনে না করিয়া থাকিতে পার?" এ সকল জোর জবরদস্তির কথা প্রকৃত ভক্ত কোন কোন সময়ে

বলিতে পারেন। ছেলে মায়ের নিকট আব্দার করিতে অধিকারী। "আমি কি আটাসে ছেলে, আমি ভয় করি কি চোক্ রাঙ্গালে—" প্রভৃতির ন্যায় কথা রামপ্রসাদের ন্যায় ভক্তের উক্তিতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। ভক্ত যখন বলেন—"দীনসখা, কাছে এস, তখন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু দূরে থাকেন্ না।"—একথা অনেকেই বলেন। ইহা কেন? সে কি আসক্তিতে? ভগবান কি খোসামুদির বশ? না, তা নয়। ভক্তকে তিনি কি কিছু ভয় করেন? না, তাও নয়। তিনি জানেন, ভক্তের তিনি ভিন্ন ত আর কেহই নাই। মা জানে, শিশুর কেবল মা, তাই মা শিশুর জন্য অধীরা। ভগবান জানেন, ভক্তের আর কেহই নাই, তাই তিনি তার জন্য ব্যাকুল। যে অনন্যগতি না হইয়াছে, সে প্রেমিক নয়। একজনকেও যে প্রাণ সমর্পণ না করিয়াছে, সে প্রেমের মর্ম্ম বুঝে নাই। এবং সকলের ভিতরে একের মূর্ত্তি যে দেখিতে না শিখিয়াছে, সে ভক্ত নয়। ভক্ত প্রহ্লাদ স্তম্ভে হরিকে দেখেন, জলে আগুণে হরিকে দেখেন। যে দশ জনের নিকট বিকাইল, সে ভক্ত নয়। খ্রীষ্ট, এক জনের জন্যই পাগল ছিলেন। তাই সংসারের জন্যও ফেরেন নাই;—পিতা মাতাকেও পিতা মাতা বলিয়া ডাকেন নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, একজনকে যখন পিতা বলিয়া ডাকিয়াছি, তখন আর অন্যকে পিতা বলিব কেন? যে ব্যক্তি দশ জনের মন রাখিয়া চলে, সে ভক্তির মর্ম্ম বুঝে নাই। সে ব্যবসাদারী শিখিয়াছে মাত্র। সে কত জনকে ভালবাসে, আবার ছাড়ে! সে নূতন ভালবাসার জন্য কেবল নূতন লোক ডাকে। ভক্ত কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"লোকেরা ভাল কাজ করিতে বলিলেও তাহা করিব না, কিন্তু ভগবানের কথায় করিব। * * * এক জনের দাসত্ব করিতেছি বলিয়াই অন্যের দাসত্ব করিতে পারিতেছি না।" ইহাই ঠিক কথা। ভগবদ্ভক্ত মানুষ আর কাহারও কথা শুনিয়া চলিতে পারেন না,—আর কাহারও দাসত্ব করিতে পারেন না। ভক্ত সর্ব্বদা, সর্ব্ব ঠাঁই কেবল তাঁহাকেই দেখেন, তাঁহাতেই মজেন। ব্রত উপবাস, উপাসনা অর্চ্চনা, নিয়ম প্রণালী—এ সকলও ভক্তের নিকট তুচ্ছ কথা। ভক্ত তোষামোদ জানেন না, মায়া করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে পারেন না, তিনি কেবল জানেন—মা। মাই তাঁর পূজা, মাই তাঁর অর্চ্চনা। মাই তাঁর সর্ব্বস্ব। ভক্ত মাকে যখন ডাকেন, মা তখন অস্থিরা। মা তখন তাঁর প্রাণে। শিশু-ভক্তের আব্দার শুনিয়া মা কখনও দূরে থাকিতে পারেন না। তিনি

নানা যুগে নানা বেশে ভক্তের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণই হউন, আর তিনি রাধিকাই হউন, তিনি নারায়ণই হউন, আর তিনি ভগবতীই হউন, তাঁর নাম নাই, কিন্তু রূপ আছে। ভক্ত যে রূপ দেখিতে যখন পিপাসিত হন, অথবা ভক্তকে যে রূপে দেখা দিতে তিনি ইচ্ছা করেন, ভক্তবৎসলা মা তখন সেই রূপ ধরিয়া ভক্তের নিকট উপস্থিত। ভক্তের নিজের ইচ্ছা উড়িয়া গিয়াছে, মায়ের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। অথবা দুইয়ের ইচ্ছায় মিলন হইয়াছে, মা ও ছেলের সেখানে পৃথক অস্তিত্ব নাই। কখনও সখাতে, কখনও স্ত্রীতে, কখনও বা ভাই ভগ্নীতে, সেই জগজ্জননীর অনন্ত রূপ দেখিতে দেখিতে, আনন্দময়ীর অনন্ত প্রসারিত বিশ্বক্রোড়ে শয়িত থাকিয়া, ভক্ত হাসিয়া খেলিয়া চলিয়া যান। ভক্তের পদস্পর্শে পৃথিবী স্বর্গ হয়। প্রেমিকের প্রেমালিঙ্গনে পৃথিবী কৃতার্থ হয়। মায়ের ভক্ত হইতে না পারিলে মানবের কিছুতেই আর নিস্তার নাই।

ভালবাসা হইতে আরম্ভ না করিলে কেহই সেইরূপ ভক্ত হইতে পারে না। ক খ হইতে শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। এই সংসার-বিদ্যালয়ে, ভালবাসারূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কবে সকল ঘটে একের বিশ্বব্যাপী রূপ দেখিয়া, স্বেচ্ছাকে ডুবাইয়া, সকলে প্রকৃত ভক্ত হইতে পারিবে? কে জানে কবে!!

প্রতিজ্ঞার বল।

মানুষ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন হয়। দুই ঘণ্টা পূর্ব্বের মানুষ—আর দুই ঘণ্টা পরের মানুষ প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ নূতন। শরীরগত বা অবয়বগত পরিবর্ত্তন কিছু ধীরে ধীরে হয় সত্য, কিন্তু চিকিৎসা-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর মানুষের শোণিতমাংস-ঘটিত অবয়ব সম্পূর্ণ নূতন হয়। চক্রের পর চক্র—ক্রমাগত পরিবর্ত্তন-চক্র ঘুরিতেছে। ঘটনার পর ঘটনা, অবস্থার পর অবস্থা, সময়ের পর সময়। প্রতি নূতন ঘটনা, নূতন অবস্থা বা নূতন সময়—মানুষকে চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতনতর জগতের নূতন জীব করিয়া তুলিতেছে। মানুষের প্রকৃতি, আকৃতি—স্বভাব চরিত্র, ধর্ম্ম বা জ্ঞান—সব পরিবর্ত্তনের অধীন—সব পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু এ নিয়ম সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে। দুবৎসর বা দুমাস পূর্ব্বের

সাধারণ মানুষকে যে আজও পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে চায়, তাহার ন্যায় ভ্রান্ত-জীব আর নাই! ঘটনার দাস মানুষ প্রতি ঘটনায় নূতনত্ব লাভ করিয়া নূতন ঘটনার সংঘর্ষণে আসিতেছে। পরিবর্ত্তন-চক্র অবিরাম ঘুরিতেছে। সাধারণ মানুষ ক্রমাগত অবস্থার পর নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী—ইতালী মহানগরে দুটী বালক সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতে বাহির হইয়াছেন। দুটী বালক, দুই সহোদর। দুটীর প্রাণে প্রাণে মিল। বালকের খেলা, বালকের ভ্রমণ, বালকের হাসি, বালকের তামাসা চির-উপেক্ষিত! তাহাদের হাসিরও কেহ তত্ত্ব লয় না, ক্রন্দনেরও কেহ খোঁজ খবর রাখে না। তাহাদের কথাবার্ত্তা, আমোদ উল্লাস—তারই বা তত্ত্ব কে লয়? দুটী বালক গল্প করিতে করিতে কত সুখে, কত ভাবে ডুবিয়া পথ হাটিতেছে। জ্যেষ্ঠের মনের আশার কথা, জীবনের উন্নতি-স্বপ্নের কথা কনিষ্ঠ কত আগ্রহ সহকারে শুনিতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। উভয়ে একটু চমকিত হইলেন। জ্যেষ্ঠ এই সময়ে কি কারণে যেন হঠাৎ স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন। এখনি ফিরিয়া আসিব, বলিয়া কনিষ্ঠকে রাখিয়া গেলেন। ইটালীতে তখন বড়ই দস্যুর ভয়। সকল অধিবাসীই কোন না কোন দস্যুদলভুক্ত। মারামারী রক্তারক্তি—সর্ব্বদাই চলিত।* কি কুক্ষণে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে রাখিয়া গেলেন! কি কুক্ষণে দারুণ সন্ধ্যা চতুর্দ্দিক গ্রাস করিল! জ্যেষ্ঠ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, কনিষ্ঠের সর্ব্বশরীর রক্তময়—দস্যুর অস্ত্রাঘাতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। কি ভীষণ দৃশ্য! এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে জীবিত ছিল, এখন সে আর এই পৃথিবীতে নাই! তার শরীরের মমতা পরিত্যাগ করিয়া শোণিত-প্রবাহ মৃত্তিকাকে সিক্ত করিয়া কি ভীষণ শোকবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে! জ্যেষ্ঠের প্রাণে দারুণ শোক-শেল বিঁধিল। আহা! সেই সান্ধ্য-সমীরে হত ভ্রাতারমৃত শরীরের সহিত জ্যেষ্ঠের আলিঙ্গন, সেই মলিন মুখ-চুম্বন, সেই নিরাশ-রোদন, সেই "বিচার প্রার্থনা"—ভবিষ্যতের কি যেন এক উজ্জ্বল ইতিহাস অঙ্কিত করিল। মৃত ভ্রাতার নিস্তেজ শরীর আলিঙ্গন করিয়া জ্যেষ্ঠ কি যেন এক স্বর্গীয় শক্তি লাভ করিল।†

---

* Decline and fall of the Roman Empire by E. Gibbon; edited by F. A. Guizot. Vol. 11, Chap. LXX.

† Gibbon's Fall of the Roman Empire, edited by F. A. Guizot, Vol. II. P. 600.

জ্যেষ্ঠও কনিষ্ঠের সহিত মৃত! সেই পূর্ব্বের জ্যেষ্ঠ আর নাই। তাহার কোমল শরীর, কোমল হৃদয়, সেই মধুর স্নেহ, সেই দুর্ব্বল মন সব যেন কনিষ্ঠের সহিত কোন অতীত জগতের কাহিনীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে! মৃত ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া যিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন, তিনি ইটালীর ভাবী উদ্ধারকর্ত্তা রিয়েঞ্জি! অসামান্যই হউক বা সামান্যই হউক, এই একটী ঘটনা হইতে ইটালীর উদ্ধার কর্ত্তার জন্ম হইল।* কি এক প্রতিজ্ঞা, কি এক স্বর্গীয় অগ্নিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া, আর এক নূতন জ্যেষ্ঠ যেন মাথা তুলিলেন। ইটালী কম্পিত হইল,—ন্যায়ের রাজত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে, নিমিষের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় এই বার্ত্তা আকাশময় ছাইল! কি এক গভীর অগ্নিময় প্রতিজ্ঞায় বালকের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল!

এই ঘটনার বহুশতাব্দী পূর্ব্বের ভারতের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। মায়ার ছলনে ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্যধন সর্ব্বস্ব হারিয়াছেন। অবশেষে পঞ্চ পাণ্ডবের একমাত্র স্ত্রী সতীশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীরূপিনী দ্রৌপদীকেও হারিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির মতিচ্ছন্ন, কৌরবগণের সর্ব্বনাশের দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কি কুক্ষণে কে জানে, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিতে দুর্য্যোধন আদেশ করিলেন। সভামধ্যে কুললক্ষ্মীর সেই অবমাননা, সেই নির্যাতন, সেই লজ্জাহীন ঘৃণিত ব্যাপার—যাহা লিখিতেও কষ্ট হয়, কি এক ভাবী মঙ্গলের বীজ বপন করিল। মহাপরাক্রান্ত মহাবীর ভীম সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "রণমধ্যে দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক রক্তপান করিয়া ইহার প্রতিশোধ তুলিব।†" সভা কম্পিত হইল, কুরুকুলের শোণিত নিস্তেজ হইল, এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার বলে ভারত যেন শিহরিয়া উঠিল। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের দিকে সমস্ত রাজন্যবর্গ যেন

---

* "Will they not give us justice: Time shall show." So saying he bent his head over the corpse, his lips muttered, as with some prayer or invocation, and then rising, his face was as pale as the dead beside him, – but it was no longer pale with grief.

From that bloody clay, and that inward prayer, cola di Rienzi rose a new being. With his young brother died his own youth. But for that event, the future liberator of Rome might have been but a dreamer, a scholar, a poet,—a man of thoughts, not deeds." Lytton Bulwer.

† মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

আহূত হইলেন ; কি যেন এক ভীষণবার্ত্তা নিমিষের মধ্যে ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠায় শোণিতাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইল।

আর একটী চিত্র দেখ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ যায় যায়। অস্ট্রিয়ার দাসত্বে ইতালীর অতি শোচনীয় অবস্থা। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের স্বেচ্ছা-শাসন-লীলার কেন্দ্রস্থল হইয়া ইতালীর মুখ মলিন,—পরিধেয় জীর্ণ শীর্ণ। এদিকে চরিত্রহীনতায় ও বিলাসিতায় সমগ্র দেশ নিমগ্ন। এই দুঃখ দুর্দ্দিনে হঠাৎ এক আলো প্রজ্জ্বলিত হইল। ম্যাট্‌সিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, মুখ মলিন, পরিধেয় বস্ত্র মলিন, কি যেন এক সর্ব্ব-সংহারক দুঃখ-অমাবস্যা তাঁহার সর্ব্ব শরীর ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এই সময়ে তিনি কার্ব্বোনারি সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন, প্রতারণা, ছলনা, প্রাণীহত্যা—তাহাদের লক্ষ্য, তখন তাঁহার শরীরে যেন কি এক বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিল। প্রতারকদিগের ছলনায় তিনি যখন নির্ব্বাসিত হইলেন, তখন এই আগুণ এক ভয়ানক প্রতিজ্ঞার আকার ধারণ করিল। প্রাণ মন সব অগ্নিময় হইয়া উঠিল! তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন ;—

—"To dedicate myself wholly and for ever to the endeavour to constitute Italy one, free, independent &c.—&c.—

"Now and for ever

"This do I swear, invoking upon my head the wrath of God, the abhorrence of man, and the infamy of the perjurer if I ever betray the whole or a part of this my oath."

ইতালীর উদ্ধারের জন্য ম্যাট্‌সিনি এই গভীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জীবন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার নিজের আর কিছু রহিল না, সর্ব্বস্ব দেশের হইল।* এই প্রতিজ্ঞার বলে ও তাঁহার স্বর্গীয় স্বার্থত্যাগের আদর্শে—ইতালীতে আবার একপ্রাণতার বিজয় ভেরী বাজিয়া উঠিল। ইতালী আবার স্বাধীনতার মুখ দেখিল।

বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞার অগ্নিময় বাক্যে এক সময়ে দুর্লঙ্ঘ্য আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাহার সৈন্যগণের জন্য পথ দিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—"There shall be no Alps."—এবং কাজেও তাহা দেখাইয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা ঠিক হইলে তিনি

---

* Joseph Mazzini, A memoir by E. A. V. CHAPTER II.

সর্ব্বস্ব সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য বিসর্জ্জন দিতেন।* তিনি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করিতেন না; বলিতেন, "My lads, you must not fear death; when soldiers brave death, they drive him into the enemy's ranks." তাঁহার প্রতিজ্ঞার বলে সমস্ত ইউরোপে তাঁহার প্রতাপ বিস্তার হইয়াছিল।

অবস্থা মানুষের দাস, না মানুষ অবস্থার দাস? ইতিহাসে এ প্রশ্নের দুটী উত্তর পাওয়া যায়। অবস্থা হইতে কখনও মানুষের জন্ম, এবং মানুষ হইতে কখনও অবস্থার জন্ম। কখনও ঘটনা মানুষকে পরিবর্ত্তন করে, কখনও মানুষ ঘটনাকে রূপান্তরিত করিয়া পৃথিবীকে দারুণ ঝটিকাপূর্ণ দুর্দ্দিন হইতে উদ্ধার করে। উপরে যে কয়েকটী ঘটনার কথা উল্লিখিত হইল, ইহাতে দেখা গিয়াছে যে, ঘটনাই যেন মানুষকে জন্ম দিতেছে। কিন্তু জন্মের পর—দেখ ঐ রিয়েঞ্জী আর ঐ ভীম, ঐ ম্যাট্‌সিনি আর নেপোলিয়ন কিরূপে হাতে ধরিয়া পৃথিবীর অবস্থাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতেছেন। সিংহের তনয় গভীর গর্জ্জনে যেন সমস্ত পৃথিবীকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন তাহাদের প্রতিজ্ঞার বলে একতন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিতেছে।

আমরা দুটী সিদ্ধান্তে তবে উপনীত হইতেছি,—অবস্থা মানুষকে জন্ম দেয়; আর জন্মের পর মানুষ ঘটনাকে বা কার্য্যকে সৃজন করে। রিয়েঞ্জী বা ম্যাট্‌সিনি অবস্থার পীড়নে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইতালীর আমূল সংস্কার বা আমূল পরিবর্ত্তন ইহাঁদের অগ্নিময় প্রতিজ্ঞার বলে সংঘটিত হইয়াছে। ঘটনাও মানুষকে চালায়, সময়ে মানুষও ঘটনাকে চালায়। অনন্ত পরিবর্ত্তন-চক্র ঘুরিতেছে, মানুষ কখনও ঘটনাকে ঠেলিতেছে, কখনও বা ঘটনা মানুষকে ঠেলিতেছে। মূলে কি যেন এক অব্যক্ত অবিনাশী শক্তি তড়িতবেগে ক্রীড়া করিতেছে।

এই অবিনাশী শক্তি—প্রতিজ্ঞার বল। মানুষ কি কখনও মানুষ হইতে পারিত, এই প্রতিজ্ঞার বল ভিন্ন?—না, কখনই নয়। ধৈর্য্য বল, আর অধ্যবসায় বল, ধর্ম্ম বল, বা চরিত্র বল, সুখ বল বা শান্তি বল—সব এই

---

* "Having decided what was to be done, he did that with might and main. He put out all his strength. He risked everything, and spared nothing, neither ammunition, nor money, nor troops, nor generals, nor himself." *Emerson.*

প্রতিজ্ঞার আয়ত্তাধীন। 'রিপুর উত্তেজনায় বিলাসিতার দুর্জ্জয় সংগ্রা
পরাজিত হইব? ছি,·না তা হইবে না, এই বলিয়া যখন মহাত্মা কেশ
চন্দ্র অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন বিলা
সুখ এবং পাপ প্রলোভন ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়
করিয়াছিল। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে মারপিশুনকে পরাজ
করিবার জন্য নিরঞ্জনা তটে যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তুমি আ
কি তাহা পারি? গভীর প্রতিজ্ঞা—"হয় জীবকে জরা মরণের অতীত করিব
নয় মরিব।" এই প্রতিজ্ঞার বলে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন
কত কত মহাত্মা যে এইরূপ জীবনকে স্বীয় প্রতিজ্ঞার বলে তৃণের ন্যা
প্রজ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার অন্ত
নাই। প্রতিজ্ঞাই সঞ্জীবনী শক্তি। এই শক্তি বিহনে মানুষ মৃত, অসার,
জড়ের ন্যায় নিস্পন্দ। প্রতিজ্ঞার অটলত্ব ভিন্ন মানুষ মানুষ হয় না; মানুষ
অমরত্ব লাভে অধিকারী হয় না। প্রতিজ্ঞাই সঞ্জীবনী শক্তি।

এক জন মহাত্মা বলিয়াছিলেন;—"পৃথিবীকে নিমেষের মধ্যে আপন অধীনে আনিতে পারি, যদি মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারি।" মনকে বাঁধিতে না পারিলে, ইচ্ছার অধীন করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু হয় না। যাহার মন আপন বশে নয়, সে একবার হাসে, একবার কাঁদে, একবার জাগে, একবার ঘুমায়;—সে একবার মাতে একবার মরে। আর যাহার মন বশে আছে—সে জিতেন্দ্রিয়, সে না পারে এমন কার্য্য নাই। অবস্থার কষাঘাতে সে মরিবে, ঘটনা তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবে? ঘটনা তার নিকট তৃণের ন্যায়; তার ফুৎকারে ঘটনা তড়িৎবেগে উড়িয়া যায়। মন যার বশে, ঘটনা তার নিকট কিছুই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না। যদি তাহা পারিত, পৃথিবীর কোন মহাত্মা পৃথিবীকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতেন না। প্রকৃত মহা-পুরুষ তাঁহারা, যাঁহারা ঘটনায় আত্মসমর্পণ করেন না, স্রোতের শৈবালের ন্যায় একবার পূর্ব্বে আবার পশ্চিমে নীয়মান হন না;—যাঁহারা অটল ভিত্তির উপর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত। সুখ ঐশ্বর্য্য,—তুচ্ছ কথা। বিপদ আন্দোলন—মৃত্যু কারাবাস—তাহাও তুচ্ছ কথা। ম্যাট্‌সিনির পিতা মনে করিয়াছিলেন, অনাহার ও কারাবাসের কষ্টে ম্যাট্‌সিনির মন পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং সময়ে ম্যাট্‌সিনি রাজার নিকট ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু কি অসার আশার

কুহক! মরণের ভয় দেখাইলে খ্রীষ্টের মতি ফিরিবে, ইহা মনে করিয়া ইহুদী জাতি কি মহা ভুল করিয়াছিল! নির্ব্বাসনের কষ্টে ভীমের প্রতিজ্ঞার মূল ছিন্ন হইবে, মনে করিয়া কুরুবংশ কি মায়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিল! মৃত্যু, কারাবাস, নির্যাতন—দুঃখ, সুখ, বিলাস,—যশমান, প্রকৃত মনস্বী ব্যক্তির নিকট এ সকল কোন গণনার কথা নয়। শত বৎসরের শত ঘটনা আন—শত শত অত্যাচার রাশীকৃত কর,—মনোরাজ্যের রাজা কিছুতেই টলিবার নন। তাঁহাদের লক্ষ্য আর কিছুই নয়, কেবল প্রতিজ্ঞা, কেবল লক্ষ্য-সিদ্ধি। ভ্রাতার মৃত্যুর কথা আর সকলেই সময়ে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রিয়েঞ্জি ভুলেন নাই। শত কষ্ট দুঃখে, শত নিরাশায়, শত বন্ধুর উপদেশেও ম্যাট্‌সিনি আপন ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই। ঘটনা বালককে পরিবর্ত্তন করে, করিতে পারে। অবস্থা—অস্থিরমতির আসন টলাইতে পারে বটে। অত্যাচার আন্দোলন ছিন্নমতির পা কাঁপাইতে পারে বটে। কিন্তু যে প্রতিজ্ঞাবলে আপন মনোরাজ্যে বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে—তার নিকট পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা—সমস্ত আন্দোলন—অতি তুচ্ছ কথা। সে ব্যক্তি যে অপরিবর্ত্তিত, সেই অপরিবর্ত্তিত;—চিরকাল—আবহমান কাল। প্রতিজ্ঞার বলে চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন আগুন বর্ষিত হইতে থাকে। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কথাই বল, বা ইতালীর চতুর্দ্দশ শতাব্দী বা উনবিংশ শতাব্দীর ন্যায়ের রাজ্য বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথাই বল, ও সকলই প্রতিজ্ঞারূপ মহাযজ্ঞের ফল!

মনোরাজ্যে যে রাজা নয়, সে মানুষই নয়। সে একরূপ পশুকুলের মধ্যে গণ্য। সে রিপুর অধীন, সে বিলাসের দাস, সে প্রলোভনের ক্রীড়া-পুত্তলি, সে যশপ্রশংসার ক্ষণ-নর্ত্তক! প্রশংসার দুই তুড়ি দেও, সে অমনি হাসিয়া উঠিবে, একটু সম্মান প্রতিপত্তির আশা-বাঁশি বাজাও, সে তোমার যত বিরোধীই হউক না কেন, সে অমনি মাথা নোয়াইয়া তোমার পায়ে পড়িবে। দুটী সুন্দরী রমণী লইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াও, সে অমনি আড় নয়নে চাহিয়া, আপনার চরিত্রের বিনিময়ে ক্ষণসুখ কিনিতে ব্যস্ত হইবে। আমাদেরও অবস্থা তাহাই। আমরা ঘটনার দাস। এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য—এত অর্থাভাব—তবুও আমরা হাসিতে ছাড়ি না। এত ইংরাজের অত্যাচার—এত পীড়ন—নিমিষে একটু সম্মান দিলে অমনি ভুলিয়া ইংরাজের পায়ে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, দুই বাহু তুলিয়া নাচি। দুই পয়সা

লাভের সম্ভাবনা থাকিলে, মত বল, ধর্ম্ম বল, বা বক্তৃতা ও লেখার সুর বল, সব পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিতে পারি। আমাদের না আছে চরিত্র, না আছে প্রতিজ্ঞার বল, না আছে ধর্ম্ম, না আছে জীবন। কি আছে? ঘটনার উপর ঘটনার আঘাতে উঠিতে এবং বসিতে একদল হুজুগপ্রিয় লোক এই ভারত-ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে! অধ্যবসায়হীন, বলবুদ্ধিহীন, বিদ্যাসম্পদ-হীন, চরিত্র ও ধর্ম্মবিহীন একদল হুজুগপ্রিয় নর-পশু নর-মানুষ এখন বিস্তৃতভাবে ভারত-ক্ষেত্রে সঘন মুহু মুহু বিচরণ করিতেছে! কেন ভারতের মুখে এত অমাবস্যার ঘনঘটা? এত হিতৈষী থাকিতেও কেন এত দুর্দ্দশা? এত লোক থাকিতেও কেন এত অস্থিরতা? এ কথার একমাত্র উত্তর, মানুষ আছে বটে, কিন্তু মনোরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, এমন রাজা নাই। এমন লোক নাই, যে আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কঠোর সাধনার পর মহা প্রতিজ্ঞারূপ অটল ভিত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত—যে লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য অনলে ঝাঁপ দিয়াও মরিতে পারে। প্রতিজ্ঞায় অটল যে নয়—সে ঘটনার দাস। ভারত প্রতিজ্ঞামন্ত্র-হীন জড়-ভরত, তাই এত দুর্দ্দশা! কেবল আমোদ, কেবল হুজুগ—কেবল বিলাস, কেবল পোষাক পরিচ্ছদের বাহ্য চটক! একটু আগুনেরও পরিচয় পাওয়া যায় না! কি দুর্দ্দিন!

এত হাসি, এত আন্দোলন, এত আস্ফালন কিসের? এত নৃত্য, এত বাদ্য, এত কোলাহল, এত বেশভূষা কিসের?—ভারতের আজ বড় মলিন বেশ, অথচ তোমরা এত হাসিতেছ কেন বলত?—যদি ম্যাট্‌সিনি বা রিয়েঞ্জী, পার্কার বা গ্যারিবল্‌ডি এদেশে জন্মিত, তবে আজ তাঁহারা গভীর দুঃখের কালিমা পরিধান করিয়া নির্জ্জনে কাঁদিতে বসিতেন! সেই ক্রন্দনের ভিতর হইতে তাঁহারা নবজন্ম লাভ করিয়া জগতে সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেন! আর আমরা? কেবল নাচি, কেবল হাসি! কেবল বক্তৃতা করি, কেবল বিলাস-পোষাক পরিয়া যশমান ও স্বার্থ অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ভিখারীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াই! হা ধর্ম্ম, হা দেশ-হিতৈষিতা, হা কর্ত্তব্য-বোধ!!

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে এত ঘটনা ঘটিল, কিন্তু একটাও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মহাবীর এই ভারতে জন্মিল না। ঘটনার দাসত্ব করিতেই ভারতবাসীর জীবন গেল, ঘটনা আর ভারতবাসীর দাসত্ব স্বীকার করিল না। তৃণের জীব তৃণ লইয়াই রহিল, স্বাধীনতার মুখ আর দেখিল না।

যে আপন মনোরাজ্যে স্বাধীন নয়—সে কিরূপে স্বাধীনতা পাইবে? তাই কোটী কোটী ঘটনা, কোটী কোটী অবস্থা ভারতবাসীকে উলটি পালটি কত রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল, একবার দেখ। আজ যদি গবর্ণমেণ্ট ইঙ্গিত করে, কাল, এমন যে জাতীয় মহাসমিতি (National Congress) তাহাও উঠিয়া যায়! শিশু বালক হয়, বালক যুবক হয়, যুবক বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধ মরে। যে জন্মে, সেটীই মরে! কি দুঃখ, এদেশে একটীও অগ্নিময় নব উদ্যমপূর্ণ যুবক মস্তক তুলিল না। যেটী উঠিল, সেইটীই মরিল। যেটী মাতিল, সেইটীই ডুবিল। একটীও এমন অক্ষয় অমর জীব জন্মিল না, যাঁর প্রতিজ্ঞাবলে শত শত ঘটনা নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়;—যাঁর প্রতিজ্ঞা বলে দেশের বায়ু আমূল পরিশুদ্ধ হয়; যার তেজে গবর্ণমেণ্ট কম্পিত হয়! ভারতবাসি, এই হুজুগপ্রিয়তার দিনে একথাটী একবার ভাব।

প্রকৃত বিশ্বাস।

জড় পদার্থের বিশ্বাস, জ্ঞান-মূলক। কোন বস্তুর বিষয় না জানিলে সাধারণত তাহাতে বিশ্বাস জন্মে না। কোন বস্তুকে জানিতে হইলেই ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, সুতরাং বিশ্বাস, ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ জ্ঞানমূলক। এই বিশ্বাস সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত;—প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-লব্ধ ও অপ্রত্যক্ষ-জ্ঞান-লব্ধ। যে সকল বস্তু চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আর যে সকল বস্তু ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হয় নাই, কিন্তু পুস্তক পাঠে অথবা অন্যের কথায় যার জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাকে অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস বলে। যেমন আমার পুস্তক, টেবেল, বাড়ী ঘর—এ সকল প্রত্যক্ষীভূত, সুতরাং এ সকলকে বিশ্বাস করি। বিলাত কখনও দেখি নাই, কিন্তু বিলাতের কথা পুস্তকে, সংবাদ পত্রে এবং লোকের মুখে শুনিয়াছি, সুতরাং বিলাত সম্বন্ধেও বিশ্বাস আছে। ধর্ম্মবিশ্বাসও কি এইরূপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত? স্বতই এ প্রশ্ন মনে উদিত হয়। কথাটীর একটা মীমাংসা প্রয়োজনীয়।

বলিয়াছি, বাহ্য-জগতের জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ভিন্ন আমরা বাহ্য-জগতের কোন বস্তুর পরিচয় পাই না। চক্ষু কর্ণ নাসিকা আদি দ্বারাই আমরা সচরাচর এ পৃথিবীর জ্ঞান লাভ করি। যাহা দেখি নাই,

শুনি নাই, কোনরূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার কোন জ্ঞান আমাদের থাকা সম্ভব কি না? আমাদের বিবেচনায়, তাহা অসম্ভব। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাহা কল্পনা, মস্তিষ্কের ক্রীড়া মাত্র—সত্যের সহিত তাহার বড় যোগ নাই। ইন্দ্রিয়হীন কোন লোক যদি পৃথিবীতে থাকিত, এবং সেই লোকের বাহ্য জ্ঞান কিরূপ জন্মিয়াছে, যদি জানা যাইত, তবে এই প্রশ্নটার একটা সহজ মীমাংসা হইত। কিন্তু ইন্দ্রিয়হীন কোন লোকের অস্তিত্ব থাকা পৃথিবীতে সম্ভব কি না, সেটীও গুরুতর সন্দেহের বিষয়। কোন পুস্তক পাঠে আজ পর্য্যন্ত এরূপ বিবরণ অবগত হই নাই। সুতরাং এ প্রশ্নের সহজে মীমাংসা হইবার উপায় নাই। আমাদের বিবেচনায়, বাহ্য-জ্ঞান লাভের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ভিন্ন এ পৃথিবীতে আর উপায় নাই। মানুষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সকল জ্ঞান লাভ করিবে, ইহাই বিধাতার লীলা, ইহাই খেলা। সুতরাং কোন বস্তুতে বিশ্বাস জন্মিবার পূর্ব্বে তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া প্রয়োজন। উপরে যে এই শ্রেণীর বিশ্বাসের কথা বলা হইয়াছে, এই দুই শ্রেণীতেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগ আছে। নয় দেখিয়াছি, নয় শুনিয়াছি, নয় স্পর্শ করিয়াছি, নয় আস্বাদন করিয়া লইয়াছি,—তারপর বস্তুর জ্ঞান জন্মিয়াছে। বিশ্বাস জন্মিবার পূর্ব্বে, তবে, প্রতি বস্তুর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধেও কি এই কথা? স্বতঃই একথাটী মনে উদিত হয়। সুতরাং কথাটার একটা মীমাংসা চাই।

সাধকেরা বলেন, বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। এই ধর্ম্মবিশ্বাস কি প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়-গোচরীভূত জ্ঞান-সাপেক্ষ?—না অন্তরের সহজ-জ্ঞান-সাপেক্ষ? এ প্রশ্নের দুই রকম উত্তর জগতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর সাধকেরা বলেন, “তিনি রূপ গন্ধ রসহীন, অতীন্দ্রিয়;—তাঁহাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, পাওয়া যায় না, তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁহাকে কেবল অনুভব করা যায়।” আর এক শ্রেণীর সাধকেরা বলেন, “তিনি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, সগুণ লীলা রসময় হরি;—তাঁহাকে দেখা যায়, ধরা যায়, স্পর্শ করা যায়” ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর সাধকেরা বলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, এ সকলের কিছুই তিনি নন্। তিনি জল নন্, বায়ু নন্, বৃক্ষ নন, ফুল নন্, ফল নন, সৃষ্ট বস্তুর কিছুই তিনি নন, ইত্যাদি। অপর শ্রেণী বলেন, এই যে পরিদৃশ্যমান জগত—ইহার প্রত্যেক বস্তুতেই তিনি, অথবা প্রত্যেক বস্তুর প্রাণ তিনি। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করি, সে তাঁরই জ্ঞান। এক ভিন্ন দুই

নাই। একজনই শতধা, সহস্রধা হইয়া বিভিন্ন রূপ ধরিয়া মানুষের প্রাণ হরণ করিতেছে। তিনি ভিন্ন এ জগতে আর কিছুই নাই। কোন্ শ্রেণী সাধকের মত সত্য, সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন দেখি না। তবে এইমাত্র বুঝি, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান জন্মে না। বাহ্য বস্তুর জ্ঞান ভিন্ন শক্তির জ্ঞান, চিন্ময়ের জ্ঞান-লাভও অসম্ভব। কেন, ক্রমে বলিতেছি।

প্রেম, এই জগতের একটা শক্তি। এই প্রেমের জ্ঞান আমাদের কেমনে জন্মে? প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মায়ের হাস্যময়ী মুখ দেখিলাম। মায়ের কোল, সন্তানের নিকট বড় মিষ্ট। কি দেখে, কিছুই বুঝে না.—কিন্তু শিশু তবুও মায়ের ক্রোড় ছাড়ে না। ঐ ক্রোড়ে থাকিয়া থাকিয়া শিশু এই স্বর্গের মন্দাকিনী প্রেমের আস্বাদন পাইয়া জগতে অবতরণ করিল। দৃষ্টান্তের বাহুল্য বাড়াইয়া আর প্রয়োজন নাই। এইরূপ আমরা যত শক্তির জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সবই জড় জগতের সংঘর্ষণ হইতে। সকলেই জানেন, আতার পতন দেখিয়া নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। রন্ধনের বাষ্প দেখিয়া ষ্টিম শক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ সকল শক্তির জ্ঞান জড় বস্তু হইতে মানুষ উপার্জ্জন করিয়াছে, একথা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে। এটা একটা অবান্তরিক কথা, সুতরাং বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

শক্তি কি? এক কথায় বলিতে গেলে, জড়ের তেজ বা কাজ। জড় কি? না পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণু কি? অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম জড়ের অংশ; অর্থাৎ যাহা কল্পনাও করা যায় না। জড়ের অংশ অথচ বিভাগ করা যায় না, এমন জিনিসটা কি? বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কিছুই বলে না, আমরা বলি—তাহা শক্তি। তবেই দেখ, জড় কি? না বিন্দু বিন্দু শক্তি রাশীকৃত হইয়া উৎপন্ন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতেই হইবে। তবেই দেখ, এই যে জড়ময় জগত, এ আর জড়ময় জগত নয়, এ শক্তিময় জগত। ঐ প্রকাণ্ড অট্টালিকা, উহা যেমন অলক্ষিত শক্তির ঢেউ, আর ঐ যে অভ্রভেদী হিমাচল, উহাও সেইরূপ অলক্ষিত শক্তির তরঙ্গমাত্র। কোথা হইতে এ সকল আসিল? খুব চিন্তা কর, খুব ডুবিয়া যাও, জড়ের পশ্চাতে এক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। অট্টালিকা কে নির্ম্মাণ করিয়াছে? না মানুষে। মানুষ কে? একটা দেহধারী শক্তি। এ আত্মময় শক্তি কোথা হইতে আসিল? সেই

আদি-শক্তি-কারণ (First cause) হইতে ; এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব আদিশক্তি-কারণ হইতেই এই অট্টালিকা উদ্ভূত ; এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য।

শক্তির পরিণাম শক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? যে যাহা, সে তাহাই প্রসব করে। শক্তি শক্তিই প্রসব করে ? অতএব ঐ অট্টালিকা জড়ময় শক্তিস্তম্ভ মাত্র। এইরূপ জগতের সকল পদার্থ। এই যে শক্তি, এই শক্তির জ্ঞান আমরা প্রতিনিয়ত জড়ময় জগতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপার্জ্জন করিতেছি। ইন্দ্রিয়-বিচ্যুত আত্মা পরকালে কিরূপ জ্ঞানলাভ করিবে, সে সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। সংসার-বিদ্যালয়ের শিক্ষা যে ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ, ইহাই এখন বুঝিতেছি। আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কয়েকখানি মেঘ উড়িয়া বেড়াইতেছে। মেঘ কি ? জলকণার সমষ্টি। জল কি ? একটা ভূত মাত্র। ঐ মেঘে মেঘে হঠাৎ মহা ঘর্ষণ আরম্ভ হইল। দিক কাঁপিল, ভীষণ নাদে বিদ্যুৎ গর্জ্জিল। ঐ বিদ্যুৎটা কি জিনিস, বল ত ? ইহাকে শক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পার না। বাতাসে ও নদীতে সংঘর্ষণ হইলে ভীষণ তরঙ্গ, কুল প্লাবিত করিয়া, আরোহী সমেত নৌকাকে অতলে ডুবাইয়া কি এক ভীষণ শক্তির পরিচয় দিতেছে, দেখ। জল ও অগ্নির সংঘর্ষণে বাষ্পীয় জাহাজ ও গাড়ীতে কি অত্যাশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, দেখ। যে বলে, জড়ে শক্তি নাই, সে এখনও শক্তিতত্ত্ব বা জড়-তত্ত্ব কিছুই বুঝে নাই। একটী সামান্য মানুষ রাস্তা দিয়া যাইতেছে। স্বভাব অতি বিনীত, অতি মৃদু, শরীর অতি জীর্ণ শীর্ণ। হঠাৎ সম্মুখে এক লম্পট একটী সতীর উপর বল প্রয়োগ করিতেছে, সে দেখিল। যাই দেখিল, অমনি চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, শিরায় শিরায় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ জ্বলিল—শীর্ণ শরীরে প্রমত্ত হাতির বল আসিল। সেই অদম্য বলের নিকট পরাজিত হইয়া লম্পট ভয়ে ভয়ে পলায়ন করিল। এই যে ক্রোধ, এটা কি বলত ? জড় মানবদেহের শক্তি বই আর কিছুই নয়। চেতন জড়ময় মানুষের কথাই বল, আর অচেতন জড়ময় পদার্থের কথাই বল, সকলই শক্তিময়। শক্তির বিন্দু—অনন্ত শক্তির বুদ্‌বুদ্‌ এই সান্ত জড় জগৎ। অনন্তের জ্ঞান এই পৃথিবীতে জন্মে না ত আর কোথায় ?

বোধ হয় একথা বুঝিতে আর বাকী নাই যে, ইন্দ্রিয়ময় মানব, জড়ময় পদার্থপুঞ্জের যে জ্ঞানলাভ করিতেছে, সে জ্ঞান আর কিছুই নয়, সে জ্ঞান কেবল চিন্ময় শক্তির। শক্তি আকারবিহীন। সুতরাং এই সাকারের ভিতরের আকারহীন চিন্ময় শক্তির জ্ঞান, সাকার দেহধারী নিরাকার

আত্মা এই ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে উপার্জ্জন করিতেছে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সেই চিন্ময় পরমাত্মা কোথায়? মানুষকে বলিতেই হইবে, এই জড়ময় জগতের পদার্থপুঞ্জের অন্তরালে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদার্থ, পদার্থ নয়; ইহা শক্তির সমষ্টিমাত্র। শক্তি কি? না সেই আদি শক্তি-কারণের ঢেউ। অতএব এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই পদার্থপুঞ্জ একেরই বিকাশ মাত্র। বিকাশই বল, পরিণতিই বল, বা রূপই বল, যা খুসি। তবেই দেখ, চিন্ময়ী অনন্তরূপিনীর অনন্ত রূপ—এই সান্ত প্রকৃতিতে প্রতিফলিত। তুমি আমি, তিনি সে, বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী—সকলই সেই আদি কারণ (First cause) হইতে সমুদ্ভূত। একেরই লীলা, একেরই খেলা। যে ব্যক্তি স্রষ্টাকে, সৃষ্ট জগৎ হইতে পৃথক মনে করে, সে পরমাত্মার সগুণ সত্তায় আজও অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি সেই অনন্ত দেবতাকে সীমা রেখায় আবদ্ধ করে, সে বিধাতার নির্গুণ সত্তায় অবিশ্বাসী। নির্গুণ যিনি, তিনি সময়ান্তরে সগুণ; সগুণ যিনি, তিনি অবস্থান্তরে নির্গুণ। অথবা তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, নিরাকার হইয়াও আকারধারী; আবার তিনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ, আকারধারী হইয়াও নিরাকার। কারণ, সৃষ্টির কোন একটী বস্তুইত তিনি নন্। সমস্ত বস্তুর সমষ্টিরও উপরে তিনি। কোটী জগত কোটী ব্রহ্মাণ্ড তাহার সত্তার এক বিন্দুমাত্র। একটী বৃক্ষ তিনি নন্, এক বিন্দু বারি তিনি নন্, অথবা সমস্ত বৃক্ষের সমষ্টি বা জলের সমষ্টিও তিনি নন। পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখা যায়, এ সকলের সমষ্টিরও কত উপরে তিনি, তাহা মানুষ ধারণা করিতেও পারে না। সগুণবাদী এবং নির্গুণবাদীর, জড়বাদী ও চেতনবাদীর, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর একটী মিলনের সুন্দর স্থান আছে। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী ভিন্ন কেহই তাহা বুঝিতে পারে না।

কিন্তু সে সকল কথা এখন থাকুক। যদিও সহজ হইয়া আসিয়াছে, তবু আমাদের প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। ধর্ম্মের বিশ্বাস, প্রত্যক্ষ-জ্ঞানলব্ধ, না অপ্রত্যক্ষ-জ্ঞানলব্ধ? প্রত্যক্ষ-জ্ঞানলব্ধ ভিন্ন বিশ্বাসের উদয় অসম্ভব। সংসারের জ্ঞান, ইন্দ্রিয়লব্ধ;—সুতরাং এই পৃথিবীতে পরমাত্মার জ্ঞানও ইন্দ্রিয়লব্ধ। মাতার স্নেহ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কি না? সকলেই বলিলেন, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। মাতার স্নেহের মূলে কি বিদ্যমান? ঐ অনন্ত প্রেমরূপিনীর এক বিন্দু প্রেম। ঐ প্রেমের জ্ঞান কোথায় পাইলাম? মাতার ক্রোড়ে।

বল ত প্রত্যক্ষ না অপ্রত্যক্ষ ? বলিতেই হইবে, মাতার ভালবাসা প্রত্যক্ষ। নিত্য দেখি, আকাশে চাঁদ হাসে, বাগানে ফুল ফুটে। কেমন মধুর স্নিগ্ধ ঐ চাঁদের কিরণ, কেমন মনোহর ঐ ফুলের সুষমা। দেখিলে মন মোহিত হয়। এত সৌন্দর্য্য কোথা হইতে আসিল ? কার রূপ, কার শোভা, কার সৌরভ, বল ত ? জড়ের ? জড় কে, জড় কি ? জড় ত শক্তির ঢেউ মাত্র। তবেই দেখ, ঐ সৌন্দর্য্য যেন আর কাহারও। ভাবিয়া দেখ, প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইতেছি তবে কিসের ? একটী সুন্দর জিনিসের। সেটী কি জিনিস ? শক্তিমাত্র। শক্তির জ্ঞান, দেখ তবে ঐ জড়ের সাহায্যেই জন্মিতেছে। এইরূপ যত ভাবিব, দেখিতে পাইব—যা দেখি, যা শুনি, সকলই বিধাতার লীলামাত্র। আমিও তাঁহার, যা দেখি তাহাও তাঁহার। চক্ষু মেলিলেও তিনি, বুজিলেও তিনি। আঁধারেও তিনি, আলোকেও তিনি। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। জড়ের অন্তরালে সেই আদি শক্তি ওতঃপ্রোতভাবে নিহিত।

ধর্ম্মবিশ্বাস কি তবে এত সোজা ? তবে কি সকলেই তাঁহাকে দেখিতেছে ? বিধাতা ধর্ম্মবিশ্বাসকে জলের ন্যায় সহজ ও সরল করিয়াই প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু মানব মোহমায়ায় আবদ্ধ হইয়া, জড়বুদ্ধিতে তাঁহাকে জটিল করিয়া ফেলিতেছে, অথবা দেখিয়াও তাঁহাকে দেখিতেছে না। তিনি সকলের নিকট কোন না কোন রূপে প্রকাশিত হইতেছেন ; কিন্তু মানুষ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে না,—বা দেখিয়াও অবিশ্বাস করে। মানুষ তাঁহাকে এবং এই জগতকে পৃথক মনে ধরিয়া লয়। তাঁহাকে পাইবার জন্য তাই এখানে সেখানে যায়। রামপ্রসাদের ন্যায় সাধক ঘরে বসিয়াই তাঁহাকে পায়। ঈশার ন্যায় বিশ্বাসী ব্যক্তি পাহাড়ে পর্ব্বতে, বাড়ী ঘরে, সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখে। যে দেখিয়াও তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে না, তাহার আর উপায় কি ? সোজা ধর্ম্মকে মানুষ বড় জটিল করিয়া ফেলিয়াছে।

জড় পদার্থের জ্ঞান যেরূপ ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ, চিন্ময় পদার্থের জ্ঞানও সেইরূপ ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ। জড়ের ভিতরেই চিন্ময় শক্তি নিহিত। এই চিন্ময়ের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জড় পদার্থের সংঘর্ষণে আসিতেই হইবে। এই জন্যই বুঝি, লীলাময় হরি, শক্তিকে জড়দেহে আবদ্ধ করিয়া এই জগতে রাখিয়াছেন, এবং মানুষের আত্মাকেও ইন্দ্রিয়ময় জড়দেহে

আবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। মানুষের শরীরের ভিতরে যে আত্মা, ইহা যেমন পরমাত্মার শক্তির অংশ, বৃক্ষাদির ভিতরেও সেইরূপ শক্তিরূপী তেজ বিরাজিত। এই শক্তিরূপী চিন্ময়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা চাই বই কি? জড় বস্তুর বিশ্বাস দুই রূপে উৎপন্ন;—এক দেখিয়া, আর এক শুনিয়া। দেখিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান; শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা কল্পনামিশ্রিত। কলিকাতা সহর দেখিয়াছি, ইহার এক রূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে। বিলাত দেখি নাই, বিলাতের কথা শুনিয়াছি। বিলাত সম্বন্ধে আর এক রূপ জ্ঞান আছে। কলিকাতার জ্ঞান এবং বিলাতের জ্ঞানে কত পার্থক্য! সেইরূপ ভগবানকে, যে রূপেই হউক, যে কোন দিন জড়ে বা চেতনে প্রত্যক্ষ করে নাই, কিন্তু শাস্ত্রে বা লোকমুখে কেবল তাঁর কথা শুনিয়াছে, ভগবান সম্বন্ধে তার জ্ঞান বিলাতের জ্ঞানের ন্যায় কল্পনা-মিশ্রিত। সন্দেশের উদাহরণটীও লওয়া যাইতে পারে। এক জন সন্দেশ খাইয়াছে, এক জন সন্দেশের মিষ্টত্বের কথা শুনিয়াছে; দেখ, উভয়ের জ্ঞানে কত পার্থক্য! বিশ্বাস জ্ঞান-মূলক। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে অর্থাৎ জানা হইলেই বিশ্বাসের উদয় হয়। কিন্তু ঐ উভয়রূপ বিশ্বাসের মধ্যে কত প্রভেদ।

ধর্ম্ম-বিশ্বাসকেও তবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-লব্ধ ও অপ্রত্যক্ষ-জ্ঞান-লব্ধ। অর্থাৎ এক রূপ বিশ্বাস—ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া উৎপন্ন, আর এক রূপ বিশ্বাস—লোকের নিকট বা শাস্ত্রের নিকট শুনিয়া উৎপন্ন। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-লব্ধ-বিশ্বাস কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার কতক আভাস দিয়াছি, আর কতক পরে দিব। অপ্রত্যক্ষ-জ্ঞান-লব্ধ বিশ্বাস সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করিতেছি।

কোন কোন লোক বলেন, বিশ্বাস সাধন-সাপেক্ষ। সাধন-সাপেক্ষ বস্তুমাত্রই মানুষের আয়ত্তাধীন। আমি ইচ্ছা করিলে ও চেষ্টা করিলে আমার ক্রোধকে দমন করিতে পারি, আমার ইচ্ছা হইলে এবং চেষ্টা করিলে মনকে এক বিষয়ে অভিনিবেশ করিতে পারি। এ গুলি যেমন সাধন-সাপেক্ষ, আমাদিগের বিবেচনায়, ধর্ম্মবিশ্বাস সেরূপ সাধন-সাপেক্ষ নয়। সাধনের সহিত নীতির যোগ,—সংসারের যোগ, শরীরের যোগ। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের যোগ, স্বর্গের যোগ, আত্মার যোগ। নীতি সাধন-সাপেক্ষ, সংসার মানুষের আয়ত্তাধীন, শরীরের উপর মানুষের স্বাধীন-কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞান (Free-will.)

আছে। ইচ্ছা করিলে মানুষ ভাল হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে মানুষ মন্দও হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর মানুষের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। এ স্থানে মানুষ সম্পূর্ণ বিধাতার অধীন। তিনি বিশ্বাসী না করিলে, তিনি আপনাকে মানুষের নিকট প্রকাশ না করিলে, আপনি প্রকাশিত হইয়া মানুষকে দেখা না দিলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তবে একথা ঠিক তাঁর কৃপালাভের আয়োজন চাই। নীতি প্রভৃতি পালন করা সেই আয়োজন। এ সকল মানুষের সম্পূর্ণ সাধন-সাপেক্ষ। প্রকৃত বিশ্বাস তাঁর কৃপা-প্রসূত, মানুষের সাধন-সাপেক্ষ নয়।

তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাস সাধন-সাপেক্ষ বটে। ভগবানের কথা ইচ্ছা করিলে শুনিতে পারি। শাস্ত্র পাঠ, সাধু সঙ্গ লাভ, নির্জ্জন চিন্তা— এ সকলই মানুষের ইচ্ছার ফল, সুতরাং সাধনার অধীন। ধর্ম্ম জগতে এ সকলের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী না হইলে ধর্ম্ম সুদূর-পরাহত। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাসীরা অন্যের মুখে শুনিয়া অর্থাৎ কল্পনা বা তর্ক যুক্তি করিয়া বিধাতাকে মানেন; তাঁহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি অস্থায়ী বালুকাস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। কল্পনার ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিলে বা অধিকতর তীক্ষ্ণ যুক্তির সংঘর্ষণে আসিলেই তাহা উড়িয়া যায়। কথাটা এই, যাহারা সাধুর মুখে, ভক্তের মুখে শুনিয়া বা শাস্ত্রপাঠ করিয়া, বা তার্কিকের মীমাংসায় ভগবানকে মানে, তাহারা কালে অন্যের মুখে অন্য রূপ শুনিলে বা প্রবলতর তার্কিকের তর্কবলের সংঘর্ষণে পরাস্ত হইলে আপন বিশ্বাস উড়াইয়া দিতে পারে। এ ভিত্তি অস্থায়ী, আজ আছে ত কাল না থাকিলেও থাকিতে পারে। এ ভিত্তি কল্পনাময়, স্বপ্নময়, মোহময়,—চঞ্চল, অস্থায়ী। এইরূপ অস্থায়ী বিশ্বাস-সম্বলে যাহারা কোন ধর্ম্ম সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা এক সময়ে খুব মাতামাতি করিতে পারে, ধর্ম্মের উচ্ছ্বাসে ডুবিতে পারে,—অন্য সময়ে পাষাণের ন্যায় কঠিন হইতেও পারে। এইরূপ বিশ্বাসীর কিন্তু সংখ্যাই অধিক। গুরুর মুখে শুনিয়া, বা কোন অভ্রান্ত শাস্ত্রের আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিয়াই ইহারা মাতামাতি করে, তার পর যখন বুঝে যে এ সকলে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ হয় নাই, তখনই হাহাকার করিতে থাকে; তখনই মানুষ এখানে সেখানে ছুটাছুটী করিতে আরম্ভ করে, এটা ছাড়িয়াও ওটা ধরে, ওটা ছাড়িয়া এটা ধরে। কত ধর্ম্মমত ছাড়ে, কত ধর্ম্মমত ধরে! দেশ হইতে দেশান্তরে, তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে, লোক হইতে

লোকান্তরে শান্তির অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়; এক ধর্ম্মসমাজ ছাড়িয়া অন্য সমাজের আশ্রয় লয়, এক প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রণালী ধরে। এইরূপ অস্থায়ী চঞ্চল অপ্রত্যক্ষ-জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাসীকেই কিন্তু পৃথিবীর লোকেরা ধার্ম্মিক বলিয়া ব্যাখ্যা করে। হা ধর্ম্ম, তুমি কোথায়!

প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-লব্ধ বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস। যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সে তর্ক যুক্তি করিয়া সে বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না। আমার সম্মুখে একটী দোয়াত রহিয়াছে, দেখিতেছি। তুমি হাজার চেষ্টা কর, হাজার তর্ক কর, আমার এ জ্ঞান কখনই উল্টাইবে না। জগত আছে, সুতরাং ঈশ্বর আছেন, এ কথা কে বলে? যে জগতকে দেখিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরকে দেখে নাই। আর যে জগতের মূলে ঈশ্বরকে দেখিয়াছে, সে বলে, ঈশ্বর আছেন, তাই জগত আছে। সৃষ্টি-কৌশলে স্রষ্টার পরিচয় বিষয়ক যুক্তি (Design argument.) যে ব্যক্তি দেয়, যে ঈশ্বরকে প্রকৃত পক্ষে দেখে নাই। যে বিধাতাকে দেখিয়াছে, সে বলে, তিনি ভিন্ন এ জগতে আর কিছুই নাই; তিনি আছেন, তাই জগতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। তর্ক যুক্তি করিয়া তাহাকে আর ঈশ্বরের সত্তা বুঝাইতে হয় না। এই যে ঈশ্বরকে দেখার কথা বলিতেছি, এ দেখা তাঁর কৃপা-প্রসূত। তাঁর কৃপা ভিন্ন তাঁকে দেখা অসম্ভব। প্রকৃতবিশ্বাস আপনি উদ্ভূত (intuitive.)। জড়ময় জগতের বস্তু-জ্ঞান অল্প কিম্বা অধিক পরিমাণে অনেকের জন্মিয়াছে, কিন্তু তাঁর জ্ঞান, তাঁর বিশ্বাসের উদয় হয় নাই। মানুষ জড়বস্তু দেখিয়াই ক্ষান্ত থাকে, জড়ের ভিতরে যে চিন্ময় শক্তি আছে, সে জ্ঞান লাভ করে না। সে জ্ঞান লাভ করিতে বিধাতার কৃপা চাই। তাঁহার কৃপা ভিন্ন তিনি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হন না। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলে খাটী বিশ্বাস জন্মাও অসম্ভব। সুতরাং তাঁর বিশ্বাস লাভের জন্য তাঁর উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তিনি দেখা না দিলে, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি যেমন সকলের ভিতরেই প্রকাশিত;—সেইরূপ তাঁর বিশ্বাসও সকলের অন্তরে (inborn) স্বতঃ-প্রতিষ্ঠিত বা সহজাত। মানুষ তাঁহাকে দেখিয়াও, কি জানি কেন, তাঁহাকে না দেখার ন্যায় মনে করিয়া অন্যত্র ধাবিত হয়। তিনি কিন্তু ঘটনার অন্তরাল দিয়া, মানুষের জীবনে, চরিত্রে, কোন না কোনরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। সেই পূর্ণ আদি-কারণকে অপূর্ণ মানুষ, কখনও আপন শক্তিতে বুঝিতে পারিত না, যদি তিনি আপনি প্রকাশিত না হইতেন। বায়ু যেমন সকলের পক্ষে

সহজ-লভ্য, জল যেমন সকলের পক্ষেই সহজ-প্রাপ্য, তিনিও সেইরূপ সকলের পক্ষে সহজ-লভ্য। মানুষের অতি কাছে কাছে তিনি। কাছে কাছে কেন, প্রাণে প্রাণে তিনি। আত্মার মূলে, ঘটনার মূলে, জড়ের মূলে, চেতনের মূলে অন্বেষণ কর, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তিনিই সৎ, তিনিই আদি কারণ, তিনিই নিত্য। কিন্তু এ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাঁর কৃপা চাই। তাঁর কৃপা ভিন্ন তাঁর বিশ্বাস কেহ পাইতে পারে না।

যে তাঁকে দেখে নাই, তাকে তাঁর কথা বুঝান বড় দায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেখিয়াও তাঁর পরিচয় লয় নাই, তাঁহাকে সেই নিত্য দেবতার কথা বলিয়া বুঝান যায় না। বলিয়া বুঝাইতে গেলেই ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাসের উদয় হয়। সে বিশ্বাসকে আমরা বিশ্বাসই বলি না। প্রকৃত বিশ্বাস প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-লব্ধ ;—পরোক্ষ-জ্ঞান-লব্ধ মোটেই নয়।

প্রকৃত বিশ্বাসী লোকের লক্ষণ কি ? যিনি বিধাতাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, প্রাণের মূলে বা ঘটনার মূলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি অটল ভিত্তিতে আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া অটল হইয়া গিয়াছেন। স্থির, গম্ভীর তাঁহার প্রকৃতি। তিনি যশ নিন্দার অতীত। সহস্র লোকে তাঁহার প্রশংসা করুক, তাঁহার মনে কোন পরিবর্ত্তন নাই। সহস্র লোকে তাঁহার নিন্দা করুক ; —তাঁহার ভ্রুক্ষেপ নাই। মনের গতি সংসারের অসার গণনার একস্তর উপরে উঠিয়া গিয়াছে। পরলোকে, পরব্রহ্মে তাঁহার প্রাণ মন প্রতিষ্ঠিত। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, জীবন মরণ—এ সকল তাঁর নিকট বড় একটা গণনার বিষয় নয়। মৃত্যু তোমার আমার নিকট কষ্টের বা দুঃখের কারণ, কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীর পক্ষে সম্পদ লাভ। দুঃখ দারিদ্র্য, বা আন্দোলন নির্য্যাতনকে তুমি আমি ভয় করি বটে, কিন্তু খ্রীষ্টের ন্যায় বিশ্বাসীর নিকট উহা কোন গণনার বিষয় নয়। সকল অবস্থাতেই বিশ্বাসী সন্তুষ্ট। চঞ্চলতা ভয়ে যেন পলায়ন করিয়াছে। তাঁর চরিত্র আগুনের ন্যায় ;—পাপ সেখানে ঠাঁই পাইবে ?—পাপ ভয়ে কোন্ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার খোঁজও নাই। একজন মানুষ কাছে থাকিলে পাপ কার্য্য করিতে পারি না, আর বিধাতাকে যদি কাছে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তবে পাপ কার্য্য করিব কোন্ সাহসে ? প্রকৃত বিশ্বাসী যতক্ষণ বিশ্বাস-বলে বলীয়ান, ততক্ষণ তিনি পাপ প্রলোভনের অস্পৃশ্য। সেখানে যেন ধু ধু করিয়া সদা বিশ্বাসের আগুন জ্বলিতেছে। অবসন্নতা, মলিনতা, অলসতা, নৈরশ্য, নিরানন্দভাব—এ সকলই ভস্মীভূত হইয়া

গিয়াছে। তেজীয়ান পুরুষ স্বর্গের তেজে অটল, অচল হইয়া রহিয়াছেন। থিওডোর পার্কারের মৃত্যুর পর তাঁহার পরম শত্রু পক্ষীয়েরাও পার্কার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "যেন একটা আগুনের হল্কা আসিয়া দেশটাকে দগ্ধ করিয়া গেল।" কি তেজ, কি সাহস! প্রকৃত বিশ্বাসী রাজাকেও ভয় করেনা, কর্ত্তব্যের অনুরোধে কারাবাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। মহাত্মা ম্যাট্‌সিনি কারাবাসকে পরম সুখের স্থান বলিয়া মনে করিতেন। একটু কথার এদিক ওদিক করিলে খ্রীষ্ট প্রাণে বাঁচিতেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে তাহা করা অসম্ভব। প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করেন, সমস্ত পৃথিবী চূর্ণ হইয়া গেলেও তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। বিশ্বাসী যখন কথা বলেন, তখন পৃথিবী কম্পিত হয়, লোক শুনিয়া অবাক হইয়া যায়, স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। যে কথায় কোন আন্দোলন উঠে না, তাহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা, তাহা মৃত, তাহা অসার। যাহার কথায় দেশে মহা আন্দোলন উঠে, সে প্রকৃত আস্তিকের কথা। যে কথায় পাপীর বা অপরাধীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, বুক দুরু দুরু করে, সে বিশ্বাসীর কথা। ম্যাট্‌সিনির কথায় সমস্ত অষ্ট্রিয়া কম্পিত হইয়াছিল। পার্কারের সামান্য বক্তৃতার নিকট শত সহস্র বন্দুকধারী প্রাণ-হন্তার হস্ত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িত। খ্রীষ্টের এক একটী কথা ইজ্‌রেল বংশের প্রাণে যেন বজ্রের ন্যায় বিদ্ধ হইত। আমাদের দেশের মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কথা রাজার প্রাণে, মহা পণ্ডিতের প্রাণেও মহা আতঙ্ক-তরঙ্গ তুলিয়া দিত। মহাত্মা কেশবচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন, দেশের একটা লোক তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে পারে নাই। আপন তেজে যখন তিনি দাঁড়াইয়া কথা বলিতেন, যেন সিংহ গর্জ্জন করিতেছে শুনা যাইত। সেই সময়ে হিন্দু সমাজে কি ভয়ানক আন্দোলন উঠিয়াছিল। সব যেন স্তম্ভিত! প্রকৃত বিশ্বাসীর কথা বজ্রের ন্যায় আন্দোলন উৎপন্ন করে, বজ্রের ন্যায় মানুষের হৃদয়ে অনুভূত হয়, বজ্রের ন্যায় ভ্রম কুসংস্কারকে ভস্মসাৎ করে। গৃহে বসিয়া বিশ্বাসী ফুৎকার দেন, সেই ফুৎকারে শত শত কুসংস্কার ও পাপ উড়িয়া যায়। একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর আবির্ভাবে দেশ পুণ্যময় হইয়া যায়; দেশে ধর্ম্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমাদের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর হুজুগে বিশ্বাসীর কোটী জনের দ্বারাও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিশ্বাসী লোকের উত্থানে সমস্ত পৃথিবী তোলপাড় হইয়া যায়। প্রকৃত বিশ্বাসই মুক্তির পথ, শান্তির মোক্ষধাম। প্রকৃত বিশ্বাস ভিন্ন ধর্ম্ম অসার, মৃত।

গুরুবাদ ও প্রচারবাদ।

"চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা"—আমাদের দেশের একটী প্রচলিত কথা। কথাটী সাধারণ শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু হইলে কি হয়, ইহা অতি সুন্দর কথা, ইহার ভিতরে অতি গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব নিবদ্ধ। এই প্রতারণা এবং চটুলতাপূর্ণ পৃথিবীতে আমি যত বড় ভণ্ড হই না কেন, আমি সর্ব্বদাই অন্যকে সতর্ক করিতেছি, অন্যকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি,—কিন্তু নিজে যে আঁধারে, সেই আঁধারে! অন্যকে ভাল করার ইচ্ছা মন্দ নয়, কিন্তু যতক্ষণ অন্যকে ভাল করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, ততক্ষণ নিজে ভাল হইলে দোষ কি? সকলেই যদি নিজে নিজে ভাল হইত, তবে এ কলুষময় পৃথিবী স্বর্গধাম হইত। কিন্তু তাহা মানুষ হয় না, হইতে চায় না। ধর্ম্মটা যেন নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য। এ পৃথিবীতে কত শত ব্যভিচারী ব্যক্তি যে অন্যের ব্যভিচারের নিন্দা রটাইয়া ফিরিতেছে, কত শত চরিত্রহীন ব্যক্তি যে অন্যের চরিত্রহীনতার নিন্দা ঘোষণা করিয়া ফিরিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। দেখিয়া শুনিয়া এমনই বোধ হইতেছে, বিধাতার যেন কি একটা বাদ রহিয়াছে, মানুষ নিজে ভাল হইবার জন্য চেষ্টা করিবে না, ধর্ম্মকে গুরু পুরোহিতের মস্তকে চাপাইয়া রাখিবে এবং অন্যকে ভাল করিবার জন্য বক্তৃতা করিবে! অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইবে, ইহা যেমন অসম্ভব, চরিত্রহীন অধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান করিতে পারাও তেমনি অসম্ভব। মানুষ এ সহজ কথাটাও বুঝিতে পারে না। সে দিবানিশি হই-চই পূর্ণ আস্ফালন হাঁকিয়া অন্যকে উদ্ধার করিতেই ধাবিত হইবে! "চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা"—কাজেই লোকেরা বিরক্ত হইয়া অবশেষে এই কথা বলিতে বাধ্য হয়।

ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এ পৃথিবীতে যত লোক বাহিরে মাতামতি করিয়া ফিরিতেছে, বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে প্রকৃত ধার্ম্মিক কয়টী? অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, দলের পর দল উজাড় হইয়া যায়, একটীও প্রকৃত নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক মিলে না। চরিত্রে যে অটল, ধর্ম্মবিশ্বাসে যে পাষাণ-ভিত্তি, প্রেমভক্তিতে যে কুসুমনিভ,—এমন মধুর, এমন তেজিয়ান, এমন কোমল সচ্চরিত্র

মানুষ অতি বিরল। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির পরিচয় কিসে পাওয়া যায়? সাধুতা বা সচ্চরিত্রতা কি বলিয়া না বেড়াইলে প্রকাশিত হয় না? বলিয়া যে বেড়ায়, তার সাধুতার নিতান্ত অভাব। প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় পাইবার আর কোন উপায় নাই;—তবে সচ্চরিত্রতার-সৌরভ তার অন্তর্গত ধর্ম্মভাব প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি ভিতরে সৎ, বাহিরে তার আচার ব্যবহার সৎ হইয়া গিয়াছে। এ ভিন্ন চরিত্রের আর পরিচয় নাই। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি মুখে চটুল ব্যক্তিগণের ন্যায় অনর্গল বক্তৃতা বমন করেন না, উচ্চ ধার্ম্মিকতার ভাণ করেন না, কিন্তু তাঁর মুখে চক্ষে বিনয়ের রেখা;—সদা মৃদু মধুর প্রসন্ন বদন-শোভা, তাঁহার মিষ্টালাপ,—তাঁহাকে এই সংসারের অতীত স্থানে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। তিনি নামাবলী বা গৈরিক বস্ত্রে শরীরকে আচ্ছাদন করেন না, অথচ বৈরাগ্য-রূপ নামজ্যোতির অপূর্ব্ব শোভা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিয়া যেন বাহির হয়; তিনি হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন না, অথচ জীবের প্রতি তাঁহার দয়ার অবিরাম স্রোত চলিতেছে! প্রাণগত এ সকল ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে হয় না। তিনি জানেন, বিধাতা যেমন রাখেন, তেমনি থাকিব, বিধাতা যা দেন, তাহাই খাইব। তরণ্য ও অট্টালিকা, উপবাস ও মিষ্টাহার, এ সকল তাঁহার নিকট কোন গণনার বিষয় নয়। তিনি এমন এক অটল স্থানে জীবন-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যেখানে এ সকল চঞ্চলতা কিছুই নাই। তিনি অন্যের মুখে বিধাতার নাম শুনিয়া সুখী নন, আপনি দিবারাত্রি নাম জপেন; একের ইচ্ছাকেই তিনি জীবনে পূর্ণ হইতে দেন, আর সকল বাহিরের চিন্তা পরিহার করেন। তোমার পৃথিবীর উপায় কি হইবে, সে গণনা তাঁহার নাই। তিনি জানেন, যে বিশ্ববিধাতা তাঁহাকে রাখিয়াছেন, তিনিই জগৎকে রাখিবেন। যা করিবার, তিনিই করিবেন। কিন্তু এরূপ তিনি-সর্ব্বস্ব-ময় ধার্ম্মিকের সংখ্যা এই পৃথিবীতে কত বিরল!!

আমরা সাধারণ লোক, আমাদের ধারণা এই, বিধাতা এখন যেন এ সংসারে নাই, এখন আচার্য্য বা প্রচারককেই ধর্ম্মের পাণ্ডাগিরি করিতে হইবে। তাঁহারা তাঁহাকে প্রকাশ না করিলে তিনি যেন অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইবেন! আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের নীতি-পুণ্য—এখন সব গুরু পুরোহিতের হস্তে! তাই দেখ, দলে দলে প্রচারকেরা পৃথিবীতে ধর্ম্মসমাজ গঠন করিতেছে, ধর্ম্মকে সংরক্ষণ করিতেছে, ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে;—মানবের পরিত্রাণের পথ খুলিয়া দিতেছে! ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবে?—

পৃথিবীর পুরোহিতকুল, গুরুকুল,প্রচারককুলের রোষ-কষায়িত দৃষ্টি তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে—পৃথিবীর অসংখ্য সম্প্রদায় তোমাকে গিলিয়া ফেলিবে। চতুর্দ্দিকে এক কথাই শুনা যাইতেছে। একই রূপ কথা, একই রূপ ভাষা, একই রূপ শাস্ত্র চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতেছে। মানুষ, মানুষকে বল পূর্ব্বক ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া ছাড়িয়া দিতেছে। ধর্ম্মের কথা শুনিয়াই এখন লোকেরা নিরস্ত হইতেছে; ধর্ম্ম যে জীবনে পালন করিতে হয়, সে কথা তুলিয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম কথা শুনাইবার কত বিধি প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে, কত আদবকায়দা বাহির হইতেছে, পৃথিবীর রাজা এইরূপ ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিতেছেন, পৃথিবীর সমাজ এইরূপ প্রচারের পথে অনুকূল বায়ু প্রবাহিত করিতেছেন। কত প্রচারক, কত গুরু, কত পোপ,কত শ্রমণ, কত ভিক্ষুক, কত আচার্য্য, পৃথিবীর অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া বাজারে ধর্ম্ম হাঁকিয়া ফিরিতেছেন। ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর পরিচ্ছেদ স্বতন্ত্র, ভাষা স্বতন্ত্র, আহার বিহার, সবই যেন কেমন কেমন! তাঁহারা যেন এ পৃথিবীর লোক নন। তাঁহাদের স্বর ঘানিটানা স্বরের সহিত তুলিত, তাঁহাদের ভাষা যেন সপ্তম স্বর্গের তুলিকায় অঙ্কিত, তাঁহাদের উপবেশনাদি, সে সকলই যেন কিরূপ বিকৃত। কেন বলত? না—তাঁহারা যে স্বর্গের লোক,—ইহলোকের লোক ত নন! ভালই। কাম ক্রোধাদি সম্বন্ধেও কি তাঁহারা বীতস্পৃহ? বিধাতা ক্ষমা করুন, বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা হেতু জীবলীলায় প্রকৃতি-পুরুষের মিলন একান্ত প্রয়োজন, ঐরূপ প্রশ্ন মুখেও আনিও না! এইরূপ ভণ্ড প্রচারকের সংখ্যা যে পৃথিবীতে কত আছে, তাহার সংখ্যা নাই। চিরকাল একটা শ্রেণীকে সংসার হইতে পৃথক করিয়া ধর্ম্মের উচ্চ স্থানে বসাইয়া রাখিলে তাহারা কিরূপে ভাল থাকিবে, বলত? তাহাদেরও ত রক্ত মাংসের শরীর! সেই জন্যই বলি, এই সকল দল তুলিয়া দিলে কি পৃথিবীর কল্যাণ হয় না? প্রত্যেক দলের মূলে দুই চারিজন ভাল লোক আছেন, কিন্তু তাঁহারা নীরব, দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। অল্প জলের পুঁটী মাছই অধিক চড় বড় করে;—গভীর জলের রুই মৎস স্থির, অচল—গম্ভীর। যখন চলিয়া যায়; একটুও শব্দ শুনা যায় না,—একটুও আড়ম্বর নাই। আর চুণা পুঁটীদের কথা?—কত শব্দ,—কত আড়ম্বর,—কত কেলি,—বার মাস যেন কি একটা উৎসব লাগিয়া রহিয়াছে! এই ভারতবর্ষে কত শত যোগী ঋষি, জীবনের আসক্তি ডুবাইয়া, গভীর গহন গিরি-গুহায় গভীর সমাধিতে নিমগ্ন রহিয়াছেন, কেহ

তাঁহাদের খোঁজও রাখে না,—আর ধর্ম্মের পাণ্ডা এক জন রেভারেণ্ড, এক জন তর্কচূড়ামণি, একজন গোস্বামী তোমার বাড়ীতে পা ফেলুন, আর অমনি পৃথিবী তোলপাড় হইয়া যাইবে,—মহা উৎসব, মহা কেলি, মহা ধুম ধাম! বলি, ধর্ম্মটা কি এমনই ঝুঠা জিনিস যে, হাসাহাসি নাচানাচি করিলেই তাহা উপার্জ্জিত হয়? কে না জানে যে, ঈশ্বর নিরাকার, অব্যক্ত, অনন্ত। আর কেই বা জানে যে, মানুষ ক্ষুদ্র, সাকার, সীমাবদ্ধ, ব্যক্ত। মানুষের যতই শক্তি বিকশিত হউক না কেন, মানুষ মনুষ্যত্ব ছাড়াইয়া দেবত্ব লাভে অধিকারী হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরত্ব লাভে কথনই অধিকারী নন্। মানুষ অনন্তকাল উন্নতি লাভ করিলেও ঈশ্বরত্বে, অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ ভাবে পৌঁছিতে পারিবে না। নিমাই চৈতন্য লাভ করিতে পারেন, শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন, যিশু খ্রীষ্টত্বে পৌঁছিতে পারেন, আর না;—মানুষের উন্নতির চরম অবস্থা ঐ খানে। আজ পর্য্যন্ত সেই অব্যক্তকে কেহই ব্যক্ত করিতে পারে নাই,—কথনও পারিবে না। সেই ভূমামহানকে কেহই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে বা দেহ-পিঞ্জরে আজ পর্য্যন্ত ধারণ করিতে পারে নাই—কেহ পারিবেও না। সেই অনন্ত অপারের কেহ কূল কিনারা করিতে পারে নাই—কেহ পারিবেও না। সহস্র বৎসর, লক্ষ বৎসর আয়ু পাও, আর লক্ষ বৎসর তপস্যা কর,—ফল একই—আপনি আপন চেষ্টায় কথনও সেই পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইবে না। আপনি যে ধর্ম্মের ঘর বাঁধে, তার নিকট হইতে বিধাতা অনেক দূর। আপনি যে কর্ত্তাগিরি করে, বিধাতা তাকে লাথি মারিয়া ভূতলে ফেলিয়া দূরে, অতি দূরে, চলিয়া যান। আর যে অনন্যগতি হইয়া তার চরণে পড়ে, তিনি তাহাকে কৃপা করেন। তিনি কৃপা করিয়া মানুষকে যতটুকু তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে দেন, ততটুকু পর্য্যন্ত মানুষ বুঝিতে পারে, আর এক চুলও না। তাঁহাকে পাইবার তিনিই পথ, তাঁর রাজ্যের তিনিই প্রচারক, তাঁর সেবা বা পূজার তিনিই গুরু। আর পথ নাই, প্রচারক নাই, গুরু নাই। এথানে কথা এই, তাঁর কৃপায় তাঁকে যে লাভ করিয়াছে, সেও কি তাঁর কথা বলিতে অধিকারী নয়? আমরা বলি, অধিকার, অনধিকার, কৃপা-প্রার্থীর পক্ষে উভয়ই সমান; অর্থাৎ সে ব্যক্তি প্রচার না করিলেও বিধাতা তাহার চরিত্রের সৌরভে প্রকাশিত হইতেছেন। আর একটী কথা এই, সকলেই তাঁর কৃপার অধিকারী, সকলের জীবনেই তিনি প্রকাশিত। এ হিসাবে সকলেই

তাঁহার প্রচারক। আমরা বলি, এক হিসাবে সকলেই গুরু বা প্রচারক, আর এক হিসাবে তিনি ভিন্ন আর কেহই নয়। মানুষ মধ্যে থেকে কোন চিহ্নিত বংশ বা চিহ্নিত ব্যক্তির মস্তকে টিকি বা ফুলমালা চড়াইয়া পুরোহিত, আচার্য্য বা প্রচারকরূপ অপকৃষ্ট দলের সৃষ্টি করে কেন, আমরা মোটেই বুঝি না। তবে ইহা জানি যে, মানুষ অন্যের উপরে ধর্ম্মের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়! সেই জন্যই কি এইরূপ হয়?

কোটী কোটী বৎসর পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, কোটী কোটী লোকের অভ্যুত্থান হইয়াছে;—কোটী কোটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, কোটী কোটী প্রচারকগোষ্ঠী নিযুক্ত হইয়াছে, কোটী কোটী শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে—কিন্তু পৃথিবীর আজ কেন এরূপ অবস্থা? "ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই"—চতুর্দ্দিকে কেবল এই এক নিদারুণ কথা শুনি কেন? ইহার কারণ এই, মানুষ গুরু পুরোহিতের উপর ধর্ম্মের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসারের পাপের সেবা করে। পূজার সময় পুরোহিত আসিয়া পূজা করিয়া গেল;—ব্রতাদি বা উপাসনার সময় আচার্য্য আসিয়া মনের আবেগে দশটা মন্ত্র বা কথা আওড়াইয়া গেল;—আর সংসারের লোক যেমন ছিল, তেমন থাকিল! ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্যের উপর নির্ভর করিলে কখনও চরিত্র বা জীবনলাভ হয় না। আর সাধারণের চরিত্রে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না হইলেও ধর্ম্ম টিকে না। এজন্যই দেখা যায়, এক সময়ে যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের ষষ্টিসহস্র প্রচারক ছিল, সে ধর্ম্ম ভারতে আজ কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের সহস্র সহস্র প্রচারকের চেষ্টা এখন অরণ্য জঙ্গলে লয় পাইতেছে;—আর শঙ্করাচার্য্যের বা চৈতন্যদেবের পবিত্র অদ্বৈতবাদ ও প্রেমবাদ—কালের মহাবলে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম আজ কাল শাঁক ঘণ্টার আওয়াজে, মেষমহিষাদি-বলিময় উৎসবে, গৈরিক বস্ত্রে,—বাহ্য ঘনঘটায়! শাক্তধর্ম্মের নামে আজ লোক ব্যভিচারের পোষকতা করে, চৈতন্যের প্রেম-ধর্ম্মের নামে আজ কাল সংসার স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া লোক বৈষ্ণবীর স্মরণ লয়। 'আর অহিংসা পরম ধর্ম্মের' নামে আজ আর্য্যাবর্ত্তে সুদের সুদ তস্য সুদ আদায় করিয়া দরিদ্র প্রজাগণের সর্ব্বনাশ করে! আর খ্রীষ্টধর্ম্মের নামে—"শূকরমণি ও কান্তমণিদের" পবিত্র রক্তে ধরা প্লাবিত! হা ঈশ্বর, কোথায় তুমি, ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে কি বীভৎস ব্যাপার চলিতেছে, তুমি একবার দেখ। দেখ, তোমার নামে কেমন আশ্চর্য্য ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে!!

গুরু পুরোহিতের চেষ্টা এইরূপই ব্যর্থ হয়;—চিরদিন হইবে। সামান্য ধূলির কীটাণু হইয়া এত আস্পর্দ্ধা, বামন হইয়া স্বর্গের চাঁদ স্পর্শের সাধ, কথনই পূর্ণ হইবে না, কখনও হয় নাই। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, মহম্মদ এই সকল পুরুষ-রত্নের চেষ্টা ও তপস্যার ফল কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, এখন জোনাকী বাতি জ্বালে! যত বড় লোকই হউক না কেন, আপন শক্তিতে কেহই সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রচার করিতে পারে না। তিনি আপনি প্রকাশমান—চিরদিন, চিরকাল। মানুষ-সাধারণ তাঁহাকে দেখিবে না, চরিত্রে ধরিবে না, তবে কেমনে তাঁর ধর্ম্ম টিকিবে?

যে কথা বলিতেছিলাম। মানুষের প্রচারে কেবল মতামতের ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িকতা প্রচারিত হইয়া থাকে; তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক গুণও পৃথিবীর উপকার হয় নাই। তাঁহারা ধার্ম্মিক ছিলেন, সে কিন্তু স্বতন্ত্র কথা। তাঁহারা বিধাতার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, ঐ পর্য্যন্ত শেষ। মানুষের প্রতি জনের জন্য বিধাতা আপনি খাটিতেছেন, অন্ন পরিবেশন করিতেছেন—ঘরে ঘরে ফিরিয়া অভাব মোচন করিতেছেন। "তোমার দ্বারা তিনি তাঁর ধর্ম্ম প্রচার করিবেন,—ধর্ম্ম তোমার একচেটিয়া পত্তনি মহাল," তোমার এ অহঙ্কার পূর্ণ কথা তিনি পূর্ণ হইতে দিবেন না। কেন, তাঁহার কি নিজের শক্তি নাই, তাঁহার এই অনন্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কি গূঢ় অভিপ্রায় নাই? তিনি অনন্ত প্রকৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া দিবানিশি আপন তত্ত্ব জগতে অনন্তরূপে ঘোষণা করিতেছেন। কেবল তিনিই তাঁর ধর্ম্মের প্রচারক। তাই দেখ, তোমার আমার, সকলের ধর্ম্ম-প্রচারের ধুয়া, সকলের হই-চই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, বিস্মৃতির মহা আঁধারে সব গিলিয়া ফেলিতেছে, আর পূর্ণচন্দ্র ঘটনার অন্তরাল ভেদ করিয়া আপনি চিদাকাশে প্রকাশিত হইতেছেন। বিধাতা এইরূপ আপনি প্রকাশিত না হইলে কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারে না। তিনি কি মানুষের হাতের ক্রীড়ার পুতুল যে, ধরিয়া তাঁহাকে দেখাইবে? তাহা অসম্ভব। কিন্তু তবুও ত মানুষের ভণ্ডামি দূর হয় না! পদে পদে মানুষের অহঙ্কার চূর্ণ হইতেছে, কিন্তু তবুও মানুষ সেই অরূপ অব্যক্তকে উপভোগের পরিবর্ত্তে প্রচার করিতে যায়! কাযেই লোকে বলে, "চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা।"

আপন তত্ত্ব মানুষ জগতে প্রচার করিতে পারে, কিন্তু তাঁর তত্ত্ব প্রচারে

অধিকারী নয়। অধিকারী নয়, কেবল ইহা নয়, তাঁর তত্ত্ব প্রচারে মানুষ সমর্থ নয়। তিনি ত কেবল আমাতে নন্, তিনি তোমাতেও। তোমাতে আমাতে তাঁহার যেমন করুণা প্রকাশ, এই অনন্ত পৃথিবীতে তাঁহার সেইরূও করুণার অনন্ত অংশ বিদ্যমান। অনন্তের লীলা অনন্ত অণুপরমাণুব্যাপী। আমি যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আমি তাঁর অনন্ত তত্ত্ব কিরূপে প্রচার করিব? করিতে কি পারি? তাহা অসম্ভব। মানুষ তাঁর কৃপায় তাঁহাতে ডুবিতে পারে, কিন্তু তাঁর তত্ত্ব প্রচার করিতে পারে না। যদি বল, তাঁর কৃপা হইলে পারিবে না কেন? কারণ এই, স্বরূপতঃ তিনি অন্যকে দেখা না দিলে অন্যে তাঁহাকে দেখাইতে পারে না। কথাটা আর একটু বিশদ করিয়া বলি। একজন সন্দেশ খাইয়াছে, আর এক জন খায় নাই। যে খাইয়াছে, সে, যে খায় নাই তাহাকে সন্দেশের মিষ্টত্ব কিছুতেই বুঝাইতে পারিবে না। যদি বল, যে খাইয়াছে, তাহাকে ত বুঝাইতে পারিবে? আমরা বলি, যে সন্দেশ খাইয়াছে, তাহাকে বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এই জন্যই দেখা যায়, সন্দেশের মিষ্টত্ব কেহই প্রচার করিয়া বেড়ায় না। ধর্ম্ম, সন্দেশ অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক মিষ্ট। কাহার নিকট? যে তাহার আস্বাদন লইয়াছে। যে আস্বাদন লয় নাই, তাঁহাকে কি ঐ মিষ্টত্ব বুঝাইতে পারিবে? না, তাহা অসম্ভব। ঈশ্বরকে স্বরূপতঃ যে না দেখিয়াছে, তাহার নিকট তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করিতে মানুষের কোনই শক্তি নাই, কোনই অধিকার নাই। আর যে ধর্ম্মের আস্বাদন পাইয়াছে, তাহার নিকট ধর্ম্মপ্রচারের ত কোন প্রয়োজনই নাই। তবে কেন ধর্ম্মপ্রচারের এত চেষ্টা? আমাদের বিবেচনায়, ধর্ম্ম কেবল উপভোগের জিনিস, প্রচারের জিনিস মোটেই নয়। প্রচারে ইহার মিষ্টত্বের হানি হয়, কিছুই মিষ্টত্ব বাড়ে না,—কিছুই প্রকাশ হয় না। আর একটী কথা এই, সকল ব্যক্তি কিছু একই রূপ মিষ্টত্ব অনুভব করিতে পারে না। শরীরের পার্থক্যে, মানুষের ইন্দ্রিয়াদি সকলই বিভিন্ন প্রকার। একটা ফুল তুমি যেমন দেখ, আমি ঠিক তেমনি দেখি না। একটা জিনিষের তুমি যেরূপ আস্বাদন পাও, আমি কিন্তু সেরূপ আস্বাদন পাই না। সন্দেশের মিষ্টত্ব, ফুলের সৌরভ, চাঁদের জ্যোতি—এ সকলই অনন্ত লোকমণ্ডলীর নিকট অনন্ত রূপ। এক জনেরটী আর এক জনেরটীর সহিত মিলে না। ইহাকেই বলে, অনন্তের ব্যাপার—অনন্তের লীলা! আমি আমারটী তোমাকে বুঝাইতে পারি না, তুমি তোমার মতনটী আঁকিয়া দেখাইতে পার

না। কেন?—না—তাহা হইলে অনন্ত যে ধরা পড়ে, অনন্ত যে সান্ত (finite) হইয়া যায়।

অনন্তকে সান্ত করিতে মানুষ কিন্তু দিবানিশি ব্যস্ত। আমি আমার ঈশ্বরকে দেখাই, তুমি তোমার ঈশ্বরকে দেখাও।—এইরূপ কত জনে কত জনের ঈশ্বরকে দেখায়! বস্তুত, ঈশ্বর একজন, না বহুজন? পৃথিবীতে যেরূপ ভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে যেন বহুজন বলিয়াই মনে হয়। সহস্র ব্যক্তির, সহস্র প্রচারকের, সহস্র রূপ ঈশ্বর। খ্রীষ্টানের গড্, য়িহুদীদের জিহোবা, মুসলমানের আল্লা, হিন্দুর হরি—এ সকলই যেন পৃথক পৃথক। এক ঈশ্বরের কত নাম, কত রূপ! এক ঈশ্বরের কত অসংখ্য সম্প্রদায়! সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কত মারামারী, কাটাকাটী!! এক ঈশ্বর কত বিকৃতরূপে জগতে বিঘোষিত হইতেছেন, দেখ। কেন এরূপ হইতেছে? না,—মানুষ আপনার খামখেয়ালী মত দ্বারা ঈশ্বরকে নির্ম্মাণ করিয়া জগতে প্রচার করিতেছে বলিয়া। মানুষ কল্পনার পূজা করে, করুক, ক্ষতি নাই; কিন্তু কল্পনার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া—অনন্তকে সান্ত রূপে প্রকাশ করিয়া, সেই মহান ঈশ্বরের যে অবমাননা করিতেছে,—তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্য যে খর্ব্ব করিতেছে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। ঈশ্বরের কৃপা হইলে মানুষ তাঁর অনন্ত স্বরূপের কিছু কিছু রূপ দেখিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা তুলিকায় আঁকিতে গেলেই আপনার কল্পনা জড়িত হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিকৃত হইয়া যায়! সে অরূপ কোটী তুলিকায়ও রূপ ধরেন না,—শত চেষ্টায় ও ভাবায় ব্যক্ত হন না। ঈশ্বরকে মানুষ যদি কেবল উপভোগ করিয়া ছাড়িয়া দিত, তবে বুঝি বা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য এত খর্ব্ব হইত না,—ধর্ম্মকে লোকে অবহেলা করিত না, ছেলে খেলার ন্যায় এত অসার মনে করিত না, এবং ধর্ম্মের নামে এত অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইত না। ধর্ম্মটা কাল সহকারে মানুষের স্বেচ্ছার একটা খেয়াল বিশেষ হইয়া পড়াতেই নানা সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে, এবং ধর্ম্মের আচ্ছাদনে ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হইতেছে বলিয়াই ধর্ম্মসমাজে মারামারী কাটাকাটী চলিতেছে! এই ব্যক্তিত্ব যদি লোপ পাইত, তাহা হইলে ধর্ম্মের নামে একটা ব্যবসা চলিত না,—বিধাতার নামের স্থানে লোক-শাস্ত্র, পোপ, পাদ্রি, প্রচারক, আচার্য্য, গুরু, পুরোহিত পূজিত হইত না, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মানুষ বুদ্ধ, চৈতন্য বা খ্রীষ্টের চরণে ভক্তির অঞ্জলি দিত না। অতএব বুঝিতে আর

বাকী নাই যে, ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা না করিয়া যদি মানুষ তাহা কেবল উপভোগ করিত, তবে ব্যবসাদারি ধর্ম্মপ্রচার বা গুরুগিরি পৃথিবীতে আর প্রশ্রয় পাইত না,—সাধারণের চরিত্রে ধর্ম্ম চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকিত;—ধর্ম্মের নামে জাল জুয়াচুরি বা ব্যক্তিত্বের খেয়াল জগতে বিঘোষিত হইত না। কিন্তু যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে,—পৃথিবীর বাজারে ধর্ম্মটা এখন টাকার দ্বারা ক্রীত বিক্রীত হইতেছে। যার দশটাকা আয় আছে, সেই একজন গুরু বা প্রচারকের প্রতি ধর্ম্মাধর্ম্মের ভার দিতে পারিতেছে। তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া টাকার বিনিময়ে ধর্ম্মের মিষ্ট কথা শুনিতেছে, দশটা ব্যভিচারাদি অপকর্ম্ম করিয়াও টাকার বিনিময়ে সুযশ কিনিতেছে। আর নিরন্ন অর্থহীন দরিদ্র ?—ধর্ম্ম যেন তাহাদের জন্য নয়, নির্দ্দোষী হইয়াও তাহারা যেন অকূল ধর্ম্মহীন অপযশের সমুদ্রে ভাসিতেছে! কি দুঃখের কথা! টাকা, প্রকৃত ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, ভণ্ড ব্যভিচারীকে ধর্ম্মের উচ্চসিংহাসন দিতেছে। যার ঘরে যাগযজ্ঞ, আড়ম্বরময় পূজা অর্চ্চনা, গুরু পুরোহিতের অধিষ্ঠান—সেই নাকি পৃথিবীতে বড় ধার্ম্মিক! যে যত টাকা ব্যয় করিয়া ভোজাদি দিয়া অন্যের মনের তুষ্টি সাধন করিতে পারে, সেই নাকি বড় ধার্ম্মিক!! ধর্ম্মের পবিত্র মস্তকে যদি কাল সহকারে এতই কলঙ্ক চাপিল, "তবে বল মা এখন দাঁড়াই কোথা ?"

বড় আশা ছিল, ব্রাহ্মসমাজ লৌকিক ধর্ম্ম এবং পৌরোহিত্যের মূল উচ্ছেদ করিয়া, ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব, বিশ্বজনীন উদারতা আবার জগতে বিঘোষিত করিবে;—ভণ্ডামি, প্রতারণা, আবার ভয়ে কম্পিত-কলেবরে পলায়ন করিবে! কিন্তু মাটীর দোষ, আশা করিলে কি হয়। যে দেশ গুরু পুরোহিতের অপ্রতিহত অত্যাচারে ধর্ম্মহীন হইয়া মানুষের স্বেচ্ছা বা খেয়ালের ক্রীড়া স্থান হইয়া পড়িয়াছে, সেই দেশে আবার আচার্য্যবাদ, প্রচারবাদ বা গুরুবাদ বিঘোষিত হইতেছে; আবার দীক্ষা-প্রণালী রটিতেছে, আবার ধর্ম্মের নামে ব্যক্তিত্ব প্রশ্রয় পাইতেছে; আবার টাকার দ্বারা ধর্ম্ম ক্রীত বিক্রীত হইতেছে! "আবার জোর যার মুলুক তার" এই কথা যেখানে সেখানে প্রশ্রয় পাইতেছে। কাজেই বলি, "বল মা এখন দাঁড়াই কোথা ?" কেবল ইহাই নয়। এই সমাজের অর্থে পরিপোষিত হইয়া এমন দুই একজন সাধক নাকি আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা অন্যের ভিতরে স্বেচ্ছাক্রমে শক্তি-সঞ্চার করিয়া ধার্ম্মিক করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন! দলে দলে লোক "রাতারাতি ধার্ম্মিক হইবার

জন্য" সেই দিকে ছুটিতেছে! পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, শ্রীরামপুরের কেশব কর্ম্মকারই নাকি পরমাত্মাকে নিমেষের মধ্যে দেখাইতে পারে। এখন এ আবার কি শুনিতেছি? নানা বুজরুকির দেশে আবার কত অভিনব গুলিখোরের আড্ডার বুজরুকির ন্যায় নানা কথা শুনিতেছি! যে দেশে সহস্র সহস্র মুর্খ চরিত্রহীন ব্যক্তি কেবল গায়ে ভস্ম মাখিয়া বৃক্ষতলে অগ্নি কুণ্ডের পার্শ্বে উপবেশন করিয়াই কোটী কোটী লোকের পূজার উপহার বা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপন উদর পূর্ণ করিতে সমর্থ হইতেছে, সেই হতভাগ্য দেশে. অনন্ত ঈশ্বর-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি বলিয়া সভ্য সমাজের দুই এক জন লোকেরা অন্যের ভিতরে শক্তি সঞ্চার করিতে চাহিলে, ধন জন লইয়া লোক যে সেই দিকে ছুটিবে, এটা বড় একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়! আজ আর তাঁদের শিষ্যের অভাব নাই—সুতরাং অর্থের মোটেই অভাব নাই—শিষ্যেরা চতুর্দ্দিকে পত্র লিখিয়া টাকার অভাব মিটাইয়া দিতেছে। যে যত টাকা দিতেছে, সে তত বড় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে! সাধুত্বের নামে এদেশে চির আদর, সুতরাং সকলেই অম্লানচিত্ত অর্থ ঢালিয়া দিতেছে। আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—দেবলীলা আরম্ভ হইয়াছে!! অর্থের বিনিময়ে মানুষ দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সানন্দে ঘরে ফিরিতেছে। তার পর যার যা খুসি, সে তাহাই করিতেছে। ধর্ম্মের নামে আর একটা নূতন ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু তবুও সতর্ক হইতেছেন না। ব্রাহ্মসমাজ বলিলেও যা বুঝি, তাতেও কতকটা এইরূপ লীলাই দেখি, কিন্তু কিছু নিষ্প্রভ। বাড়ীতে একটা অনুষ্ঠান হইবে, প্রচারক বা আচার্য্য না আসিলে সব যেন মাটী হইয়া যায়! সমাজে উপাসনা হইবে, বড় আচার্য্য না আসিলে অনেকের উপাসনাই হয় না! কাজেই এখানেও ধর্ম্মটা ক্রমে ক্রমে আচার্য্যগত বা প্রচারকগত হইয়া উঠিতেছে, সাধারণের যে ইহাতে অধিকার আছে, সকলেই যে ঈশ্বর সাধন বা ঈশ্বর পূজার অধিকারী, এ মতটা চলিয়া যাইতেছে। সমাজের সাধারণ লোকের এমন একটা মত দাঁড়াইতেছে যে, প্রচারক বা আচার্য্য হইলেই যেন সচ্চরিত্র থাকিতে হইবে, আর সব লোক যেমন তেমন হউক, দোষ নাই। সাধারণ লোকের চরিত্রে, তাই দেখিতেছি, ধর্ম্মটা যেন উপরিভাগে ভাসিয়া রহিয়াছে, ভিতরে স্থান পাইতেছে না। ব্রাহ্মসমাজ এখনও এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই গুরুবাদের মূলবীজ কোথায়, প্রত্যেক ব্রাহ্মের একবার ধীরচিত্তে অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। একজনকে বর্জ্জন করিয়া

আর দশজনকে প্রচারক বা গুরুর পদে বরণ করিলে, গুরু পুরোহিতের দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বই কমিবে না। সুতরাং খুব সতর্ক হওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে। দীক্ষা-প্রণালী সমাজ হইতে একেবারে তুলিয়া দিয়া, সকলেই সকলের গুরু, সকলেই সকলের আচার্য্য, সকলেই বিশ্বেশ্বরের স্বতঃপ্রবৃত্ত ধর্ম্ম-প্রচারক, এই কথা বিঘোষিত করা হউক। অথবা ধর্ম্ম সমাজে আবার গুরু ও প্রচারকেরই বা কি আবশ্যক? ধর্ম্মের প্রচারক এক মাত্র বিশ্ববিধাতা, দীক্ষার গুরু একমাত্র জগতের ঈশ্বর। তিনি ভিন্ন তাঁর ধর্ম্ম আর কে প্রচার করিবে,—কে বা পারে? প্রচারকশ্রেণী তুলিয়া দিয়া তাঁর পবিত্রধর্ম্মকে জীবনে পালন করিবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হউন। তাঁর পবিত্র ধর্ম্মের আভাস প্রতিজনের নিকট তিনিই প্রকাশ করিতেছেন। ধর্ম্মপ্রচার হওয়া যদি তাঁহার ইচ্ছাকৃত হয়, আপনি হইবে;—তাঁহার ইচ্ছা না হয়,—হইবে না। জগতের লোক ধার্ম্মিক হউক বা না হউক, সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া, আমি কেমনে তাঁহাকে পাইব, এই চিন্তা দিবানিশি অন্তরে জ্বলুক;—হৃদয়ে গভীর অনুতাপাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হউক। ঘরে ঘরে উপাসনার রোল উঠুক। অন্যের উপায় কি হইবে, এ ভাবনা না ভাবিয়া কিসে নিজে পরিত্রাণ পাইব, এই চিন্তা জীবনের সার হউক। ব্রাহ্মসমাজ এখন প্রচার-ব্রত পরিহার করিয়া প্রকৃতধর্ম্মজীবন লাভে চেষ্টিত হউন, বিনীত প্রার্থনা। ষষ্টি সহস্র বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্ম-হীনতাবশত ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মকে স্থায়ী রাখিতে পারে নাই। কোটী কোটী গুরু পুরোহিত বিদ্যমান থাকিতেও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য বা রূপ-বিকার উপস্থিত হইয়াছে;—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইয়াছে। আবার কেন প্রচারের কথা? ধর্ম্মপ্রচারের কথা ভুলিয়া কি করিলে ধর্ম্মউপভোগ করা যায়, সেই চেষ্টায় দিবানিশি ব্যস্ত হও। এস ভাই, প্রচার-বাসনাকে বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্ম উপভোগ করার বাসনাকে জীবনের সার করি। আপনি ধার্ম্মিক হইলে, চরিত্রবান হইলে কথা মুখে না বলিলেও দৃষ্টান্তে ধর্ম্মের মহিমা প্রচারিত হইবে। চরিত্রের বিমল জ্যোতির আদর্শে যেমন ধর্ম্ম প্রচার হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কিসের ধর্ম্ম প্রচার, কিসের কি, আপনি মানুষ হও। "চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা"—এই উপদেশ কি সুন্দর, কি জীবনপ্রদ, কি মধুর!!

উৎসব।

মানুষ কিছু অনন্দ-প্রিয়, কিছু সুখ-প্রিয়। কিন্তু প্রকৃতি, কি জানি কেন, মানুষকে কেবল সুখ, কেবল আনন্দ দিতে চায়না। শিশুর কোমল মুখের মধুর হাসিতে কিছু আনন্দ খেলে, কিন্তু সে শিশু সকলের ঘরে জুটে না। যার ঘরে জুটে,—তার ঘরেও শিশু চিরকাল থাকে না। কখন রোগ, কখনও মৃত্যু সে হাসির বাদ সাধে। তা না হইলেও শিশু ত আর চিরকাল শিশু থাকে না, বয়স তাহাকে যুবক করে। সুতবাং মানুষ চিরকাল সে আনন্দের অধিকারী হয় না। বসন্তের স্নিগ্ধ মলয় বড়ই সুখপ্রদ, কিন্তু তাহা কদিনের জন্য? আজ আছে, কাল নাই। এইরূপ একটী একটী, একটী করিয়া পৃথিবীর সুখ বা আনন্দের যে বস্তুটীকে ধরা যায়, তাতেই কি-যেন-বিষাদ-রেখা, কি-যেন-যায়-যায়-লেখা,—কিছুতেই চির আনন্দ, চির সুখ মিলে না। মিলে না, কিন্তু মানুষও সুখ ছাড়া, আনন্দ ছাড়া থাকিতে রাজি নয়। কি বিভ্রাট!

মানুষ চায় কেবল হাসিতে, কেবল খেলিতে, কেবল নাচিতে!—প্রকৃতি চায় তাহাকে কাঁদাইতে, কর্ম্মে মাতাইতে,—কেবল জাগাইতে! সেই জন্যই বুঝি মানুষ কাঁদে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে পরাজিত হওয়াতেই মানুষের চক্ষে বুঝি জল দেখা যায়। তাই বুঝি, মানুষ হাসে, আবার কাঁদে। কাঁদে বলিয়াই কি হাসি, আরো মিষ্ট লাগে? মানুষ তাহা কিন্তু বুঝেনা। প্রকৃতি মানুষকে কাঁদাইয়া ছাড়িবেই ছাড়িবে। বসন্তের সুস্নিগ্ধ মলয়ের পর গ্রীষ্মের উষ্ণ বায়ু, সুখের পর দুঃখ, সম্পদের পর বিপদ, জীবনের পর মরণ,— আসক্তির ধারে বৈরাগ্য,—মিলনের ধারে বিচ্ছেদ—তাই প্রকৃতির নিয়ম!! জন্মিলেই মরিতে হইবে, আসিলেই যাইতে হইবে—হাসিলেই কাঁদিতে হইবে, প্রকৃতির একি নিদারুণ নিয়ম-বাণী!! ইহার ভয়ে মানুষ জড়সড়, অস্থির, কম্পিত-কলেবর। বসন্তের পর গ্রীষ্মের তীক্ষ্ণ কষাঘাত বড়ই মর্ম্মপীড়ক, ইহা জানিয়াও মানুষ বসন্তের মলয়ের মধুর আবাহনে চিরকাল উন্মত্ত,—সে মন-মুগ্ধকর হাসিতে বিভোর। আজ ঘরে নব শিশুর জন্ম,—সে শিশু চিরকাল গৃহে থাকিয়া হাসিবে না, জানিয়াও পিতা মাতা আজ আনন্দে মাতোয়ারা। মিলনের

পর বিচ্ছেদ আসিতেছে, ইহা ভাবিয়া মিলনের সুখকে কে উপেক্ষা করিতে পারে? মৃত্যু করাল মুখ ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে, জানিয়াও, কে জীবনের মায়া মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া আজই বিষাদ ও নিরানন্দের বেশপরিধান করিতে পারে? কেহই পারে না। পারিলে—এ সংসারে হাসি বা আনন্দোল্লাস কাহারও ভাগ্যে ঘটিত না। সংসারের কোলে দিবারাত্রি শত চিতা হু হু ধু ধু করিয়া বিকট হাস্যে জ্বলিতেছে,— কত সুখ, কত আসক্তিকে নিমেষে ভস্ম করিতেছে, কিন্তু তবুও সংসার আনন্দের। শ্মশানের ভিতর হইতেই যেন কি এক আনন্দের উচ্চ রোল,—বিকট হাসি উঠিতেছে! মানুষ, সংসার-শ্মশানে বসিয়াই আনন্দের করতালি দিতেছে! এক পা পরকালে দিয়াও আবার আশার ঘর বাঁধিতেছে,—সুখের রস ভঙ্গ করিতেছে না। মানুষ নিতান্তই সুখ-প্রিয় জীব।

সংসারের এই সুখ, এই আনন্দ—নানা কথায়, নানা রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শত শত উৎসবে এই আনন্দের নামকরণ হইয়াছে। পারিবারিক উৎসব, সামাজিক উৎসব, পারত্রিক উৎসব, যাহার নাম কর, এসকলই আনন্দের স্ফুট হাসি, স্ফুট কেলি বিশেষ। জন্মতিথি, নামকরণ চূড়াকরণ, বিবাহ—এ সকলই আনন্দের অনুষ্ঠান। দাম্পত্য প্রেম, পিতৃ মাতৃস্নেহ—এ সকলই সুখের লীলা। আবার অন্য দিকে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক,—সঙ্গীত, বাদ্য, তামাসা, অভিনয়— এ সকলই আনন্দের নানা অঙ্গ। মানুষ হাসে গায়, খেলে যায়—জীবনে আমোদের খেলা খেলিয়া ঐ দেখ সে যেন কোথায় যায়। রঙ্গালয়ে বেশ্যা নাচে, মানুষ হাসিয়াই অস্থির! মদ খাইয়া মানুষ জ্ঞানহারা, মানুষ তাহা দেখিয়া হাসিয়াই অস্থির! দ্বারে অনাহারী ভিক্ষুক উচ্চরবে ক্রন্দন করিতেছে, দেখিয়া মানুষ হাসিয়াই অস্থির! গৃহের পার্শ্বে পুত্র-হারা জননী ক্রন্দন করিতেছেন,—মানুষ তাহা শুনিয়াও বিবাহোৎসবে মত্ত হইতেছে! কোথায় বা পরদুঃখকাতরতা, কোথা বা সহানুভূতি! সারাদিন সংসারে এইরূপ কত বিচিত্র আনন্দের অভিনয় হইতেছে, মানুষ অভিনয় করে, অন্য মানুষ তাহা দেখে আর হাসে। তার হাসি দেখিয়া অন্য আবার হাসে। সকলের কাজেই সকলে হাসে। ভাবের ঢেউ—হাসির ঢেউ, অবিরত এই সংসারে উঠিতেছে। মানুষ হাসিয়া, খেলিয়া, কোথায় যেন উঁকি মারিতেছে! উঁকি মারিতেছে,—নিমেষের মধ্যে শেষ হাসি দপ করিয়া নিবিয়া যাইল—মরণের কোলে সকল হাসি চির নির্ব্বাণ পাইল। যত দিন

মানুষ সংসারে, ততদিন ছিন্নমতি মানুষ কেবল আনন্দ, কেবল হাসিই চায়। ঈশ্বর, তুমি কিছুতেই মানুষকে কাঁদাইয়া সজাগ করিতে পারিলে না! কিছুতেই স্থির, গম্ভীর বা প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলে না! কিছুতেই উভয় বস্তুতে মানুষকে দীক্ষিত করিতে পারিলে না!

এই ভবের বাজারে মানুষ যেন কেবল ছেলে খেলাতেই দিবানিশি মত্ত। সে যাহা করে, সকল তাতেই যেন বাল-চাপল্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। কেবল হুজুগ—কেবল আন্দোলন—কেবল আনন্দের উচ্চ-হাসি। কেন কে জানে, মানুষ পরকালের জন্য ভয়ে ভয়ে যাহা কিছু করে, তাতেও যেন এই চপলতা প্রকাশ পায়। মানুষ কর্ত্তব্যের আদেশে দান করে, তাহাও সংবাদপত্রে উঠে; মানুষ প্রাণের টানে আত্মসংযম করে, তারও একটা কোলাহল তুলে। ধর্ম্ম—যাহা মোটেই বাহিরের জিনিস নয়,—যাহা সংসারের জিনিস মোটেই নয়, কঠোর অগ্নি পরীক্ষা যাহার পরিণাম,—আত্মত্যাগ বা মহা বৈরাগ্য যাহার লক্ষ্য—তাহাতেও মানুষ এই বাল-চাঞ্চল্যের পরিচয় দেয়। তাতেও মানুষ হুজুগের খেলা, বৃথা হই-চইরূপ ঢোল ঢাক না পিটাইয়া পারে না। ধর্ম্ম, যাহা প্রাণের উপভোগের জিনিস ;— ঈশ্বর, যিনি দেশ কালের অতীত প্রাণের একমাত্র আরাম ও সম্বল ; এ সকল লইয়াও মানুষ হাসি তামাসা—বা ক্ষণস্থায়ী মাতামাতিপূর্ণ উৎসব করে। মানুষের কি চঞ্চল প্রকৃতি!

কেহ প্রতিমা গড়াইয়া চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্প দূর্ব্বাদলে দেব পূজা করে, তার নামও ধর্ম্ম; কেহ বা সুরাপানে বিভোর হইয়া আদ্যাশক্তির পূজা করে, তার নামও ধর্ম্ম! আর কেহবা অনাহারে শরীর পাত করিয়া বৈরাগ্য দেখায়, তাহার নামও ধর্ম্ম! কেহবা উচ্চ কথায় উপাসনা করিয়া গগন ফাটায়, তাহার নামও ধর্ম্ম! কেহবা নরবলি দিয়া মনের সাধ মিটায়, তাহার নামও ধর্ম্ম! খামখেয়ালির বশবর্ত্তী হইয়া বা ভাবে ভোর হইয়া মানুষ যত কিছু কাজ করে, সে সকলই নাকি ধর্ম্ম! দস্যু অন্যের বক্ষে ছুরিকার আঘাত করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে যাইবে—তার পূর্ব্বে মহামায়ার আরাধনা করে ;—আর শত্রু নিপাতের জন্য কেহ বা মহাযজ্ঞের সূত্রপাত করিয়া মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা দেখায়! এ সকলই নাকি ধর্ম্ম। মানুষের খামখেয়ালির অট্টহাসি, বিধাতা কিছুতেই থামাইতে পারিলেন না!

মানুষের হাসি তামাসা, গান বাদ্য, এ সকল পৃথিবীতে ধর্ম্মের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া ধর্ম্ম নামে অভিহিত। অথবা মানুষের আনন্দময় প্রকৃতি,

সুতরাং ধর্ম্মেও জাঁকজমক, হাসিতামাসা না করিয়া পারে না। ধর্ম্মজগতে কত আনন্দ—একবার দেখ। শত্রু বিনাশের জন্য অকালে রামচন্দ্র ভগবতীর আরাধনা করিতেছেন—আজ বঙ্গে দুর্গোৎসব ;—মদ্যপান ও ব্যভিচারের মহা নৃত্য—মহা আনন্দ! খ্রীষ্টের মৃত্যু দিবস স্মৃতির অমূল্য দিন—তাহাও মহা আনন্দের পার্ব্বণ! মহরম মহাশোকের পার্ব্বণ, তাহাও আনন্দের লীলায় আজ পরিসমাপ্ত! এইরূপ একে একে যত উৎসব আছে, খুব গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, বুঝিবে, এ সকল ধর্ম্মের বাহ্য প্রকাশ মানুষের বালচাঞ্চল্যের একমাত্র পরিচায়কমাত্র। অথবা মানুষের হাসিময় স্বভাবের বাহ্যবিকাশ মাত্র। ইহার সহিত ধর্ম্মের—পরকালের যে কি যোগ, কিছুই বুঝি না। তবে যদি বল, সাধারণের জন্য ধর্ম্মের বাহ্য প্রকাশ, বা বাহ্য প্রণালী চাই। আমরা বলি, জীবন-শূন্য, কায়া-শূন্য বাহ্য প্রণালী বা বাহ্য ছায়ার কখনই আদর করা উচিত নয়। কিন্তু সে কথা কে শুনিবে? ধর্ম্মের নামেও দেখ, পৃথিবীতে কত কায়া-শূন্য উৎসব হইতেছে! একটু মাতামাতি, একটু হাসাহাসি, একটু নাচানাচি মানুষ না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই জন্যই, যে ধর্ম্ম দেশ কালের অতীত, প্রাণের উপভোগের জিনিস, সেই ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে এত উৎসব, এত মাতামাতি। উৎসব কি?—ভগবান-সম্ভোগ?—আত্মায় পরমাত্মায় যোগ? তাহা ত সর্ব্বকালে, সর্ব্বমুহূর্ত্তের ব্যাপার। অমুক মাসে, অমুক দিনে ভগবান আসিবেন, তাঁহাকে লইয়া সেই দিন নৃত্য করিব, আজ উপবাসে থাকিব? ছি, মন, এ বালকের খেলা কেন? তিনি তখন, তিনি এখন। তিনি সেই দিন, তিনি এই দিন। দুমাস পর তাঁকে সম্ভোগ করিব?—প্রকৃত ভক্ত, প্রকৃত প্রেমিক ইহা সহ্য করিতে পারেন না। তিনি চান এখনই। সব বর্ত্তমানের জন্য। যদি বল, অতীত বিশেষ দিনের স্মৃতি, মধুময়। সে স্মৃতি, এখন, তখন, সর্ব্বসময়। যে সময় যায়, সে সময় কি আর ফিরে? যে দিন গিয়াছে, সে দিন গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না? তবে কেন বৃথা ছায়া-মায়ার পূজা করিব? অতীত মরণের দেবতাকে কেন ডাকিব?—কেন হাসিব, কেন মাতিব? নূতন দেবতা নূতন ঘটনায় প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইতেছেন। তাঁকে দেখিবনা? প্রাচীন লোকেরা যে ঘটনায় যেরূপে বিধাতাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তুমি আমি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি পাইয়াও কেবল সেইরূপ ঘটনায় তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিব? বিধাতা প্রতি মুহূর্ত্তে অনন্ত ঘটনার মধ্য দিয়া নব নব ভাবে মানুষের নিকট প্রকাশিত

হইতেছেন। মানুষ তাহা দেখিবে না, কিন্তু অতীতের স্মৃতি ধরিয়া আমোদ, বৃথা মাতামাতির জন্য, হুজুগের জন্য—বসিয়া থাকিবে! কি অসার প্রকৃতি!

প্রকৃত প্রেমিক যে,—ভাবুক যে, সে ক্ষণস্থায়ী হাসি, কান্না, আনন্দ বা নিরানন্দ, মিলন বা বিচ্ছেদ, এসকলে বড় একটা আত্মসমর্পণ করে না। যে সাগরে ছোট২ ঢেউ আছে, সে সাগর অকূল নয়। যে প্রেমে ছোট২ উচ্ছ্বাস আছে, সে প্রেম গভীর নয়। অকূল প্রেম-সাগরে ছোট ঢেউ নাই—উচ্ছ্বাস নাই,—মাতামাতি নাই, আনন্দ বা নিরানন্দ নাই। আছি ত আছি, নাই ত নাই। সুখ বল, সেও ভাল; দুঃখ, সেও ভাল। জীবন আছে, থাকুক,—মরণ আসে আসুক। হাসি কান্না, সুখদুঃখ, এ সকল প্রকৃত প্রেমিকের জীবনে নামা-উঠা ভাব নাই, বৃথা তরঙ্গ গর্জ্জন নাই। আছে কি?—কেবল বিশ্বপতি। প্রেমিক, তিনিময় হইয়া নিশ্চিন্ত অন্তরে বসিয়া থাকেন। তার নিজের আনন্দ বা উল্লাস উড়িয়া গিয়াছে। চিন্ময়ের হাসিতে তিনি চির-প্রফুল্ল;—তাঁর হৃদয়-ঘরে নিত্যানন্দ,—নিত্য উৎসব। বিচ্ছেদও নাই, আবাহনও নাই। সেই আনন্দ অনন্ত ধারে, অনন্ত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া, প্রাণে নীরবে অবতীর্ণ হইতেছে। প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয় অতলস্পর্শ;—হাসি নৃত্যের বাহ্য প্রকাশ সেখানে অন্তর্হিত।

যাহারা সেরূপ প্রেমিক নয়, তাহারা উৎসব করিবে কিনা, এখন প্রশ্ন এই। তাহারা অবশ্য উৎসব করিবে, কারণ মানুষের প্রকৃতিই এই;—মানুষ আনন্দ ছাড়া থাকিতে পারে না। এতে ধর্ম্ম লাভ না হইলেও যে সুখ লাভ হয়, তাতে আর সন্দেহ নাই। উৎসব বাদ্যাদি প্রকৃত ধর্ম্মের ব্যাপার না হইলেও, আনন্দের ব্যাপার ত বটে। ইহাতে ঈশ্বর লাভ না হইলেও সুখ-স্পৃহা যে চরিতার্থ হয়, তাতে ত আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি কাছে থাকিতেও যে জন তাঁকে না দেখিয়া আবাহন করে,—প্রাণের মধ্যে তাঁর প্রকাশ অনুভব না করিয়া যে জন অন্যের জীবনের ঘটনায় তাঁর প্রকাশ দেখিতে উৎকণ্ঠিত, সে অপ্রেমিক অবিশ্বাসী কোটী বৎসর উৎসব করিলেও তাঁকে দেখিতে পাইবে কি না, সন্দেহ। প্রতিমা নির্ম্মাণ করা, প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দেওয়া,—মানুষের কাজ। দেবতার প্রকাশ, হরির লীলা,—হরির কৃপার ফল। তাঁর কৃপা ভিন্ন মানুষের শত শত চেষ্টা পরাস্ত। তাঁর কৃপা প্রতি ঘটনায়, প্রতি অণু পরমাণুতে—অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত ভাবে। যে জন তাহা দেখে না, সে কেমনে তাঁহাকে পাইবে বলত?—তাঁর কৃপা ভিন্ন মানুষ

কেমনে তাঁহাকে দেখিবে? বুঝি না। বৃথা আমোদ, বৃথা উল্লাস, বৃথা নৃত্য—বালকের ক্রীড়া মাত্র। কিছু ক্ষণ পরেই অবসাদ, কিছুক্ষণ পরেই আবার ক্রন্দন। যাঁর আবাহনও নাই, বিসর্জ্জনও নাই—যিনি নিত্য পাপীর সহচর, তাঁকে লইয়া এক দিন বা দশ দিন উৎসব করা মহা ভুল। অনন্ত দেবতার অনন্ত উৎসব—অনন্ত কাল স্থায়ী, তার আরম্ভও নাই, শেষও নাই। সে নীরব নিত্যানন্দময় মধুর উৎসবে যে যাইবে, হুজুক ছাড়িয়া যাত্রা কর।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রাণের কথা।

ছোট মুখে বড় কথা বলিতে গেলে, লোকের নিকট বড় প্রীতিকর বোধ হয়না বটে; কিন্তু হৃদয়ের উত্তেজনায় সময়ে সময়ে না বলিয়াও থাকা যায় না। বিশেষত লোকের চিন্তার স্রোত যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া কোন কথা বলা বড়ই দুঃসাহসের কার্য্য। এই রূপ স্থলে লোকের বড়ই অপ্রিয় হইয়া উঠিতে হয়। কিন্তু তাহা ভাবিয়া কে কর্ত্তব্য ভুলিতে পারে? ঈশ্বর অনন্ত,—অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত ভাব হইতে চিরবঞ্চিত স-সীম মানুষ কেমনে ঈশ্বরের কথা বলিবে? বলিতে পারে না, তবুও বলে। অনন্ত বুঝে না, মানুষ তবুও অনন্তের গানই গায়। কেন গায়, কেন বলে, তাহার উত্তর সকল সময়ে পাওয়া যায় না। না গাইয়া পারে না, না বলিয়া পারে না, তাই গায়, তাই বলে। সমাজ এক গভীর অতলস্পর্শ সমুদ্র বিশেষ, অনন্তকাল ধরিয়া ইহার রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিলেও কাহারও সাধ্য নাই যে, সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়া শেষ করিবে। কেহ পারে নাই, কেহ পারিবে না। আমরাও পারিব না, বুঝি, তবুও যাহা ভাবি, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিনা। হৃদয়ের উত্তেজনার হাত এড়ান বড়ই কঠিন।

আর্য্যভূমি ধর্ম্মভাবে চিরদিনই মাতোয়ারা। এত প্রেমভক্তিও কোন দেশে নাই, এত গভীর চিন্তা কোথাও নাই। অন্য কোন কথা বলিব না, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতে যে সকল গভীর চিন্তার কথা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম উদ্ভেদ করিতে এখনও বহুশতাব্দী লাগিবে। চিন্তা সম্বন্ধে আর্য্যভূমির সমকক্ষ কোন দেশ আজও হয় নাই। মহান ঈশ্বরের স্বরূপ-

জ্ঞানে তেত্রিশকোটী দেবতা বিভিন্নাবয়বে এই আর্য্যভূমিতেই পূজিত। অদ্বৈতবাদ এই ভূখণ্ডেই একদিন রাজত্ব করিয়াছে। ঈশ্বরের অনন্তত্ব ও মানবের ক্ষুদ্রত্ব—আত্মা ও পরমাত্মার দ্বৈত-ভাব-মূলক গভীর রহস্য ভারতেই একদিন মীমাংসিত হইয়াছিল। যোগ বল, তপস্যা বল, ব্রত বল আর অনুষ্ঠান বল, ভক্তি বল আর প্রেম বল, এ সকলেরই চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এই পুণ্যধাম আর্য্যাবর্ত্তে। কিন্তু কি ছিল, কি হইয়াছে! এক হিন্দুধর্ম্মে আজ কত সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। সেই সকল সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কতই বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে! কত ঘৃণা বিদ্বেষের লীলা রাজত্ব করিতেছে! অহং-জ্ঞানমূলক মতবাদ কতই প্রশ্রয় পাইতেছে! ধর্ম্ম চিরকাল একই রূপ রহিয়াছে, কিন্তু মানুষের দোষে, দেখ, কতই অনর্থ ঘটিতেছে! পাত্রের দোষে স্বর্গীয় ভাব সকল মলিন হইয়া যাইতেছে! মানবের যে দ্রব্যের অভাবে ভারতে ধর্ম্মের অপরাজিত দেবভাব চিরকাল একভাবে থাকিতে পারে নাই, তাহারই অভাবে আজও বিপর্য্যয়ের উপর বিপর্য্যয় চলিতেছে। পরিবর্ত্তন উন্নতির চিরলক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু উন্নতির পর অবনতি, অবনতির পরে আবার উন্নতি, আবার অবনতি, এই প্রকার পরিবর্ত্তন কখনই উন্নতির লক্ষণ হইতে পারে না। ভারতে কিন্তু তাহাই হইয়া আসিতেছে। একবার ভারত জাগিতেছে, আবার ডুবিতেছে। আবার জাগিতেছে, আবার ডুবিতেছে। এত উন্নতিও কোন দেশে হয় নাই; এত অবনতিও কোন দেশে হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ—(Harmonious development of all the faculties) এখানে মানবের সমস্ত শক্তির সমঞ্জসীভূত উন্নতি কখনও হয় নাই। কেবল হয় নাই, তাহা নহে; সমঞ্জসীভূত উন্নতির চেষ্টা করাও হয় নাই। কোথাও জ্ঞান, কোথাও প্রেম, কোথাও বুদ্ধি, কোথাও বিবেক চিরকাল বিচ্ছিন্ন ভাবে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে, একস্থানে এক সময়ে সকল মিলিয়া কখনই রাজত্ব করে নাই। ইহার ফল ভারতে এই হইয়াছে,—প্রেমিক জ্ঞানীকে চিরকাল ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, জ্ঞানী প্রেমিককে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ করিয়াই সময় কাটিয়া গিয়াছে। মত লইয়া ঝগড়া বিবাদ, মারামারী কাটাকাটী ধর্ম্ম-প্রধান ভারতে কত হইয়া গিয়াছে, কে গণনা করিয়া বলিতে পারে? মানুষ মানুষের ভ্রাতৃত্ব ভুলিয়া শোণিত-পিপাসা চরিতার্থ করিতে একটুও সঙ্কুচিত হয় নাই। একতা, আর্য্যভূমির কল্পনার জিনিস। বিবাদ

বিসম্বাদের যে অভিনয় ভারতে দেখা যায়, অন্য দেশেও তাহারই প্রতিছায়া আদি সময় হইতে ধর্ম্মজগতের যে বিশদৃশচিত্র দেখিতে পাই, আজও তা সমতা লাভ করিল না। কখনও করিবে কি না, কে জানে? যেখানে ধর্ম সেইখানেই সম্প্রদায় হইয়াছে। মত বজায় রাখিতে যাইয়া, মানুষ, চিরকা ঘৃণা বিদ্বেষের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। বুদ্ধের সাম্যবাদ বৈষম্যবাদে পরিণত হইয়াছে, চৈতন্যের অলৌকিক প্রেমতত্ত্ব রূপান্তরিত হইয়া মলিন হইয়া গিয়াছে—খ্রীষ্টের স্বর্গীয় ভ্রাতৃত্ববাদ পশুত্ববাদে পরিণত হইয়া আকাশের নীলিমায় মিলিয়া গিয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম-জগতের চিত্রে যে মলিন অমঙ্গলের চিহ্ন, সমস্ত পৃথিবীময় তাহারই ছায়া। ধর্ম্মভাবের তারতম্যানুসারে সে চিত্র অন্যত্র আরো মসীময়। জগতের আর আশা কোথায়? পরস্পরের ভাল ভাব উপার্জ্জন করিয়া, পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া, মানুষ কখনই এক পরিবার ভুক্ত হইতে পারিল না!

মহাত্মা থিওডোর পার্কার ধর্ম্ম জগতের এই গভীর দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া ইহার মূল কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, সমঞ্জসীভূত উন্নতি লাভ না করিলে আর মানুষের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, একতার আশা নাই। কিন্তু সমঞ্জসীভূত উন্নতি লাভ করার অপেক্ষা কঠিন কাজ আর কিছুই নাই। জ্ঞান, প্রেম, বুদ্ধি আর বিবেক, এ সকলেরই মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। জ্ঞান আর প্রেম, শিক্ষা আর ভাব, গুরুত্ব আর সরসত্ব, ন্যায় আর পুণ্য, এ সকল পাশাপাশী থাকিবে। কোন দিকে টলিলেই বিপদ। এই গভীর সত্য সাধনায় যখন মানুষ জয়ী হয়, তখন আর ঘৃণা বিদ্বেষ কিছুই থাকে না। তখন মানুষ দেখে, জ্ঞানীও পূজ্য, প্রেমিকও পূজ্য, ন্যায়বানও পূজ্য, পুণ্যবানও পূজ্য। তখন বৈষম্যের অনাদর ঘুচিয়া যায়, পরস্পরের মহিমা পরস্পরে বুঝিতে পারে। বিধাতার সৃষ্টির অলৌকিকত্ব হৃদ-বোধ হয়। হয় বটে, কিন্তু মানুষ কি সহজে এই সাধনায় জয়ী হইতে পারে? বিধাতার সৃষ্টি যে বৈচিত্র্যপূর্ণ, সে কেবল এই জন্য যে, মানুষ এই কঠোর সাধনার সময়ে পরস্পরের সাহায্য পাইবে। জ্ঞানী, প্রেমিককে ধরিবেন; প্রেমিক, জ্ঞানীকে ধরিবেন। শিক্ষার গুরুত্বে ভাব-কোমলত্ব দিবেন, একজন; আর কোমলত্বে গুরুত্ব দিবেন আর একজন। এ বিধানের ভিতরে কেমন আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম সত্য নিহিত। জ্ঞান অভাবে প্রেম চিরস্থায়ী হয় না—বিশ্ব-বিভূতি পায় না। প্রেম অভাবেও জ্ঞান লাভ অসম্ভব। দুই

পাশাপাশী না থাকিলেই বিপদ। গোলাপের সৌন্দর্য্যে যে মুগ্ধ না হয়, সে গোলাপ-তত্ত্বান্বেষণ করে না; আবার যে গোলাপের গুণ জানে না, সেও গোলাপকে ভাল বাসে না। তোমার গুণ আমি যত জানিব, ততই তোমাকে ভালবাসিব; আবার যত তোমার নিকটস্থ হইব, ততই তোমার গুণ জানিব। জানা আর ধরা, ধরা আর জানা—এত নিকটের জিনিস যে, কোন্‌টী অগ্রে, কোনটী পশ্চাতে, তাহা বুঝাও কঠিন। এই প্রকার অন্যান্য সকলই কাছাকাছী, ঘেসা-ঘেসি। একের ভিতরে অপর, অপরের ভিতরে এককে ডুবিতেই হইবে। কিন্তু মানুষ অহং-পূজক, সে ডুবিতে যায়, আবার ফেরে। গুপ্তসৌন্দর্য্যের টানে মানুষের নিকটবর্ত্তী হয়, আবার আপন ভাবে বিভোর হইয়া পশ্চাতে ধায়। ধরে আবার ছাড়ে। পায় আবার পরিত্যাগ করে। পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন, মানুষ, সংসারের কথাই বল আর আধ্যাত্মিক জগতের কথাই বল, কোন কিছুরই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু সে সাহায্য মানুষ লইবে না। আপনাকে লইয়াই মানুষ মজিবে। সৃষ্টির সৌন্দর্য্য মানুষ বুঝিবে না, ব্রহ্মাণ্ডপতির ইঙ্গিত মানুষ শুনিবে না! এই জন্যই, প্রেমিক জ্ঞান না পাইয়া সঙ্কীর্ণ মত্ততাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেছেন, জ্ঞানীও প্রেমাভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইতেছেন। উদারতা—বিশ্ববিস্তৃতভাব মানুষের হৃদয়ে আর স্থান পাইতেছে না। সমঞ্জসীভূত উন্নতি কেবল শুষ্ক মতেই থাকিয়া যাইতেছে। উন্নতির অভয় বাণী মরুভূমিতে পড়িয়া শুকাইয়া যাইতেছে। একতা, সাম্য, এসকল কবির কল্পনার বস্তু হইয়া উঠিতেছে।

আর্য্যভূমির বড় সৌভাগ্য যে, এখানে আবার পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রদায় থাকিবে না, ঘৃণা বিদ্বেষমূলক বিচ্ছেদ ঘুচিবে, সব নর নারী এক সার্ব্বভৌম প্রেমে বদ্ধ হইবে। শাস্ত্র তন্ত্র, বেদ পুরাণ, বাইবেল কোরাণ, সকলের সত্য মিলিয়া একাকার হইবে। মানব সমাজের অর্জ্জিত অতীত সত্যমূলক কীর্ত্তিকলাপকে ভিত্তি করিয়া, অনন্ত কালের অনন্ত উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া অভিনব মানব-পরিবার সংগঠিত হইবে। অসাধ্য সাধিত হইবে, বহু একত্বে মিলিবে। কি মনোমোহন বংশিধ্বনিই আকাশে উঠিয়াছিল;—কি আশার বিজয় ভেরিই চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইয়াছিল। স্মরণ করিলেও প্রাণ শীতল হয়। বড় আশা ছিল, ব্রাহ্মসমাজে এক স্বর্গের চিত্র দেখিব। ব্রাহ্মধর্ম্ম—আর্য্য এবং অনার্য্য, পাপী এবং পুণ্যাত্মা, পৃথিবীর সকল সন্তানের সকল ভাব, সকল সত্য লইয়া। যাহা কিছু সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও

এই ধর্ম্মের অবলম্বন, যাহা অনন্তকালে আবিষ্কৃত হইবে, তাহাও ইহারই অধিকৃত। কেমন উদার ভাব! কেবল মতে নহে, সত্য সত্যই আশা ছিল, পার্কারের সমঞ্জসীভূত উন্নতি সাধন যতই কঠিন হউক না কেন, সোণার ভারতে সে সাধনা জয়লাভ করিবে। আশা ছিল, যাহা পৃথিবীতে হয় নাই, তাহা এই আর্য্যভূমিতে এক সময়ে হইয়াছিল, আবারও হইবে। জগতে আর্য্যের নাম আবার উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু সত্য কথায় বলিতে গেলে, ইহাই বলিতে হইবে, মতে আজও "সমঞ্জসীভূত উন্নতি" অনেকেরই সম্বল বটে, কিন্তু জীবন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কি কুক্ষণে জানি না, ভারতের কাঁচা মাটীতে অমৃত ফলিল না! আড়ম্বরময় জীবনে মতবাদেরই আদর বাড়িল, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত অঙ্কুর জন্মিল না। সম্প্রদায় ভাঙ্গিবার জন্য যাহার সৃষ্টি, দেখিতে দেখিতে সে আর একটী নূতন সম্প্রদায়ের রূপ ধরিয়া বসিল। আবার অহং পূজা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। আবার ঘৃণা বিদ্বেষের আগুন জ্বলিল। মতবাদ কখনও উন্নতিলাভ করে নাই, কখনও করিবে না।

নাম লইয়া গোলযোগ করাতেই নানাপ্রকার বিপদ ঘটিয়াছে। নামের পূজা করিতে যাইয়াই মানুষ বাহিরে মজিতেছে। আর্য্যধর্ম্মের পরিণতিই ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিন্দু ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষই ব্রহ্মপূজা। হিন্দুধর্ম্ম উন্নতির অবস্থায় যাহা ছিল, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ভবিষ্যতে যাহা হইত, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যিনি যতই তর্ক বিতর্ক করুন না কেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্ন হিন্দুর আর উপাস্য দেবতা নাই।* পৃথিবী চিরকাল একভাবে থাকে না। উন্নতি লাভ করিতে হইবেই হইবে। আর্য্যধর্ম্ম একভাবে থাকে নাই, থাকিতেও পারে না। কালের ফেরে ইংরাজি শিক্ষা ভারতে বিস্তৃত হইতেছে; সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের আদর্শ উপরে উঠিতেছে। হিন্দুসমাজ সেই আদর্শ ধরিয়া ক্রমে অলক্ষিত ভাবে চলিতেছে। সত্য কথা বলিতে হইলে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। জাতিভেদের মূল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, পৌত্তলিকতায় প্রতি লোকের গভীর অনাস্থা জন্মিয়াছে! ইহা সময়েরই ফল, না হইয়াই পারে না। কিন্তু অনাস্থা হইয়াছে বলিয়াই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ধর্ম্ম, জীবনের,—প্রাণের জিনিস। ধর্ম্মকে প্রাণের জিনিস করিয়া দেখাইতে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজ ক্রমেই

* ১২৯২ সালের মাঘ মাসের প্রচার দেখ।

সীমাবদ্ধ স্থানে সরিতেছেন। সরিতে সরিতে এখন বড় সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। হিন্দুসমাজ আর সে আদর্শ ধরিতে পারিতেছে না। পারিতেছে না বলিয়া ঘৃণা-কটাক্ষপাত করিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজও নীরবে তাহা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। ক্ষমা নামে যে একটা দেবদুর্লভ জিনিস আছে, তাহা কাহারও জীবনে দেখা যায় না। বড়ই বিপদ উপস্থিত। ব্রাহ্ম কথাটা লইয়া একদিকে ঘৃণা চলিতেছে, একদিকে সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। কথা লইয়া মারামারী করিতে যাইয়া সকলেই আদর্শচ্যুত হইতেছেন। বাস্তবিক ব্রাহ্ম কথাটা বড়ই আপত্তিজনক। ব্রাহ্ম কথাটার অর্থ বড়ই গভীর। এত গভীর অর্থপূর্ণ কথা লইয়া নাড়াচাড়া না করিলেই ভাল ছিল। ব্রহ্মেতে জীবিত সকলেই—পৃথিবীর সকলেই ব্রহ্মকৃপার অধিকারী—সকলেই তাঁহার সন্তান, তাঁহার নিকট বড় ছোট ভেদাভেদ নাই, এ হিসাবে সকলেই ব্রাহ্ম। কিন্তু ব্রাহ্ম শব্দে এখানে তাহা বুঝায় নাই। ব্রহ্মগত জীবনই ব্রাহ্মের লক্ষণ। বড়ই শক্ত কথা। সমঞ্জসীভূত উন্নতি—অনন্ত উন্নতি ভিন্ন ব্রহ্মগত জীবন হওয়া অসম্ভব। ঈশ্বরকে আমি একটু জানিলাম, একটু ভাল বাসিলাম, তাহাতেই ত সমস্ত জানা হইল না। না জানিলে ধরিব কি? যাঁহাকে বুঝাই হইল না, ধরাই গেল না, তাঁহাগত জীবন কেমনে হইবে? যদি বল, তাঁহাকে অবলম্বন না করিয়া মানুষ বাঁচিতেই পারে না। সে হিসাবে অংশত সকলেই ব্রাহ্ম। সকলে যাহা, তাহা লইয়া এত বিবাদ কেন? দেখিতেছি, কত বিষম অনর্থই ঘটিতেছে। এই নাম লইয়াও কত বড়াই করিতেছি। আমি ব্রাহ্ম, সুতরাং আমি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকলের অপেক্ষা উন্নত!! আমি ব্রাহ্ম, সুতরাং আমি পৌত্তলিক অপেক্ষা পবিত্র!! আমি ব্রাহ্ম, সুতরাং আমি পৃথিবীর মধ্যে সকলের বড়!! আমার জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, বিবেক নাই, তাতে কি, আমি ঈশ্বর-প্রেমিক—আমি ব্রাহ্ম, ঈশ্বরের কৃপা আমার একচেটিয়া সম্বল!! আমি কাহাকেও গণিব না, আমি অহং লইয়াই থাকিব। আমার এতই অহঙ্কার! তুমি কি ছাই বুঝ, আমার নিকট উহা হিজিবিজি মাথামুণ্ড। এই অহং জ্ঞানময় জীবন হইতে ব্রহ্মকৃপাকণা উড়িয়া গিয়াছে। যে আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইতে যায়, ধর্ম্মজগতে তাহার পতন অনিবার্য্য। ব্রাহ্মজীবনে তাই কত হীনতা, কত নীচতা দেখিতে পাওয়া যায়! ব্রাহ্মসমাজ, দলে দলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে! একদল আর এক দলকে ঘৃণা করে, অপর দল আর এক

দলের বিরুদ্ধে কত কথাই বলে। ঈশ্বর-প্রেমিকের ভাব দেখ। কোথায় ঈশ্বর-ভক্ত পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে একপ্রেমে বাঁধিবে, না নিজেরাই কাটাকাটী করিয়া মরিতেছে! জগৎ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কত কালিমা-ময় নিরাশার চিত্র দেখিয়া ব্যথিত হইতেছে। গালাগালির পরিবর্ত্তে গালাগালি, শত্রুতার পরিবর্ত্তে শত্রুতারই আদান প্রদান চলিতেছে। মায়ের সন্তান, মায়ের সন্তানের আদর বুঝিল না: মাতা যেরূপ অপরাজিত স্নেহে পাপীকে ক্ষমা করেন, ভাই ভাইকে সেরূপ ক্ষমা করিতে পারিল না। আর্য্য আর্য্যের সম্মান বুঝিল না। কোথায় বা সাম্য, কোথায় বা একতা!! কোথায় বা জ্ঞান, প্রেম, বিবেক ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য!! এক ঈশ্বরের উপাসক, অথচ মত লইয়া কাটাকাটী মারামারী ক্রমাগতই চলিতেছে। এক ধর্ম্মে দীক্ষিত, অথচ পরস্পরকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেছি। তুমি হিন্দু, তুমি মুসলমান, তুমি খ্রীষ্টান, শরীরগত বা মতগত পার্থক্যে কি আসিয়া যায়, তোমরা আমাদের প্রাণের ভাই। কিন্তু আমরা আর তাহা জীবনে দেখাইতে পারিতেছি না। তোমরা আমাদিগকে ঘৃণা করিতেছ, আমরাও করিতেছি। মহত্ত্ব কোথায়? ক্ষমা কোথায়? ধর্ম্ম কোথায়? "সত্য জয় যুক্ত হইবেই" তোমাদিগকে এ কথা বলিতে আর সাহস হইতেছে না। সন্দেহ-মেঘ হৃদয়াকাশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে! তোমার সত্য তুমি যখন বল, আমার তাহা সহ্য হয় না; আমার বিশেষ কথা বলিবার সময় তোমার সহ্য হয় না; সত্যে অটল বিশ্বাস থাকিলে এরূপ হয় না। সত্য সত্যই আমরা পরস্পরকে দারুণ বিদ্বেষের কটাক্ষে দেখিতেছি। তোমরা ও আমরা একের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই। তোমাদের ভিতরে শিক্ষার জিনিস আছে, আমাদের নিকটও আছে, আমরা আর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা—আমাদিগকে চির অন্ধ করিয়া ফেলিতেছে। আপন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্মান রাখিতে পারিতেছি না। এমনই ইচ্ছা হয়, শক্তি থাকিলে বুঝি বা পরস্পরের মুখে বিষ তুলিয়া দিতাম। এমন সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে ধরিয়াছে। আমরা এ সকল জঘন্যতা আর হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিতেছি না। আমরা বুঝিতেছি—যতদিন জগতের সমস্ত ভাই ভগ্নীকে আলিঙ্গন করিয়া, বিশ্বেশ্বরের প্রদত্ত অমোঘ লুক্কায়িত সত্য তাহাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া পান করিয়া তাপিত হৃদয়কে শীতল না করিব,—যত

দিন সকল ঘটে মাতার অনন্ত প্রত্যক্ষ ছবি না দেখিতে পাইব, তত দিন আর মঙ্গল নাই। আর এই যে ব্রাহ্মসমাজ, এই সমাজ হইতে যতদিন সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া না যাইবে,—সকলের ভিতরে মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ ভাব দেখিয়া যতদিন ব্রাহ্মগণ জাতি নির্ব্বিশেষে জগতের সকল সম্প্রদায়ের ভাই ভগ্নীদিগকে ক্ষমা করিয়া প্রাণের সহিত ভালবাসিতে না পারিবেন, ততদিন সমঞ্জসীভূত উন্নতি কল্পনাতেই লিপিবদ্ধ থাকিবে ; ততদিন আর ইহার মঙ্গল নাই। 'ব্রাহ্ম' কথা তত দিন উপহাসের থাকিবে। ততদিন ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকিবে। দলের পর নূতন দল উঠিবে এবং ভাঙ্গিবে।

ব্রহ্মগতজীবন লাভ হইলে আর ঘৃণা বিদ্বেষ থাকে না। কাহাকে কে ঘৃণা করিবে? সকলেই মায়ের সন্তান। যাহাকে মা ক্ষমা করেন, সন্তান তাহাকে কিরূপে ঘৃণা করিবে? তুমি যাঁহার, আমিও তাঁহারই। মাতাই সকল ভাবে, সকল ছবিতে বিকশিত! একরূপ জগন্ময়, একরূপ ব্রহ্মাণ্ডময়। সমস্ত বিশেষত্বের মধ্যেই একত্ব। জাতীয় ধর্ম্ম পৃথক হউক,—মানুষের আকারগত বা ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আত্মায় আত্মায়, প্রাণে প্রাণের ঘনীভূত যোগ। একেই সকল স্থিতি করিতেছে। সকলেরই লক্ষ্য এক অনন্ত অপরাজিত স্নেহময় দেবতা;—পৃথিবীতে সেই দেবতার পূর্ণবিকাশ প্রেম। প্রেমই সুন্দর, প্রেমই মহান,—প্রেমেই জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি মজিয়া একীভূত। প্রেমেতে স্বর্গ মর্ত্ত্য সব বাঁধা। প্রেমে সব সুন্দর। সব সজীব। প্রেমে সব নূতন। প্রেম ভিন্ন আর কোন শাস্ত্র নাই। পরস্পরকে ক্ষমা কর, ভালবাস, আর হৃদয়ে হৃদয়ে ডুবিয়া যাও। বিশ্বেশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখ,—প্রেমতত্ত্ব জীবনগত কর। মরিবে কেন? ভুলিবে কেন? এস সকলে প্রাণে প্রাণে মিলি। এস সকলে এক হই। বিদ্বেষ পরিহার করি—সংসার-কূটবুদ্ধি ছাড়ি। মাকে ডাকি, আর মায়ে মজি। মায়ে মজি আর মায়ের ন্যায় সকলকে ক্ষমা করি। ক্ষমা করি আর ভালবাসি। হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব, খ্রীষ্টানত্ব বৌদ্ধত্ব—সকলের সকলত্ব না মিলিলে আর রক্ষা নাই। পবিত্র যোগী হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, উদ্যমশীল মুসলমানের শক্তিবাদের জাগ্রত জীবন্তভাব, আর বিনয়ী খ্রীষ্টা-নের দয়া ও ক্ষমা এবং বৌদ্ধের সংসার অনাসক্তি বা নির্ব্বাণ ভিন্ন জগতের কল্যাণ হইবে না। আপনাকে না ভুলিলে আর রক্ষা নাই। তাই, ইতি-

হাস পড়, সময়ের ভাব বুঝ—তার পর এই কঠোর সাধনায় রত হও। আর্য্য-ভূমিকে ধর্ম্মে মাতাও—নচেৎ আর আর্য্যভূমি টিকে না। কঠোর সাধনায় ডুবিয়া যাও। যশ, মান ভুলিয়া, বাহিরের আড়ম্বর ভুলিয়া জীবনে জীবন্ত দেবতাকে লাভ করিতে চেষ্টা কর। নচেৎ তোমার আমার অন্তঃসার-শূন্য কথা কে শুনিবে? জীবন চাই। সমঞ্জসীভূত উন্নতি চাই। চরিত্র চাই। সকলের উপর মাকে চাই, মায়ের সকল সন্তানকে চাই। ঘৃণা বিদ্বেষ পুষিতেছ, অথচ মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছ?—ভণ্ড, দূর হও। মায়ের আদর্শে জীবনকে গঠন কর, নচেৎ সকল শ্রম বৃথা হইবে। দলাদলিই সার হইবে। ধর্ম্মহীনতায় আর্য্যত্ব রক্ষা পাইবে না। সকলে ঘৃণা বিদ্বেষ পরিহার কর, যশমান লইয়া, শূন্যমত লইয়া কাটাকাটি করিলে কি হইবে? যে যেখানে যে ভাবে থাক, সমঞ্জসীভূত উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হও। জ্ঞানী—জ্ঞান দেও, প্রেমিক প্রেম বিলাও। উপহাস, নিন্দা, ঘৃণা বিদ্বেষ—অহংজ্ঞান-মূলক সকল সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন দেও। আর্য্যভূমি আবার মাতিবে, আবার জাগিবে, নচেৎ আর্য্যভূমির নাম অচিরাৎকালের মধ্যে বিস্মৃতির অনন্তগর্ভে ডুবিয়া যাইবে। অসংখ্য দেবালয় মৃত জীবের আশ্রয় হইবে—ধর্ম্মমন্দির সকল পিশাচের নৃত্যশালা হইবে। জীবন্ত ধর্ম্মসাধন কথার কথা নয়, প্রাণ না ঢালিলে, ছলনায় তাহা হইবে না। প্রাণ চাও ত প্রাণেশ্বরকে স্মরণ কর, মান অভিমান পরিত্যাগ করিয়া মাতার চরণে পড়। মা দয়াময়ী, অবশ্য দয়া করিবেন।

অন্ধকার বা নিবৃত্তি সাধন।

প্রকৃতির দুই রূপ,—আলোক ও আঁধার। একরূপ সংসার-সুখরূপ মহা আসক্তির প্রতিকৃতি, আর একরূপ দুঃখ-শ্মশানরূপ মহা নিবৃত্তির ছবি। একরূপ আসক্তিরূপিণী অন্নপূর্ণা, আর এক রূপ বৈরাগ্যরূপিণী শ্মশানকালী। অধিকাংশ মানুষ এই দুই রূপের মধ্যে সাধারণত আলোকের বা আসক্তির উপাসক। অন্ধকারে বসিতে, শ্মশান চিন্তা করিতে, নিবৃত্তির সাধন করিতে বা মহাকালীর অনন্ত রূপ ধ্যান করিতে মানুষ বড়ই নারাজ।

মানুষ বড়ই আলোক-প্রিয়। মানুষ অন্ধকারেও বাতি জ্বালাইয়া রূপ দেখে, বা রূপে মজে। অথবা মানুষ রজনীর চেয়ে দিনকে অধিক ভালবাসে, —রজনী প্রভাতে তাই তাহার কত আনন্দ, কত হাসি, কত মধুর উৎসব। রজনী আগমনে মানুষের শরীর অবসন্নতা ও জড়তা লাভ করে, আঁখি মুদিত হইয়া আইসে, মহা অচৈতন্যে ডুবিয়া থাকে। আর সূর্য্যোদয়ে, আর আলোকের সমাগমে যে প্রভাত-গগণ কাঁপাইয়া, প্রভাত-বায়ু আন্দোলিত করিয়া উৎসবের মধুর সঙ্গীত ধরে। রজনীতে নিরানন্দভাব, অবসন্নভাব; দিবসে উল্লাস হাসি, আসা-যাওয়া, কাজ কর্ম্ম, কত কি! মানুষ বড়ই আলোক-প্রিয়। মানুষ যেন নিবৃত্তি-রূপ আঁধার রাজ্যের জীব নয়—আসক্তি-রূপ সংসার-আলোকের সেবক।

কেন এরূপ? না—মানুষ বাহ্যশোভা-সৌন্দর্য্যের দাস। রূপজ-মোহ মানুষের গতি-নিয়ামক। "দেখি দেখি, আরো দেখি, ছি ও প্রফুল্ল মুখ বসন-অমাবস্যায় ঢাকিও না, আমার প্রাণে দুঃখের বাণ বিদ্ধ করিও না।" মানুষ নীরবে এবং সরবে সদা যেন এই কথাই পরস্পরের নিকট ঘোষণা করিতেছে। ফুলের বা রূপের বাগানে বসিয়া মানুষ প্রণয়-মালা গাঁথে, আর হাসে, গায়, নাচে। কেবল রূপ-পিপাসা, কেবল সৌন্দর্য্য-লালসা, কেবল চাওয়া-চাওয়ি-ভাব মানুষের হাড়ে মাংসে জড়িত। এই জন্যই মানুষ অমাবস্যার রাত্রি অপেক্ষা পূর্ণিমাকে অধিক ভালবাসে। মানুষ বলে, "চাঁদ, আমার প্রাণ কাঁদা'য়ে তুমি অস্ত যেও না,—তোমার পায়ে ধরি, আমায় মের না!" মানুষ বড়ই রূপ-প্রিয়, বড়ই সৌন্দর্য্য-প্রিয়। প্রকৃতির দুই রূপের এক রূপ লইয়াই সে ব্যতিব্যস্ত।

আমরা দেখিয়াছি, যতদিন মানুষের এই বাহ্যরূপ-প্রিয়তা থাকে, ততদিন অরূপ-প্রিয়তা, অর্থাৎ চিন্ময়-রূপ-প্রিয়তা, অনেক দূরে। যতদিন আলোক-প্রিয়তা, ততদিন আঁধার-প্রিয়তা মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ। "আমার এই চোক থাকিতে আমি দেখিব না?—অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিব না?—চোক বুজিয়া বসিয়া আঁধারের সেবা করিব?—ধ্যানস্থ লইয়া নিরাকার শূন্য চিন্তা করিয়া জীবন কাটাইব? তোমার এ উপদেশ ঐ কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দেও, আমি ভরা যৌবন লইয়া পৃথিবীর রূপ দেখিয়া, রূপ বেচিয়া ঘুরিব ফিরিব;—আয় সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি, তুই শোভা সৌন্দর্য্য লইয়া আয়, আমি তোতে মজিয়া ডুবিয়া মানুষ হই।"—মানুষ প্রতিনিয়ত এই কথাই চতুর্দ্দিকে

ঘোষণা করিতেছে। সৌন্দর্য্য-জগতের দাসত্ব করিতে মানুষের প্রাণ সদাই ব্যতিব্যস্ত। আলোক, সৌন্দর্য্য-প্রকাশক, তাই আলোক দেখিলে তার জড়তা ও অবসন্নতা দূর হয়। মানুষ চোক বুজিলে আঁধার দেখে, তাই চোক বুজিয়া চেতন-শক্তিবিশিষ্ট থাকিতে পারে না। হয় চোক বুজিয়া সে ঘুমাইবে, না হয় চোক মেলিয়া শোভা দেখিবে। পূর্ণিমার পরিবর্ত্তে অমাবস্যা সে দেখিতে পারে না। মানুষের স্বভাবই এরূপ নয়। একজন লোক অন্ধকারে বসিয়া থাকিবে, মানুষের ইহাও সহ্য হয় না। সে নিজেও অন্ধকারে থাকিবে না, অন্যকেও অন্ধকারে বসিয়া থাকিতে দিবে না; সে আলো ধরিয়া অন্যের মুখ-শোভা দেখিবেই দেখিবে। মানুষের এ কি প্রকৃতি!

মানুষ যতদিন সৌন্দর্য্যের উপাসক, ততদিন এরূপ না হইয়াই পারে না। আলোক, সৌন্দর্য্য-প্রকাশক। আকাশের পূর্ণচাঁদ কত মিষ্ট, বাগানের অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ফুল কত মধুর, পাহাড়ের কুল-কুল-নাদী ঝরণা কত মনোহর! বিশ্বেশ্বরের চিদানন্দরূপ জমিয়া জমিয়া যেন এই সকলে মনোহর রূপ ফুটিয়াছে! ইহাতে কত ভাব, কত শিক্ষা, কত দর্শন, কত কাব্য, কিন্তু ইহা বুঝে কয় জন? মানুষ বুঝে না, তবুও পাগল হইয়া দেশে বিদেশে যাইয়া কত শোভা সৌন্দর্য্য দেখে, কত অর্থ, কত পরিশ্রম ব্যয় করে! রূপ-পিপাসা মিটাইবার জন্য কত আয়োজন, কত চেষ্টা! ধন, মান সর্ব্বস্ব এজন্য মানুষ ঢালিয়া দেয়। সৌন্দর্য্যের মূলে যে চিৎঘন আনন্দরাশি বিদ্যমান, বাহ্য-সৌন্দর্য্যকে সেই আনন্দরাশি হইতে পৃথকরূপে যতদিন মানুষ ভাবে, ততদিনই এরূপ অবস্থা। অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-জ্ঞাপক বা বিভিন্নত্ব-প্রকাশক আলোক ততদিন মধুর, যতদিন একত্ববোধ বা অরূপ-বোধ জন্মে না। সে কেমন কথা, ক্রমে বলিতেছি।

সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা মানুষের আদি স্বভাব, কুরূপ-প্রিয়তা মানুষের পরিণাম। অথবা মানুষ আদিতে সুন্দর, অন্তে কুৎসিৎ বা কদাকার। ছোট শিশুর কচি কণ্ঠের মিষ্ট কথা কত সুখ দিত, কিন্তু সে শিশু আজ আর শিশু নয়। আজ সে যুবক। যুবকের শোভা আরো মধুর—রূপের বাজারে কত আনন্দ, কত বিবাহের উৎসব, কত বসন্তের কেলি। কিন্তু স্থির হও, আজ কাল করিতে করিতে, দেখিতে দেখিতে, কয়েকটী বৎসর মাত্র যাইল, অনন্তের এক বিন্দুমাত্র যাইল, আর এ কি হইল! রূপ—এখন অরূপ ধরিতেছে, —সৌন্দর্য্য এখন বিলীন হইতেছে! ক্ষীণ-দেহ, গলিত-চর্ম্ম, পক্ক-কেশ, শূন্য-দন্ত, কর্কশ-স্বর, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক—চরণ আর চলিতে চাহে না, হাত আর

নড়িতে পারে না,—এ কি ভাব! হায়, ভবের বাজারে দু দশদিন পূর্ব্বে যে রূপের গৌরবে গর গর করিয়া বেড়াইত, তার আজ এ কি বেশ! এক দিন দেহ-শোভার উপরে আবার কত বসন ভূষণের শোভা চড়িয়াছিল, আজ সে সাধই বা কোথায়, সে সৌন্দর্য্য-বোধই বা কোথায়, সে রূপই বা কোথায়? মানুষ যায়, যায়, যায়; ঐ দেখ, মহা আঁধারে সে ডুবিতে মহা প্রস্থান করিয়াছে! রূপ এখন অরূপ, সৌন্দর্য্য এখন কুৎসিৎ,—এখন মানুষ আঁধার চায়, এখন মানুষ কৃষ্ণরূপী অজপা হরিনাম জপ করে, এখন মানুষ করালবদনী কালীর নাম উচ্চারণ করে, আঁধার-ভস্ম গায়ে লেপে। যুবকের মুখে রাধার নাম শুনিলে শুনিতে পার, কিন্তু কৃষ্ণের নাম বড় একটা শুনিবে না;—যুবকের মুখে গৌরাঙ্গিনী অন্নপূর্ণার নাম শুনিলে শুনিয়া থাকিবে, কিন্তু মহামায়া কালী,—শ্মশানবাসিনী,—এলোকেশী,—উগ্রচণ্ডী, মুণ্ডমালিনীর সেই প্রলয়ঙ্করী, সেই বিশ্ব-বিনাশী ভয়ঙ্কর নাম শুনিবে না। কিন্তু বৃদ্ধ, তার এখন রূপ গিয়াছে, তার এখন সাধ গিয়াছে, সে এখন দিবানিশি কৃষ্ণ নাম জপে, সে এখন দিবানিশি আঁধারে বসিয়া শ্মশানকালীর ধ্যান করে, সে এখন নিবৃত্তি বা মৃত্যুকে স্মরণ করে, সে এখন শ্মশানভস্ম গায় মাখে। সে এমন অমাবস্যাকে, মহামরণকে লক্ষ্য করিয়াছে। অন্নপূর্ণা আসক্তিময়ী, সংসাররূপিণী; কালী শ্মাশন-রূপিণী, নিবৃত্তিময়ী।

আমি যে কথা বলিতেছিলাম,—আসক্তিসুখ যুবকের নিকট আদরের হইলেও বৃদ্ধের নিকট নয়। তবে বৃদ্ধের মধ্যেও লম্পট গোছের লোক আছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। আলোক আসক্তিকে বৃদ্ধি করে, সুতরাং বৈরাগ্য-সেবক বা নিবৃত্তি-পিপাসু বৃদ্ধের নিকট তাহা বড় একটা আদরের নয়। যে দেশের লোক গহন বনে, বিজন অরণ্যে, গভীর গিরিগুহায় যাইয়া এক সময়ে পরমাত্মার চিন্তা করিত, যে দেশের লোকে অন্ধকারে বসিয়া নাম-মালা জপিত বা সান্ধ্য-ধ্যান করিত, সেই দেশের লোকেরা এখন শাঁকঘণ্টা বাজাইয়া, আলোকের ধারে আলো জ্বালিয়া মহা ধুমধামে ইষ্টদেবতার আরতি করে। যে দেশে নির্জ্জন খোলা ময়দানে গভীর অমাবস্যায় শ্মশানকালীর পূজা হইত, সে দেশে আজ কাল নগরকালীর পূজা চলিতেছে;—ধর্ম্মের নামে মদ বেশ্যায় দেশ ডুবিতেছে। সে দেশও নাই,এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সেরূপ সাধকও নাই। আর কাহার কথা বাকী রহিল? ব্রাহ্মসমাজেও দেখি, আসক্তি-আলোকের জাঁকজমকে

বসিয়া, চোক বুজিয়া উপাসনা করার ভাব চলিতেছে। বিরোধী ঘটনার সমাবেশ দেখিলে কাহার প্রাণে আঘাত না লাগে? এদিকে চোক বুজিতে হইবে, অথচ জাঁকজমক চাই, আলোকের খুব ধুমধাম চাই। একই সময়ে এরূপ আলোক-আঁধারের ভাব কেন, আমরা বুঝি না। তাই প্রাণে বড় কষ্ট পাই। উপাসনা করিতে যাইবার সময় পোষাক পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষারই এত চাকচিক্য কেন? এত কেশ বিন্যাস কেন? এত রূপের বাহার কেন? এ সকল দেখিলে আসক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের সকল স্থানে যে প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মের পূজা হয়, ব্রহ্মের নাম সাধন হয়, ইহা বোধ হয় না। হয় না বলিয়াই বুঝি বা চরিত্রহীন লোকের এত প্রাধান্য। প্রকৃত পূজা, আসক্তির রাজ্য ইহতে অনেক দূরে, আলোকের অনেকদূরে,—অন্ধকারময় আত্মার অন্তঃপুরে, নিবৃত্তির রাজ্যে। এই জন্যই দেখিতেছি, ব্রাহ্ম-দের মধ্যেও যাঁহারা সাত্বিক গোছের লোক, তাঁহারা অরণ্যে বা নির্জ্জনে বাস করিতে অধিক ভালবাসেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অনেক দিন সংসারত্যাগী। মহাত্মা কেশবচন্দ্র,শেষ জীবনে, পাহাড় পর্ব্বতে, লোকালয় হইতে অনেক দূরে থাকিতেই ভালবাসিতেন। এখন প্রতাপচন্দ্র বা রাজনারায়ণ লোকারণ্য পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন প্রদেশ বা অন্ধকারে বসিতেই অধিক ভালবাসেন। কিন্তু সমগ্র ব্রাহ্মদেশে এখনও সারি সারি আসক্তির বাত্তি জ্বলিতেছে,—রূপের বাহার, রসের কেলি চলিতেছে। বিধাতা এদেশের এরূপ অবস্থা কত দিন রাখিবেন, কে জানে!

অন্ধকার ভিন্ন বিশ্বেশ্বরের পূজা অসম্ভব। অন্ধকার, অনন্ত-প্রকাশক। সব মিলাইয়া, সব রূপ একীভূত করিয়া, আঁধার, বিশ্বেশ্বরের অনন্তত্ব ঘোষণা করে। শিব যিনি. তিনি শ্মশানবাসী, আঁধারময়ী শ্মশান-কালীর সেবক। আর সাধিকা-শ্রেষ্ঠ রাধারাণীর কথা আমি কি বলিব;—তিনি কালরূপ, ঐ আঁধার রূপে যে শোভা দেখেন, পৃথিবীতে এমন শোভা বুঝি আর নাই। আঁধার-কেলিকদম্ব তলে, ঐ আঁধারময় নিবৃত্তি-রূপ কৃষ্ণের মুখে যখন বাঁশী বাজে, রাধার প্রাণ তখন সংসার ছাড়িয়া ঐ অনন্ত আঁধারে মিলিত হয়, তাঁর প্রাণ দেহ-গৃহে থাকে না। সংসারে থাকিয়াও আঁধারকে যে ভালবাসা যায়, এদেশে শ্রীরাধিকাই তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। লোকে বলে, যার ঘরে স্বামী আছে, তার আর কিসের অভাব? সংসারে ভরা সুখ;—কিন্তু রাধারাণী ঐ আঁধারময় কৃষ্ণরূপের জন্য সংসার-বিরাগিনী; সব তুচ্ছ করিতেছেন। আছে,

থাক; যাইতে ইচ্ছা, চলিয়া যাও। আসক্তি লোপ পাইয়াছে, সংসারের সকল বস্তুতেই তুচ্ছ জ্ঞান,—সকলকে আঁধারে ডুবাইয়া ঐ অরূপকে তিনি ধ্যান করিতেছেন। দর্প করিয়া ননদিনীকে বলিয়া দিতেছেন—"বল ননদিনি নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরে।" পূজা বা সেবার মর্ম্ম ইনিই বুঝিয়াছিলেন। আর যিনি দেবদেব মহাদেব, তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া, বিশ্বসংসারকে মহা আঁধারে ডুবাইয়া, সেই আঁধারের মধ্যে অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিতেন। ত্রিনয়না কাম, ক্রোধ, পাপ প্রলোভনরূপী অসুরবংশ ধ্বংস করিয়া ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, জগৎকে মহা নিবৃত্তিরূপ আঁধারের মর্ম্ম শিখাইতেছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষ যতদিন বাহ্য শোভার দাস, ততদিন আঁধারকে ভালবাসে না। আয়না ধরিয়া আপন মুখ এবং বাতি জ্বালিয়া অন্যের সৌন্দর্য্য দেখে। পিশাচের লীলাস্থলের ব্যাপার। কিন্তু এই বাহ্য শোভা দেখিতে দেখিতে যখন চক্ষু নিমেষ-শূন্য হয়, তখন বাধ্য হইয়া এই মহা আঁধারের মর্ম্ম বুঝিতে হয়, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বলিয়াছি, আঁধারই মানুষের লক্ষ্য, বৈরাগ্য বা নিবৃত্তিই মানুষের পরিণাম। সব ছাড়িতে হইবে, সব রূপ ডুবাইতে হইবে, সব ঘরকন্নার চোটপাট শেষ করিতে হইবে,—সব বাতি নিবাইতে হইবে, তবে সেই আঁধার ঘরের মাণিককে দেখিতে পাইবে। মহা অন্ধকারে ডুবিয়া আত্মার মূলে নামিলে তবে সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। "যদি সেই জ্যোতিঃ দেখিতে চাও, অন্ধকার বা নিবৃত্তি সাধন কর,"—মৃত্যু প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে কেবল এই কথাই ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তবুও মানুষ সে কথা বুঝে না, সে কথায় কাণ দেয় না। না দিক্ কাণ, বার্দ্ধক্যত মানুষকে ভুলিয়া থাকিবার নয়, মৃত্যুত মানুষকে ছাড়িবে না ঐ দেখ, আঁধার—আঁধার;— রূপ ডুবাইতে, সব একাকার করিতে কেমন মহা আঁধার আসিতেছে। বৃদ্ধ,—স্থির হও, অরূপ দেখ, করালবদনীর অনন্তরূপ নিরীক্ষণ কর। অনন্ত ভিন্ন আর সান্ত নাই: ঐ দেখ, সব নির্ব্বাণের কোলে, আঁধারের কোলে ডুবিয়া গিয়াছে। এক অপরূপ জ্যোতি চিরপ্রকাশবান। সে জ্যোতি চিদ্‌ঘন আনন্দ রাশি।

তবেই বুঝা যাইতেছে, আলোক সংজ্ঞা-জ্ঞাপক বা সান্ত-প্রকাশক, আর আঁধার অসীম অনন্তত্ব-জ্ঞাপক। দিবসে কি দেখি? বৃক্ষ তলা, ফুল ফল, তুমি সে, যাহাকে দেখি, সবই যেন সান্ত; সব যেন বিন্দু বিন্দু। এই সান্তের মধ্যেও

অনন্তকে কল্পনা করা যায়, সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু সেরূপ কল্পনা করিতে পারা তোমার আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শারদপৌর্ণমাসীর অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিলেই আমাদের মন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়;—একে ধরি, তাকে ভালবাসি, একে পূজি, তার সেবা করি। কত দেবতা, কত আসক্তি। আর যখন অমাবস্যার ঘোর আঁধার—আকাশ পৃথিবী, নদ নদী, বৃক্ষ তলা, স্ত্রী পুরুষ সব একাকার করিয়া ফেলিয়াছে,—এ চোক আর বিভিন্নরূপ দেখে না, এ প্রাণ আর ভেদাভেদ গণে না,—বিষ্ঠা চন্দন, রাজা প্রজা সমান,—তখন আপনা আপনি এ প্রাণটা যেন কেমন হইয়া যায়। যখন সংসারের আসক্তির আলোকে বসি, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পরিজন, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলে যেন মনটা ভাগ ভাগ করিয়া লইতেছে। আর যখন শ্মশানের নিবৃত্তিরূপ আঁধারে যাই—কোথায় বা পুত্র, কাথায় বা আত্মীয়, কেথায় বা পরিজন—সব যেন ভস্মময়,—সব আঁধারময়, সব একাকার। তবেই বুঝা যাইতেছে,—আলোক দ্বৈতজ্ঞানমূলক;—আঁধার অদ্বৈত-জ্ঞান-মূলক। আলোক ভেদাভেদ জন্মায়, আঁধার ভেদাভেদ লোপ করে। সংসার আসক্তি বাড়ায়, শ্মশান বৈরাগ্যের উদয় করে। দ্বৈত-জ্ঞান প্রথম, অদ্বৈত-জ্ঞান শেষ পরিণতি। মানবজীবনে ইহারই পরিচয় পাওয়া যায়। আসক্তির পথ ধরিয়াই নিবৃত্তি বা বৈরাগ্যের পথে যাইতে হয়। সংসারে বসবাস না করিয়া, জন্মিয়াই কেহ শ্মশান-বাসী শিব হইতে পারে না। সংসারে থাকিয়া, সংসারকে জয় করিয়া, তবে মানুষ শ্মশান বা শিবধামের অধিকারী হয়। কিন্তু এ অতি কঠিন সাধন। আসক্তিরূপ অন্নপূর্ণার পূজা করিতে হইবে সংসারে বসিয়া, বৈরাগ্যরূপ মহাকালীর পূজা করিতে হইবে নিবৃত্তি-শ্মশানে যাইয়া। কিন্তু এটাও সেবার চরমোৎকর্ষ নয়। পূজার চরমোৎকর্ষ সেখানে, যেখানে আর দ্বিত্ব-জ্ঞান নাই। সেখানে সংসার ও শ্মশান, রাধা ও কৃষ্ণ,—হর ও গৌরী মিলিত হইয়া একরূপ ধরিয়া ভক্তের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। তখন আলোক ও আঁধার, আসক্তি ও নিবৃত্তি—সকলে সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে। মানুষ যত দিন কেবল আলোকের উপাসক, যতদিন সে সংসার-জয়ী নয়, ততদিন এই জ্ঞান লাভ অসম্ভব। মানুষ আলোকের সেবা করে, আঁধারের সেবা করে না;—সজন চায়, নির্জ্জন ভালবাসে না;—সংসার চায়, শ্মশানকে ঘৃণা করে। এই জন্যই মানুষের অশেষ দুর্গতি, রিপু-সংগ্রামে সে পরাস্ত। মানুষ ভিন্নত্বের পূজা বা পাপের সেবা করিয়া দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর কি শোচনীয় অবস্থা।!

শাক্যসিংহ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই রাজ্যসুখ পরিহার করিয়া সেই নিরঞ্জনা মহাপুণ্য তীর্থে আশ্রয়-তরুতলে গভীর নিবৃত্তি-রূপ মহা সমাধিতে চিত্ত-নিমগন করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সংসারকে জয় করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, নির্ব্বাণ ভিন্ন, আঁধার-সেবা ভিন্ন, আত্ম-লোপ ভিন্ন মানুষের মুক্তি নাই। মহা-নির্ব্বাণ, মহা নিবৃত্তি, মহা আঁধার—বৌদ্ধধর্ম্মের সার কথা।

কিন্তু আসক্তি এবং নির্ব্বাণ, এখানেও দুই পৃথক স্থানে রহিয়াছে। ইহাও পূজার চরমোৎকর্ষ নহে। পূজার চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, এদেশে মহাদেব। এক কণ্ঠে বৈরাগ্য-মরণের বিজয় মঙ্গল সঙ্গীত গাইতেছেন, অন্য কণ্ঠে সংসার-গৌরীর মহাপ্রেম-উতলা-তান ধরিয়াছেন।—এক চক্ষু নিমীলন করিয়া স্বর্গের শোভা দেখিতেছেন, আর চক্ষু সংসারের শোভায় নিবদ্ধ। আসক্তি এবং বৈরাগ্যের এমন যুগল মিলন আর কোথাও নাই,—কোথাও হয় নাই। আর্য্যভূমিতে বা শিবধামে যেমন নিবাকার ব্রহ্মের পূজা হইয়াছে, সেরূপ বুঝি বা আর কোথাও হয় নাই।

এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? আমারা যদি দু ঘণ্টা আলোকে বসি, আর দু ঘণ্টা তবে আঁধারে বসিতে অভ্যাস করা উচিত। দু ঘণ্টা যদি আত্মীয় পরিজনের ভালবাসা লইয়া থাকিতে চাই, আর দু ঘণ্টা তবে তাদের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইবে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে,—এইরূপ সাধন করিতে করিতে আলোক আঁধারে সমান জ্ঞান জন্মিবে,—মিলন বিচ্ছেদ উভয়ই তুল্য হইবে। এখন বন্ধুমিলনে মাতি, বন্ধুবিচ্ছেদে কাঁদি; এখন সৌন্দর্য্য দেখিলে আনন্দিত হই, না দেখিলে নিরাশায় ব্যাকুলিত হই। তখন আর এরূপ ভাব থাকিবে না। তখন আলোকের ধারে বসিয়াও সান্ত বা সসীম পদার্থের ভিতরে অনন্তকে দেখিতে পাইব, আঁধারের মধ্যে ডুবিয়াও অনন্ত জ্যোতিস্বরূপকে সান্ত-রূপে দেখিতে পাইব। আলোক তখন অনন্তজ্ঞাপক হইবে, আঁধার তখন সান্ত-প্রকাশক হইবে। অথবা আঁধারে তখন রূপ জমিবে। অথবা উভয় মিলিয়া এমন আকার ধারণ করিবে—যাহাকে হরকালীর যুগল মিলন, বা বিশ্বম্ভরের বিভিন্ন প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। তখন এক রূপ, এক ধ্যান, এক চিন্তা ভিন্ন আর কিছু থাকিবে না। দ্বিত্ব-জ্ঞান বা দ্বিত্ব-ভাব লোপ পাইবে। ভুবন-ময়ী বিশ্বেশ্বরীকে আলোক ও আঁধারে, আসক্তি ও নিবৃত্তিতে সমভাবে দেখিয়া মোহিত এবং স্তম্ভিত হইয়া যাইব। তাহাই মুক্তির অবস্থা, তাহাই বৈকুণ্ঠ, তাহাই মোক্ষ।

সেই অবস্থা যদি লাভ করিতে চাও, মানুষ, তবে মিলন ছাড়িয়া বিচ্ছেদ-সাধন, সংসার-আসক্তি ছাড়িয়া নিবৃত্তি-সাধন,—আলোক ছাড়িয়া অন্ধকার সাধন কর। দশ বৎসর বন্ধুর ভালবাসার সাধন করিয়াছ, আর দশ বৎসর বন্ধু-বিচ্ছেদ সহ্য কর। দশ বৎসর আলোকে বসিয়া রূপ দেখিয়াছ, এখন দশ বৎসর আঁধারে বসিয়া অরূপের চিন্তা কর,—দশ বৎসর আসক্তির পূজা করিয়াছ, এখন দশ বৎসর বৈরাগ্য-সাধন কর। ধর্ম্মসাধন আর প্রকৃতি সাধন, উভয়ই এই কথা। ধর্ম্ম সাধন হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতি-সাধন হয় নাই, অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন্ন ঘটনায় সমজ্ঞান জন্মে নাই, ইহা অসম্ভব। সকল অবস্থায়, সকল বস্তুতে সেই অরূপের রূপ যে দেখে, সেই ধার্ম্মিক; তাঁর সহিত যুক্ত হওয়াই ধর্ম্ম। বিশ্বম্ভরের অনন্তত্বে আত্মবিসর্জ্জন করাই ধর্ম্ম। কিন্তু তাহা কি সোজা কথা? মানুষ, বাতি নিবাইয়া আঁধার হৃদয়-কুটীরে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখ;—আঁধার ঘরের মাণিককে চিনিয়া লও, তারপর সকল অবস্থায় তাঁর লীলা দেখ, তবে ত মানুষ হইবে! তবে ত ধর্ম্ম বুঝিবে! তিনিই ধর্ম্ম। সেই তিনি-সাগরে ঝাঁপ দিয়া আত্ম-হারা হইয়া ডুবিয়া যাও। বৃথা রূপ রূপ করিয়া আর মারিও না। সকল রূপের সার ঘন রূপ তিনি। সেই রূপ সাগরে ঝাঁপ দেও।

পরোপকার-ব্রত।

শ্যামচাঁদ আগরওয়ালা কলিকাতার মধ্যে একজন প্রধান ধনী। তাহার ঘরে টাকার উপর টাকা স্তুপাকৃত—নোটের উপর নোট রাশীকৃত। কত টাকা তার ঘরে আছে, লোক সংখ্যা করিতে পারে না। কেহ বলে, বিশ কোটি, কেহ বলে পঞ্চাশ কোটি, কেহ বলে শত কোটি। যাহা হউক, আগরওয়ালা কলিকাতার মধ্যে যে একজন বড় ধনী, যাহারা তাহাকে জানে, তাহাদের মধ্যে এবিষয়ে মতভেদ নাই। এত টাকা সত্বেও লোক কিন্তু বড় একটা তার দ্বারস্থ হয় না—অনেক লোকই তার নাম জানে না। যাহারা জানে, তাহারা ঐ নাম শুনিলে ভ্রু কুঞ্চিত করে। প্রাতে তার নাম করিলে হাঁড়ি ফুটিয়া যাইবে, সে দিন অন্ন মিলিবে না বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। আগর-ওয়ালা কিন্তু সে সকল কথা ভাবেও না, সে আপনার ধন-মদে মত্ত, আপনার সাজ সজ্জায় আপনি বিভূষিত। পর্ব্বতাকার ভুঁড়ি সম্মুখে করিয়া সে

যখন নানা বেশ ভূষায় সাজিয়া বসিয়া থাকে, তখন, তার ধারণা, এ পৃথিবীতে যেন তার সমতুল্য ব্যক্তি আর নাই। কিবা তার অহঙ্কার-পূর্ণ চক্ষের চাহনি, কিবা তার অঙ্গভঙ্গি,—অহঙ্কার যেন সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। বাড়ীতে গাড়ী ঘোড়া গিস্ গিস্ করিতেছে, চাকর চাকরাণী হই-হই রই-রই করিতেছে। আগরওয়ালার বাটীতে ব্রাণ্ডি স্যাম্পেনের অভাব নাই, উইলসনের বাড়ীর নানা খাদ্যের অপ্রতুল নাই, —কিন্তু সে বাড়ীতে কখন কাহারও পাত পড়িয়াছে বলিয়া কেহ কখন শুনে নাই। আগরওয়ালা কখন কাহাকে দুপয়সা দান করিয়াছে, কেহ কখন দেখে নাই। আপনার ধন সম্পত্তির উপর বসিয়া সে আপনার অহঙ্কারে আপনি মত্ত কেহ কাছে গেলে একটা কথাও বলা নাই,কেননা,তার সমতুল্য ব্যক্তি ত আর নাই। কি কুৎসিত দৃশ্য! অথচ এরূপ দৃশ্য কলিকাতার পল্লীতেং দেখা যায়।

নবসহর কলিকাতার আর একটী দৃশ্য দেখ। স্বর্গীয় তারক নাথ প্রামাণিক এক জন মধ্যবিৎ গোছের ধনী বৈষ্ণব। তাঁহার গায়ে এক খানি নামাবলী, পরিধানে সামান্য ঠেঁটী, এক দিন কালীসিংহের বাড়ীর সম্মুখ-স্থিত রাস্তা দিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। কথিত আছে, ভক্তের সামান্য বেশ দেখিয়া সিংহজী ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। ভক্ত আপন কাজ সমাধা করিয়া বাড়ী গেলেন, কথাটী বলিলেন না। সময়ান্তরে শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহ্বান করিয়া সকলকে শাল বনাত উপহার দিলেন এবং সকলকেই সিংহজীর বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতে একান্ত অনুরোধ করিলেন। শত শত লোকের নিকট শাল বনাত দেখিয়া কালীসিংহ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা এসকল কোথায় পাইলেন," তখন সকলেই এক বাক্যে উত্তর করিলেন, "দাতা তারক প্রামাণিক দিয়াছে।" সিংহজী পূর্ব্ব বিদ্রূপের কথা ভাবিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন। এই ভক্ত বৈষ্ণবের পরোপকার-ব্রতের কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। শুনিয়াছি, তাঁর বাড়ী হইতে কেহ কখনও বিমুখ হইয়া ফেরে নাই। অথচ ইহাঁর দানের তালিকা কোন সংবাদ পত্রে এ পর্য্যন্ত উঠে নাই। নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শিক্ষায় এক রূপ বঞ্চিত ছিলেন, অথচ কলিকাতায় তাঁহার নাম জানেনা, এমন লোক নাই। তাঁর নাম করিলে সকলের প্রাণেই যেন কেমন একটু আনন্দ উপস্থিত হয়। কি সুন্দর দৃশ্য!

এই রূপ আর একটী দৃশ্য আছে দেখ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম কেনা

শুনিয়াছে? এক যোড়া চটী জুতা পায়, এক খানি সামান্য উড়নী গায় দিয়া সামান্য ভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন রাস্তা দিয়া চলিয়া যান, কেহ তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারে না। কিন্তু মাসান্তে যখন তিনি দানের ফর্দ্দ খুলিয়া পরোপকার-ব্রত পালন করিতে বসেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে চক্ষু সার্থক হয়। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত এই ভারতবর্ষে আরো অনেক থাকিতে পারে; তিনি আর আর যে সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেরূপ কার্য্যও আরো অনেকের দ্বারা হইতে পারে; এ সকল তাঁহাকে সর্ব্বজন-পূজ্য করে নাই। তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব—হৃদয়ে। শত শত মনুষ্যের শত শত দুর্ব্ব্যবহারে হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তবুও দরিদ্রের কথা শুনিবামাত্র অবিরল ধারায় তাঁহার দুই চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা নাই, দরিদ্র ঠাকুর সুবিধা পাইলেই অজস্র ধারে দান করেন। সময় সময় এমন হইয়াছে, সৎকার্য্যে নিজের বসত বাড়ীখানি পর্য্যন্ত দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সহৃদয়তার এমন সুন্দর ছবি আর কি আছে? এরূপ দৃশ্য কলিকাতায় অতি বিরল।

উপরে যে দুই রকমের ছবি অঙ্কিত হইল, ইহার মধ্যে কোন্‌টী সুন্দর? একথার উত্তরে, বোধ হয়, সকলেই বলিবেন যে, দ্বিতীয় দুটী চিত্রই সুন্দর। লোকের ধন থাক্, জ্ঞান থাক্, যদি হৃদয় না থাকে, দয়া না থাকে, তবে মানুষের মনুষ্যত্ব বা প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই। দয়াতেই মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য্য,পরোপকার-ব্রত পালনেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। কেননা, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলেই ত আপন লইয়া ব্যস্ত। পরের দিকে কে চায়! পরের জন্য কে ভাবে? দরিদ্রের দুঃখ স্মরণে দয়ালু ব্যক্তির চক্ষের এক বিন্দু জলে যে সৌন্দর্য্য লিপিবদ্ধ, জগতের কোটী কোটী জ্ঞান বিজ্ঞান বা ধন-গৌরবে সে সৌন্দর্য্য মিলে না। পৃথিবীতে এমন জিনিস নাই, যার সহিত এই অমূল্য সৌন্দর্য্যের তুলনা হয়। এ এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যপূর্ণ মহাকাব্য। মানুষ কেবল নিজের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। মানুষের হাত, পা, প্রভৃতি শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কেবল নিজের জীবন ধারণের জন্য নয়। একথা প্রমাণের জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই। শিশুর জন্য জননীর জীবন ধারণ, একথা কেনা স্বীকার করিবেন? শিশুকে বিধাতা এমনই অসহায় করিয়া সৃজন করিয়াছেন যে, অন্যের সহায়তা ভিন্ন তাহার জীবন ধারণের আর উপায় নাই। ঠিক এই রূপ, এক পরিবারের প্রত্যেকের সাহায্য প্রত্যেকের প্রয়োজন।

ঠিক এইরূপ, এক সমাজের প্রত্যেকের সাহায্য প্রত্যেকের প্রয়োজন। আমি, তুমি, সে, প্রত্যেকের নিকটই প্রত্যেকের উপকারের উপযোগী কিছু আছে। নিজের ব্যবহারের উদ্বর্ত্ত শক্তি, জ্ঞান,—বিদ্যা বুদ্ধি, ধন জন, সব অন্যের রক্ষার জন্য। যে ব্যক্তি সকলের অপেক্ষা জ্ঞানী, সকলে তাহার নিকট জ্ঞানের কথা শুনিতে ধাবিত হইবেই হইবে। যে সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমান, সঙ্কটের দিনে বা বিপদের মুহূর্ত্তে তাঁর পরামর্শ লইতে সকলে ছুটিবেই ছুটিবে। যে গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান, বাড়ীতে দস্যু পড়িলে তাহাকে ডাকিতে লোক যাইবেই যাইবে। আর যে ব্যক্তি ধনী, দারিদ্র্য-পীড়নে মুহ্যমান হইয়া দীন দুঃখী ঊর্দ্ধতুখী হইয়া তার দ্বারস্থ হইবেই হইবে। প্রকৃতির নিয়মই যেন এইরূপ, অতিরিক্ত জিনিস অন্যকে বিতরণ করিতেই হইবে। এইরূপ সাহায্যের আদান প্রদান যদি না চলিত, পরিবার-বন্ধন, সমাজ-বন্ধন, রাজ্য-বন্ধন টিকিত না, সব উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইত। পরিবারের, সমাজের বা দেশের সকলই সমান হইবে, কখনও আশা করা যায় না। ছোট বড়, জ্ঞানি মূর্খ, ধনী নির্ধন, দুর্ব্বল সবল, প্রকৃতির নিয়ম। সুতরাং পরস্পরের সাহায্যের আদান প্রদানও প্রকৃতির নিয়ম। পরস্পরের সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই অনেক কষ্ট, অনেক লাঞ্ছনা উপভোগ করিয়াও, লোক একান্নবর্ত্তী পরিবারের আশ্রয়ে, এক সমাজের ছায়ায়, এক রাজার অধীনে অম্লান বদনে বাস করে। তুমি মধ্য হইতে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার যে নিন্দা রটনা করিতেছ, তুমি এ সকল কথা একবার ভাবিয়া দেখিবে না কেন, বলত ?

এই যে পরস্পরের সাহায্যরূপ মহাব্রতের কথা বলিতেছি, একান্ন-বর্ত্তী পরিবারে ইহা যেরূপ সুন্দররূপ উদ্যাপন করা যায়, এমন আর কোথাও না। নিত্য-প্রত্যক্ষ ঘটনার বা অবস্থার ভিতর না থাকিলে, এ সকল হৃদয়ের প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না। একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকিলে একটী আম দশটী ছেলেকে সমান ভাগ করিয়া খাইতে হয়। দশজনকে একরূপ বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। এক ভ্রাতার খুব টাকা আছে, আর এক ভ্রাতা দরিদ্র। আহারের সময় উভয়কে একরূপ আহার করিতে হয়। সুখের সময় একরূপ সুখ, দুঃখের সময় একরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দশজন মিলিয়া একটা কিছু আহার বা উপভোগ করিলে যে সুখ, একাকী আহার করিলে বা উপভোগ করিলে কি তেমন সুখ পাওয়া যায় ?

নিবৃত্তির পথ প্রবৃত্তি বা আসক্তির পথ হইতে সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ; সহস্রাংশে অধিক সুখপ্রদ। অন্যের জন্য স্বার্থসুখ-বলিদান-ব্রত হিন্দু পরিবারে যেরূপ শিক্ষা হয়, এরূপ আর কোথায় হয়? কিন্তু আজ কাল নানা কলহ বিবাদের কথা শুনা যায়। সে সকল পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই কুফল নিবারণের চেষ্টা না করিয়া, নিঃস্বার্থ-ব্রত পালনের বা নিবৃত্তি-মার্গ শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র একান্নবর্ত্তী পরিবারকে ছিন্ন ভিন্ন করিও না। একতার মূল কোথায় নিবদ্ধ, তাহা কি একবারও ভাবিয়া দেখিবে না?

একতার মূল, এক কথায় বলিতে গেলে, পরস্পরের সাহায্যে, অথবা পরোপকার ব্রতের মূল প্রেমে নিবদ্ধ। আমি তোমার কাছে কিছু না পাইলে কেন তোমার নিকট যাইব, বলত? তুমি কৃপণতার ব্রত বা অহঙ্কারের ব্রত উদ্যাপন করিতে বসিয়াছ, আমি তোমার সহিত কেন মিলিতে যাইব বলত? কিছু না পাইলে, কে কার কাছে যায়? হয় একটু মিষ্টকথা বল, নয় হাত দিয়া দুটি পয়সা তুলিয়া দেও, নয় রোগের সময় ধারে বসিয়া একটু শুশ্রূষা কর, নয় বিপদের দিনে একটু সান্ত্বনা বাক্য শুনাও;—নয় তোমার মধুর ভক্তিমাথা-রূপ দেখাইয়া আমাকে অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম জগতে লইয়া যাও। এ সকল কিছু করিবে না, অথচ আমি তোমার ধারে যাইব, এ কিরূপ আশা বলত? বক্তৃতায় কখনও একতা হয় না। একটু মধুর ভালবাসা, একটু সাহায্য, একটু মধুর ব্যবহার, একতার জন্য বড়ই প্রয়োজন। একটু ভালবাসা, একটু মধুর ব্যবহারের জন্যই এক পরিবারে বা এক সমাজে লোক থাকে। দেখ সেখানে কত ঝগড়া, কত বিবাদ, তবুও অন্যত্র যায় না। কেননা, অন্যত্র এমন মধুর সাহায্য মিলে না। আর যারা সাধের পরিবার ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়, তাদের দুর্দ্দশার একশেষ!! রোগের দিনে একটু সেবার লোক নাই, বিপদের দিনে একটু আশ্রয় মিলে না, শোকের দিনে একটু সান্ত্বনা পাওয়া যায় না! ভালবাসা দেও, আমি তোমার গোলাম হইব; না দেও—ঐ দূরের রাজ্যে—ঐ বিচ্ছেদের বিপণিতে চলিয়া যাও;—একতা থাকিবে না, একতা সম্ভবিবে না! আত্মীয়তাও ভাঙ্গিয়া যাইবে। একতা-শিক্ষার প্রধান কথা যে প্রেম, তাহা লোক আজ কাল ভুলিয়া যাইতেছে। প্রেম-ব্রতও যাহা, পরোপকার-ব্রতও তাহা। কিন্তু এ ব্রত এখন বক্তৃতার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ যে

কেবল নিজের সুখের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, ইহা ভুলিয়া যাইতেছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে তাই গরল উঠিতেছে। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, পিতা পুত্রে বিচ্ছেদ, বন্ধু বন্ধুতে বিচ্ছেদ। এখন লোক অসার বক্তৃতায় হৃদয়ের সকল ভাব শেষ করিয়া ফেলিতে চায়! পরোপকার তোমার দ্বারা করাইয়া লইব, নিজে কিন্তু দূরে দূরে থাকিব! "তোমরা দেও, দেও, কর কর"—এখনকার কথা এইরূপ, কিন্তু নিজে কিছুই করিব না। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান বক্তা মহাশয়েরা কথার ঢেউ তুলিয়া দেশ ভাসাইতেছেন; কিন্তু দুটী পয়সা চাও, পাইবে না; চক্ষের জলে পা ভিজাও, কিছুতেই দয়া হইবে না, তখন মাথা চুলকানি আরম্ভ হইবে। ভিক্ষুককে দান করা তাঁহাদের নিকট গর্হিত কার্য্য,—দরিদ্রকে সাহায্য করিলে তাঁহারা মনে করেন, পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কেহ কেহ এমনও আছেন, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যাঁহারা বলেন, "বিধাতা যাহাকে মারিতেছেন, আমরা তাহাকে সাহায্য করিয়া তুলিব কেন?" কি ঘৃণিত কথা! বিধাতা ত শিশুকে অসহায় করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন; তবে কি জননীর পক্ষে শিশুকে পালন করায় অধর্ম্ম হইবে? এই বিস্তৃত পৃথিবীতে কে শিশুকে পালন না করিয়া পারে? কেই বা এমন কথা বলিতে সাহসী হইবে? রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য—এ সকল যে বৃত্তি প্রবৃত্তি পরিচালনার সহায়তার জন্য, বা নিঃস্বার্থ-ব্রত শিক্ষার জন্য সৃষ্ট নয়, একথা কে বলিতে পারে? বিধাতা একজনকে তোমার দ্বারস্থ করিয়াছেন। দেখ, ইহাতে তোমারও উপকার, ভিক্ষুকেরও উপকার। তুমি তোমার দয়া বৃত্তি পরিচালনার স্থল পাইলে, আর দরিদ্র তোমার সাহায্যে উপকৃত হইল। সেই দরিদ্র হয়ত সময়ান্তরে আবার ধনী হইতেছে, তুমি হয়ত সময়ে আবার তাহার দ্বারস্থ হইতেছ। পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্ত্তন নিয়ত হইতেছে। এক সময়ে রাজা পথের ভিখারী হইতেছেন, অন্য সময়ে পথের ভিখারী রাজাধিরাজ হইতেছেন। এরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি বিধাতার লীলা বই আর কিছুই নয়। প্রকৃত দরিদ্রকে সাহায্য করা যে পাপ কার্য্য মনে করে, তার ন্যায় নরাধম ভূমণ্ডলে আর নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন পরস্পরের জীবন ধারণ বা উন্নতি লাভ করা অসম্ভব। কে কাহাকে অধিক সাহায্য করে, সে বিচার করা বড়ই কঠিন। প্রজা, রাজার সাহায্য করিতেছে; রাজা প্রজার

সাহায্য করিতেছেন। তুমি বল, ইহার মধ্যে রাজাই জগতের অধিক উপকার করিতেছেন, রাজাই সকলের বড়, সকলেই কেন রাজা হইল না? এ কথার উত্তর এই, প্রকৃতির সকল একরূপ বা এক অবস্থাপন্ন হইলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য থাকে না, একতা সংঘটনের সোজা পথ থাকে না,—আদান প্রদান চলে না। তাই কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ বড়, কেহ ছোট। কিন্তু রাজাও সাহায্যের হিসাবে যেমন উপকারী, প্রজাও তেমনই উপকারী। উভয়েরই বিশেষ বিশেষ কার্য্য আছে, সুতরাং উভয়েরই প্রয়োজন। আবার দেখ, একাবস্থা মানুষের চিরকাল থাকেনা, ধনের ও শক্তির সমবিভাগ (Distribution of wealth and power.) এ পৃথিবীতে অপরিহার্য্য ঘটনা। মানুষ প্রতিনিয়ত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। যে শিশু জননীর সাহায্যে মানুষ হয়, সেই শিশুই সময়ান্তরে জননীকে পালন করিতেছে। যে রাজা আজ দরিদ্রের উপকার করিতেছেন, সেই দরিদ্রই কালে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ঐ রাজার উপকার করিতেছে। কেহ কাহারও নিকট ঋণী থাকিবে, ইহা যেন বিধাতার ইচ্ছা নয়। সময়ান্তরে সকলেই সকলের ঋণ পরিশোধ করিতেছে। সমাজের বৈষম্য, বিধাতার লীলা বই আর কি? বিধাতার ইচ্ছাতেই কেহ দাতা, কেহ গ্রহিতা, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ যুবক, কেহ বালক; কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ। বিধাতার ইচ্ছাতেই আবার সময়ান্তরে ধনী দরিদ্র হইয়া, দাতা গ্রহিতা হইয়া, যুবক বৃদ্ধ হইয়া, জ্ঞানী মস্তিষ্কের তেজ-হ্রাসে বিস্মৃতিতে সব জ্ঞান ডুবাইয়া অন্যের সাহায্য লইতেছে। এইরূপ সকল ঘটনায় একের ইচ্ছারই কার্য্য চলিতেছে। বিধাতার ইচ্ছা না বুঝিয়া, যে ব্যক্তি ভাল অবস্থা উপস্থিত হওয়াতে অহঙ্কারী হইয়া কেবল নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা লইয়া মত্ত থাকে, হায়, তার ন্যায় নরাধম এই পৃথিবীতে আর কে আছে? বিধাতা এইরূপ লোকের অহঙ্কারকে সময়ে চূর্ণ করিয়া আপন ইচ্ছার জয়-পতাকা প্রতিনিয়ত উড়াইতেছেন। কিন্তু মানুষের এমনই দুর্ম্মতি, তবুও শিক্ষা হয় না।

তবেই বুঝা যাইতেছে, বিধাতা এক একজনের ভিতর দিয়া এক এক প্রকার শক্তির কার্য্য করাইয়া লইতেছেন। যার প্রতি তাঁর যখন যে আদেশ, তখন অবনত মস্তকে তাহা তাহাকে পালন করিতে হইবে। আদেশ বুঝিব কেমনে? এ একটী প্রশ্ন। আর কোন রূপে না বুঝি, আমার প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি বা অর্থাদি দেখিয়া অবশ্যই বুঝিতে পারি, আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ সকল কেন? জননীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার দেখিয়া যেমন

মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই দুগ্ধ সন্তানের জন্য; সেইরূপ যাহার গৃহে বহু ধনের সমাবেশ, তাহার মনে করিয়া লওয়া উচিত, বিধাতা তাহার ভিতর দিয়া জগতে তার ধন বিতরণ করিবেন। প্রতিভান্বিত লোকের কথাই বল, জ্ঞানীর কথাই বল, রাজার কথাই বল, আর ভক্তের কথাই বল, বিধাতা এক একজন লোকের ভিতর দিয়া এক একটা জিনিস জগতকে দিতেছেন, বা দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; ইহা ভিন্ন আর কি বুঝিবে? আমার মাসে দশটী টাকা হইলেই চলে, কিন্তু দেখিতেছি, আমার ঘরে মাসে দশ সহস্র টাকা আসিতেছে। টাকার কাজ বা আবশ্যকতা কি কেবল বাক্সে রাখা? টাকা যখন আসিতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে,—দানের জন্য, অন্যের সেবার জন্য আসিতেছে। বিদ্যা যখন উপার্জ্জিত হইতেছে, তখন মনে করিতে হইবে, ইহার দ্বারা অনেকের অবিদ্যার অন্ধকার দূর করিতে হইবে। এইরূপ যখন যে অতিরিক্ত শক্তির উদয় হইবে, তখনই মনে করিতে হইবে, এই শক্তির অবশ্য কোন সৎব্যবহার, অবশ্য কোনরূপ প্রয়োজন আছে। ইহাই বিধাতার ইঙ্গিত, ইহাই আদেশ। এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, যাহারা দান-কুণ্ঠ হয়, শক্তির সৎব্যবহার করে না, পরের উপকারের কথা ভাবে না, বিধাতা তাহাদের শক্তি সময়ে অপহরণ করিয়া সুবিচার করেন। বিদ্যাদানে বিদ্যা বৃদ্ধি হয়, এটী পুরাতন কথা। শারীরিক শক্তির পরিচালনায় শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য;—দানে ধন বৃদ্ধি হয়, ইহা ধর্ম্ম জগতের অভ্রান্ত সত্য। শক্তি পাইয়াও, ধন পাইয়াও যে তাহার সৎ ব্যবহার করে না, তাহার সে শক্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস হয়, সে ধন ঐশ্বর্য্য অপহৃত হয়;—ক্রমে সে শক্তিহীন, ধনহীন হইয়া দরিদ্র দশায় উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য, বিধাতা কাহাকেও শক্তি দেন নাই। শক্তি ব্যবহার ভিন্ন স্থায়ী হয় না। শক্তির কার্য্যক্ষেত্র বা ব্যবহারক্ষেত্র, এই জগত। এই ব্যবহার ক্ষেত্রে, শক্তি পাইয়াও, যে তাহার ব্যবহার করে না, সে শক্তিহীন হইবে না কেন, বলত?

তবেই বুঝা যাইতেছে, বিধাতার আদেশ বুঝিয়াই পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা যশের জন্য, সম্মান বৃদ্ধির জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাহাদের নাম আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে অনিচ্ছুক। প্রাণের টানে বিধাতার আদেশে, যে ব্যক্তি একটী লোকেরও উপকার করে না, অন্যকে একটী পয়সাও দেয় না,

সে মানবাকারে পশু। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা প্রত্যুপকার পাইবার আশা রাখিয়া পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করেন। ইহারাও ঘৃণিত। যে কোনরূপ স্বার্থ সাধনের জন্য পরের উপকার করে, তার পরোপকারের কোনই সার্থকতা হয় না। কি পাইব, কি লাভ হইবে, কিছুই জানিনা ;—বিধাতা দিয়াছেন, বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারি না ;—অন্যের অভাব দেখিলে প্রাণ অস্থির হয়, থাকিতে পারি না, তাই ছুটিয়া যাই,—এইরূপ প্রাণের টানে যে অন্যের উপকার করে, তাঁর কাজেরই মূল্য আছে। তাঁর পরোপকারের কথা কোন সংবাদ পত্রে উঠে না,—কোন খাতায় লেখা থাকে না। দক্ষিণ হস্তে যে কাজ করিতেছে, বাম হস্তও তাহা জানে না। সে ক্রমাগত পরের জন্য খাটিতেছে, পরের জন্য খাটিতে খাটিতে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে, সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছে, তবুও বিরাম নাই। যে আসিতেছে, সেই কিছু পাইতেছে ; কেহই বিমুখ হইতেছে না। বিধাতার ধন ধান্য-পূর্ণ পৃথিবীতে এইরূপ ব্রতধারী ব্যক্তিগণের সাহায্যে পৃথিবীর দুঃখী দরিদ্র সময়ে আবার ধনী হইতেছে। তাহারা আবার পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিতেছে। লোক-চক্র অবস্থান্তর প্রাপ্তির সহিত এইরূপ ক্রমাগত ঘুরিতেছে।

ফরাসী দেশে ধন-বিভাগের সমতা-বিধানের জন্য এক সময়ে এক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সকলের উপার্জ্জিত ধন এক স্থানে থাকিবে ;—কেহই বড় ছোট নয়, সকলই সমান, সকলের উপার্জ্জিত বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার। এই মতের ভিতরে স্বর্গীয় সৌরভ থাকিলেও, বলপূর্ব্বক এ ব্রত পালনে কাহাকেও রত করা যায় না। এই জন্য, এই সম্প্রদায়ের এই সুন্দর মত জীবনের কার্য্য-বিভাগে (practical life) স্থান পায় নাই। তবে মানুষের প্রাণ যখন বিধাতার আদেশ লাভ করে, তখন সাম্যমন্ত্র ভিন্ন সে আর অন্য কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারে না। ভল্টেয়ার বা রুসো, খ্রীষ্ট বা চৈতন্য, ম্যাটসিনি বা গ্যারিবল্‌ডি, এইজন্যই, জগতে সাম্যের জয়-ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, এবং জীবনে সাম্যবাদানুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন ; এবং আপন আপন জীবন তৃণের ন্যায় অন্যের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। "দশজন একত্রে বসিয়া একজন লুচি খায়,আর সকলে মুড়ি মুড়কি দিয়া উদর পূরণ করে, "—এ বৈষম্যবাদ ইঁহাদের জীবনে স্থান পায় নাই। ইঁহাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তি পৃথিবীর চির-পূজ্য। ইঁহারা সঞ্চয় করিতে জানিতেন না,—যাহা পাইতেন, বিধাতার নামে অন্যের উপকারের

জন্য উড়াইয়া দিতেন,—বিধাতার নামে তাঁর পুত্র কন্যাদিগকে বিভাগ করিয়া দিতেন। কাল কি হইবে, কাল কি খাইব, এ চিন্তা তাঁহাদের ছিল না। আজ যিনি দিতেছেন, কালও তিনিই দিবেন। আজ আছে, আজ বিতরণ করিয়া অন্যের অভাব দূর করি, কাল না থাকে ভিক্ষা করিব। তাঁহাদের জীবনে এইরূপ উপদেশ শোভা পাইয়াছে। তাই তাঁহারা শক্তি,—বিদ্যা বুদ্ধি, ধন জন সকলেই অন্যের সেবার জন্য উৎসর্গ করিতেন। সঞ্চয় করার বাসনা বিশ্বাসী বা ভগবদ্ভক্তের মধ্যে শোভা পায়না। তাঁহারা সংসারের অতীত জীব ;—তাঁহারা স্বর্গীয় প্রেমে চির-পূজ্য।

কে দাতা কে বা গ্রহিতা? এ সকলেই বিধাতার লীলা। কিন্তু মানুষ সাধারণত এ সামান্য কথাটী বুঝে না। মানুষ আপনার ভাবেই বিভোর। যে দান করে, এই জন্যই, সে উপকৃত ব্যক্তির নিকট পুনঃ উপকার পাইবার প্রত্যাশা রাখে। আবার অন্য দিকে, যে উপকার গ্রহণ করে, সেও উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না;—স্বাধীন জীব বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সে জানে না, সে বুঝে না যে, বিধাতা এইরূপ তাঁহাকে অন্যের দ্বারস্থ করিয়া অধীনতা শিক্ষা দিতেছেন, মস্তক নত করিতে উপদেশ দিতেছেন। শিশু স্বাধীন, যে বলে, সে ঘোরতর মূর্খ। শিশু মায়ের অধীন। মা কে? না—জগজ্জননীর আদেশ-প্রসূত দয়ারূপিনী শক্তি বিশেষ। এই শক্তির নিকট অবনত মস্তকে শিশু প্রণিপাত করিবে না? ইহাতে তাহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে? আজ কাল লোকেরা নাকি পরিবার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্যত্র যাইয়া একতা সংস্থাপনে যত্নবান, তাই এ সকল ঘৃণিত কথা শুনিতে পাই। আর্য্যভূমিতে জনক জননীর পূজা চিরকাল দেবারাধনার সমতুল্য। যে উপকার করে, যে দাতা, যে বিপদে সাহায্য করে, তাঁর ভিতরেও বিধাতার ইচ্ছাপ্রসূত কৃপাশক্তি অবতীর্ণ, সে জনক জননী অপেক্ষাও পূজনীয়। সাহায্য-প্রার্থীর উচিত, কৃতজ্ঞতাবনত মস্তকে চিরকাল উপকারী বন্ধুর চরণ চক্ষের জলে সিক্ত করে, এবং ইহাতে বিধাতার কৃপা অনুভব করে। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন লোক স্বাধীন! এখন স্বাধীন (?) লোক ভিক্ষা চাহিবে, তাহাও উন্নত মস্তকে, স্ফীত বক্ষে। বিপদের দিনে, লোক ভিক্ষারূপ সাহায্য পাইল, আর সম্বন্ধ নাই; অসাক্ষাতে এমন উপকারী বন্ধু বা দাতার নিন্দা পর্য্যন্ত রটনা করিয়া রসনাকে কলুষিত করে! জনক জননী রিপু চরিতার্থের জন্য জন্ম দিয়াছেন, এই কথা যাহারা

.. বলে, তাহারা উপকারী বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞ হইবে, ইহা কখন আশা করা যায় না। বাস্তবিক এখন এমন দিন উপস্থিত হইয়াছে, শত শতরূপ উপকার পাইয়াও এখন আর লোক অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। বিধাতা যাহাকে অবনত হইতে আদেশ করিয়াছেন, সেও অবনত হইবে না! বিধাতার শিক্ষাকে এইরূপে নানা মতে লোক উপেক্ষা করিতেছে। অন্যদিকে যাহারা পরোপকার করে, তাহাদের মধ্যে আরো ভয়ানক অহং-সর্ব্বস্ব জ্ঞানমূলক অহঙ্কার উপস্থিত হইয়া ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিতেছে। তাহারা জানে না যে, তাহাদের কিছুই শক্তি নাই, তাহারা কিছুই নয়, বিধাতার ইচ্ছাতেই ঐরূপ বিধান হইয়াছে। বিধাতার ইঙ্গিত বা ইচ্ছা বুঝিয়া যে কাজ করিতে না পারে, সে কখন নিঃস্বার্থ হইতে পারে না। এই জন্য নিঃস্বার্থ ভাব অতি অল্পস্থানে দেখা যায়। এই জন্যই বুঝি বা দাতাদের দানের তালিকা সংবাদ পত্রে প্রশংসার সহিত বিঘোষিত হইবার প্রথা দেখা যাইতেছে; এবং উপকৃত ব্যক্তিদের মুখে দাতাদের নিন্দা রটনার প্রথা শোভা পাইতেছে। আমি কে, আমি যে কিছুই নই, আমি যে কিছুই উপকার করিতে পারি না, হরির জিনিস হরিই দিতেছেন, এ ভাব প্রাণে উদিত না হইলে উপকারের স্বার্থকতা জন্মে না। দর্পহারী হরি কত জনের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দাতার অহঙ্কার করিতে নাই। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে ইহাই বুঝা যাইবে, যে দান করে, যে পরের উপকার করে, সে বিধাতার ছায়া মাত্র; বিধাতার কার্য্য করিবার অবলম্বন মাত্র। আর যে গ্রহণ করে, সে বিধাতার ইচ্ছা শক্তির অধীনতা স্বীকার করিবার পাত্র মাত্র। হরির রাজ্যে হরির লীলা বই আর কি আছে বলত?

আর্য্য-ইতিহাসে পরোপকার-ব্রত-ধারীর যে সকল আশ্চর্য্য ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে, এমন বুঝি বা আর কোন দেশে নাই। শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখ, কি সুন্দর উপদেশ—"দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চযঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন সজীবতী।" মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায়, ৭২ শ্লোক।

অর্থ—"যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা এই পাঁচকে অন্নদান না করে, সে শ্বাস-প্রশ্বাস-বিশিষ্ট হইলেও, মৃতবৎ জানিবে।" তার পর মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৮১ শ্লোকে আরও সুন্দর উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। তারপর দাতাকর্ণের

কথাই বল, রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথাই বল, আর বিল্বমঙ্গল উপাখ্যানের বণিক-আশ্রমের কথার ন্যায় পরোপকার-ব্রতাশ্রমের আশ্চর্য্য বর্ণনাই পাঠ কর, এ সকলের সমতুল্য ঘটনা আর কোথাও ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। যে বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া এই মহৎ ব্রত গ্রহণ করে, তাঁর আর কি অদেয় থাকে? রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্ম্মের নিকট আবদ্ধ, দেখ, তিনি রাজ্য ধন, স্ত্রী পুত্র সব পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে পর্য্যন্ত চণ্ডালের সেবায় উৎসর্গ করিলেন। দাতাকর্ণ আপন পুত্রের মস্তক দিয়া অতিথির মন রাখিলেন। বণিক আপন ভার্য্যার সতীত্বের বিনিময়ে বিল্বমঙ্গলের সেবা করিতে প্রস্তুত হইলেন। গৃহীর পক্ষে ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব বা সাধুতার আর কি দৃষ্টান্ত হইতে পারে? অতিথির মন তুষ্টার্থ হিন্দু-গৃহে এক সময়ে অদেয় কিছুই ছিল না। মনু এই জন্যই গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* কিন্তু যে কারণে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই অতিথি সেবার হীনাবস্থা, পরোপকারব্রতের অপ্রাচুর্য্য দেখিলে কাহার প্রাণে না আঘাত লাগে? ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। অনেক-স্থলে গৃহ বিবাদে পরিবারের বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহ আছে, পরোপকারব্রত নাই,—আহার বিহার আছে, অতিথি সৎকার প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। সুখ স্বচ্ছন্দতা আছে, দানের-প্রথা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এখন লোক পরিবার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহাকে আর কে গৃহস্থাশ্রম বলিবে, বল? এখন আপনা লইয়া আমরা সকলে ব্যস্ত। নিজের সুখই সর্ব্বস্ব। নিজের উন্নতির সহিত দেশের উন্নতির, এবং দেশের উন্নতির সহিত নিজের উন্নতির যে অতি ঘনিষ্ট যোগ বিদ্যমান, তাহা কিছুতেই বুঝিতেছি না। পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উন্নতির পথে এক পা অগ্রসর হইবার যো নাই, ইহা কিছুতেই ধারণা হয় না। এখন আমরা স্বাধীন, সুতরাং আপনা লইয়াই ব্যস্ত! অহো দুর্ভাগ্য, কি বিড়ম্বনা!

---

* যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ।
যস্মাত্ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী।"
মনুসংহিতা, ৩ অধ্যায় ৭৭ ও ৭৮ শ্লোক।

প্রবন্ধের শীর্ষস্থানে দাতার যে দুটি স্বর্গীয় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা এক বার স্মরণ করি। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন সে দাতাকর্ণও নাই, এখন সে হরিশ্চন্দ্রও নাই। এখন আদর্শ দেখিবার জন্যও কত অনুসন্ধান করিতে হয়। এখন সে তারক প্রামাণিকও নাই। শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের এই হতভাগা দেশের প্রধান আদর্শ, দ্বিতীয় আদর্শ মহারাণী স্বর্ণময়ী। এই জন্যই তাঁহাদের কথা ভাবি। আর ঐ যে আগরওয়ালা, ঐ আগরওয়লার ন্যায় শত শত ধনী ব্যক্তি এই কলিকাতা মহানগরীতে আছে, যাহারা দরিদ্রের জন্য একটি পয়সা দিতেও কুণ্ঠিত; কিন্তু রাজা রাজড়ার তোষামোদের জন্য বা মদ বেশ্যা-সেবার জন্য সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিতে পারে। প্রেমিক ভিন্ন কেহ নিঃস্বার্থভাবে দান করিতে পারে না। যাঁহার প্রাণ অন্যের জন্য কাঁদেনা, সে এক পয়সা অন্যের হিতার্থ দান করিতে পারেনা। যাহার প্রাণ অন্যের জন্য অস্থির হয় না, পরোপকারব্রত কি অমূল্য জিনিস, তাহা সে বুঝেনা।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রকৃত প্রেমিকের সংখ্যা এদেশে ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। তাই আজ কাল একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার প্রতিও লোক অপ্রতিবাদে ঘৃণাসূচক শব্দ ব্যবহার করিতেছে। অন্যের সেবার জন্য মানুষের যে জীবন ধারণ, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা ত অতি কঠিন কথা, দূরের কথা; পরস্পরের সাহায্যের জন্য পরস্পরের জীবন, ইহা যে একান্নবর্ত্তী পরিবারে শিক্ষা হইত, সে পরিবার প্রথার মূলে যখন মানুষেরা কুঠারাঘাত করিতেছে, তখন বুঝা যাইতেছে, প্রেম বল, বা ভালবাসা বল, নিঃস্বার্থতা বল, বা ধর্ম্ম বল, সে সকল এখন এদেশে শ্মশানের ভস্মে পরিণত হইয়াছে। এখন এ দেশে একতা সংস্থাপন হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। প্রেম-ব্রত উদ্যাপন ভিন্ন, একতা সম্ভবে না। স্বার্থ চিন্তায় মানুষ দশ দিন মিলিতে পারে, একাদশ দিনে আর পারে না। যাঁহারা আপনার পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নীকে পৃথক করিয়া দেয়, তাহারা সমগ্র দেশের লোকের সহিত মিলিবে, একথা শুনিলে হাসি পায়। এ সকল হুজুগ বই আর কিছুই নয়। এখন কে বা কার পানে তাকায়, কেবা কাকে দেখে! আপনা লইয়াই সকলে ব্যতিব্যস্ত। আয় অল্প, অভাব অধিক বলিয়া যে লোক স্বার্থপর হইতেছে, একথার মধ্যে বিশেষ কোন সত্য নাই। প্রাণের

টান থাকিলে এক বিন্দু চক্ষের জলে যত কাজ করিতে পারে, শত সহস্র ধন-কুবেরও তাহা পারে না। দরিদ্র হাওয়ার্ড, দরিদ্র ম্যাট্‌সিনি, দরিদ্র পার্কার জগতের কি না উপকার করিয়া গিয়াছেন, দেখ। আর অন্নের কথা মুখে আনিয়া আর বৃথা কলঙ্ক বৃদ্ধি করিও না; বল, সেরূপ ইচ্ছা নাই, প্রাণে সেরূপ দয়া নাই, সহৃদয়তা নাই, পরের প্রতি মন নাই, —দেশোন্নতিতে মতি নাই। প্রেমের নামে কলঙ্কও ঢালিবে, আবার মিথ্যা কথাও বলিবে? ছি! জান না কি, একটু হৃদয়, একটু প্রেম, একটু চক্ষের জল জগতের কত কাজ সাধন করিতে পারে? এই পৃথিবীতে সহানুভূতিব্যঞ্জক এক বিন্দু চক্ষের জলের মূল্য নাই। কিন্তু হায়! একটু সহানুভূতি, এক বিন্দু চক্ষের জলও আজ আর দেখি না! শত শত লোক অনাহারে মরুক, কেহ দৃকপাতও করিবে না! দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। দেশে একতা সংস্থাপিত হইবে, সে অতি দূরের কথা, একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে,—লোকেরা নিজেদের স্বার্থ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, স্বেচ্ছাচারিতার দুন্দুভি-নিনাদ ধ্বনিত হইতেছে,—একতা ক্রমেই সুদূর-পরাহত হইয়া পড়িতেছে! তোমরা আশা করিতেছ, দেশে একতা সংস্থাপিত হইবে, কিন্তু আমি দেখিতেছি, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, পিতা পুত্রে পর্য্যন্ত দিন দিন বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। একটু সহানুভূতি যেখানে, একটু দয়া যেখানে, সেখানে মানুষ অবনত-মস্তক। কিন্তু কই, সেইরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিতেও দেখি না, সে সহানুভূতিও পাইনা, সে অমূল্য প্রেম-মূলক দয়ার খোজও মিলে না। পরোপকার-ব্রতটা এখন বক্তৃতার কথা হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেই এই ব্রত গ্রহণ করিতে বলে, কিন্তু কেহই নিজে গ্রহণ করে না। এ দেশের হইল কি, বলত?

সঙ্কীর্ণতা।

"Every experiment, by multitudes or by individuals, that has a sensual and selfish aim, will fail. * * * As long as our civilization is essentially one of property, of fences, of exclusiveness, it will be mocked by delusions. Our riches will leave us sick; there will be bitterness in our laughter; and our wine will burn our mouth. Only that good profits, which we can taste with all doors open, and which serves all men."

EMERSON.

কিয়দ্দিবস হইল আমরা কোন এক বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেখানে বড় ছোট অনেক লোক ছিলেন। কলেজের প্রোফেসর ছিলেন, স্কুলের শিক্ষকও ছিলেন; সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন, স্কুলের ছাত্রও ছিলেন। আহারের সময় কথায় কথায় হঠাৎ একটী গুরুতর প্রশ্ন উঠিল। প্রশ্নটী এই, উকীলের ব্যবসা সৎপথে থাকিয়া চালান যায় কি না? সপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেকে অনেক কথা বলিলেন। সে সকল কথার সহিত অদ্যকার প্রবন্ধের সম্বন্ধ নিতান্ত অল্প। সুতরাং সে সকল ব্যক্ত করার কোন প্রয়োজন নাই। মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, —"কাহাদের কথা লইয়া আপনারা আলোচনা করিতেছেন; ঐ চোরদের কথা?" কথাটী যাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল, তিনি একজন চরিত্রবান ধার্ম্মিক বলিয়া সুখ্যাতি পাইয়াছেন, সুতরাং কথাটী শুনিয়া আমরা একেবারে অবাক হইলাম। তিনি কোন কাগজের সম্পাদক, ব্রাহ্ম-সমাজের একজন বক্তা, এবং কোন স্কুলের শিক্ষক। তাঁহার কথার পর, কেন জানি না, আর বড় কেহ এ সম্বন্ধে কথা বলিলেন না, অনেকেই এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক হইলেন।

অন্য এক দিন কোন একদল লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া স্বর্গীয় মহাত্মা কেশব চন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেছিল। তাঁহাকে নানারূপ গালি-গালাজ দিয়াও যখন ইহাদের মনের ক্ষোভ মিটিল না, তখন ক্রোধান্ধ হইয়া লোকগুলি কেশব বাবুর উদ্দেশে মৃত্তিকায় পদাঘাত করিল। তাঁহার অপরাধ, তাঁহার মতের সহিত ইহাদের মিল নাই। নিকটে দাঁড়াইয়া ঘটনাটী দেখিয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম।

আর একদিন একজন নবীন লেখকের সহিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। নবীন লেখক অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকখানি

বড় বড় পুস্তক লিখিয়াছেন এবং নানা কল কৌশলে তাহা যথেষ্ট বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বড়ই অহঙ্কার বাড়িয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু বাল্য বিবাহের পোষকতা করেন বলিয়া তাঁহার প্রতি তিনি বড়ই ক্রোধান্ধ হইয়াছেন, কথায় কথায় চন্দ্রনাথ বাবুকে "মূর্খ, কিছু জানে না, কিছু বুঝেনা" এইরূপ নানা কথা বলিয়া গালাগালি দিলেন, এবং আপনার পাণ্ডিত্যের যশ ঘোষণা করিলেন।

হঠাৎ আর একদিন একজন চস্‌মাধারী নবীন দার্শনিক পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি ব্রাহ্মসমাজে মাথা তুলিতে কতক সমর্থ হইয়াছেন, এবং আরও তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি কথায় কথায় হিন্দু সমাজের সংবাদ পত্র, হিন্দু সমাজের বক্তা, হিন্দু সমাজের লেখক, হিন্দু সমাজের রঙ্গভূমির অভিনেতা, একে একে হিন্দু সমাজের সকলের প্রতি এত অশ্রাব্য গালাগালি দিলেন যে, শুনিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন কি ভয়ানক অন্যায় কাজ করিয়াছেন, বা তাঁহারা যেন কত নীচে পড়িয়া রহিয়াছেন! শুনিয়া প্রাণটা যেন কেমন হইয়া উঠিল।

এই যে চারিটী গল্পের উল্লেখ করিলাম, ইহা কেবল নমুনা মাত্র। এইরূপ ঘটনা ব্রাহ্মদেশে অহঃরহ ঘটিতেছে।

পথে, ঘাটে, রেলওয়ের গাড়ীতে ও ষ্টিমারে ইহার পালটা জবাবও শুনিয়াছি। তাহা শুনিয়াও কাণে অঙ্গুলি না দিয়া থাকিতে পারি নাই। হিন্দু সমাজের লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে শালা, পাজি বলিয়া পর্য্যন্ত গালিগালাজ দেয়। যেমন ছবি এখানে, তেমনি ছবি ওখানে। মতে না মিলিলেই নিন্দা রটনা, গালাগালির স্রোত চলিতে থাকে! ব্যক্তিত্ব বা স্বার্থচিন্তা লইয়াই যেন মানুষ দিবানিশি ব্যস্ত! বর্ত্তমান সময়ে দেশে কি এক শোচনীয় সঙ্কীর্ণতার স্রোত চলিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। বলত, দেশের হইল কি ?

জাতীয় মহাসমিতির বাজারে খুব ধুম ধাম পড়িয়া গিয়াছে। এবিষয়, সে বিষয়, কত বিষয়ের জন্য আবেদন করিবার কথাই উঠিতেছে। কিন্তু মধ্য থেকে এ কি এক অভিনব হিন্দু মুসলমানের বিবাদ বাধিয়া গেল! হিন্দু এখন মুসলমানকে গালি দেয়, মুসলমান হিন্দুকে পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক গালি দেয়। সাহেব ও ভারতবাসীর সহিত মনোবাদ ত বরাবরই চলিতেছে। কোথায় জাতীয় মিলন হইবে, না দিন দিন দেখিতেছি, ক্রমে

ক্রমেই বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। চাপাচাপি করিয়া আর কতদিন ভিতরের অবস্থা ঢাকা থাকিবে? যার মন যেমন সঙ্কীর্ণ, তার তেমনি স্বভাব। যার যেমন স্বভাব, তার কাজও তেমনি। ভারতবর্ষের এই শুভ মিলনের দিনেও কত কলঙ্কময় চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছে। কি দুঃখের বিষয়! স্বার্থ না থাকিলে এরূপ কেন হয়, বুঝি না। ঘটনা পরম্পরায় বুঝা যাইতেছে, এদেশের অধিকাংশ লোক কেবল স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত!!

খুব অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, কেবল স্বার্থের জন্যই শিক্ষক উকীলকে, উকীল ডাক্তারকে, ডাক্তার শিক্ষক ও উকীলকে, গৃহী সন্ন্যাসীকে, সন্ন্যাসী গৃহীকে, লেখক বক্তাকে, বক্তা লেখককে, হিন্দু ব্রাহ্মকে, ব্রাহ্ম হিন্দুকে গালি দেয়। দেখিয়াছি, যে ব্যক্তি যে ব্যবসা করে, সে তাহার গৌরব বাড়ানের জন্য অন্যের কাজকে নিন্দা করে, তাহার কাজ ব্যতীত আর সব কাজই যেন অপদার্থ। ব্যবসা ছাড়া মানুষের মতামতে আরো বিবাদ বাধে। একজনের মতে আর একজনের মত না মিলিলে আর রক্ষা নাই; যা মুখে আসে, তাই বলিয়া গালাগালি দেয়। পারিলে প্রহার করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত। অন্যান্য সমাজের লোকদিগের দোষ তত ধরি না; তাঁহাদিগকে সংস্কার করিতে যাঁহাদের উৎপত্তি, তাঁহাদের মধ্যে দলাদলির ভাব, নিন্দা-রটনার ভাব, সাম্প্রদায়িকতা. সঙ্কীর্ণতা, হিংসা দ্বেষ, চরিত্রহীনতা দেখিলে আর প্রাণে সহ্য হয় না। যে রাত্রি শিক্ষক-সম্পাদকের মুখে "উকিলদিগকে চোর" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে শুনিলাম, সে রাত্রি আর চোখে ঘুম বসিল না। কি অনুদার কথা!—কি অসত্য কথা! সব উকিলই চোর? একটী উকিলও ভাল নাই? ছি, একি জঘন্য কথা! এই রূপ যখন এক দলের লোককে যোট বাঁধিয়া অন্য দলের লোকদিগকে আক্রমণ করিতে বা গালাগালি দিতে শুনি, তখনই প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের লোকের মুখে যখন হিংসা বিদ্বেষের কথা বা অহঙ্কার-প্রসূত গালাগালির কথা শুনি, প্রাণ তখন একবারে নিরাশ হয়। মনে বলি, হা বিধাতা, যাঁহারা তোমার নামকে গৌরবান্বিত করিবে, তাঁহারা তোমার সন্তানদিগকে আদর করিতে পারিতেছেন না, এ কি দুঃখের কথা!

পৃথিবীর কোন্ কাজ দোষের এবং কোন্ কাজটী দোষের নয়, বলত? পৃথিবীর কোন্ মত দোষের, কোন্ মতটী দোষের নয় বলত? যে কাজ এক জনের হৃদয় ভূষণ, সেই কাজ অপরের অস্পৃশ্য। যে মত এক জনের

প্রাণের আরাম, সেই মতই অপরের ঘৃণার জিনিষ হওয়া বিচিত্র নয়। এ সকল পৃথিবীর প্রত্যাহিক ব্যাপার। এক জনের ধর্ম্ম অপরের নিকট অধর্ম্ম। একের অধর্ম্ম, অপরের ধর্ম্ম। সুতরাং যে অন্যের মত বা কাজকে ঘৃণা করে, তাঁহার মনে ধারণা থাকা একান্ত উচিত যে, তাঁহার মত বা কাজও অন্যের ঘৃণা উৎপাদন করিতেছে। আমি যে মুহূর্ত্তে তোমাকে মূর্খ বলিয়া গালি দিতেছি, তুমিও ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমাকে মূর্খ বলিয়া যে গালী দিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি! পৃথিবীর গতি এই ;—"নিন্দায় নিন্দা, প্রহারে প্রহার।" যে অন্যের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, সেও অন্যের নিকট তেমন ব্যবহার পায়। এই জন্য কোন মহাত্মা বলিয়াছেন, "অন্যের প্রতি ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করিলে, অন্যের প্রতি ভাল ব্যবহার কর।" এই উপদেশ জানিয়াও মানুষ অন্যের নিন্দা প্রচারে বা অন্যকে ঘৃণা করিতে ছাড়ে না। মানুষের এরূপ সঙ্কীর্ণতার একমাত্র কারণ, স্বার্থ। স্বার্থচিন্তা হইতে ইহা উদ্ভূত। স্বার্থ-চিন্তা বা আপন গরিমা না ডুবিলে কিছুতেই পরের চিন্তা, পরের ভাল হৃদয় সহ্য করিতে পারে না। হায়, মানুষের কি সঙ্কীর্ণতা, মানুষের কি মূর্খতা!!

কাহার মত সত্য, কাহার মত অসত্য, একথা কি ঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারে? না—তা পারে না। আমার নিকট আমার মতই সত্য, তোমার নিকট তোমারটীই সত্য। তোমার মত যে তোমার নিকট সত্য নয়, একথা ভাবিবার আমার কি অধিকার? আমার বিচার শক্তি তোমারটীর বিচারক হইতে পারে না। কারণ, তুমি ও আমি ত আর এক নই। তোমার ও আমার দৈহিক ও মানসিক গঠনে কত আকাশ পাতাল প্রভেদ। সুতরাং তোমার মত ও আমার মতে ত আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিবেই, তাহাতে আশ্চর্য্য হও কেন?—আমিই বা হই কেন? বিধাতা পৃথিবীর কোন দুটী বস্তুকে একরূপ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই যখন, তখন কেমনে আশা করিব যে, তোমার মতটী ও আমার মতটী ঠিক এক রূপ হইবে? ভাবিয়া দেখ, তাহা হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। অনন্ত মানুষের অনন্ত মত। অনন্ত মানুষের অনন্ত সত্য। অনন্ত মানুষের অনন্ত কার্য্য। কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। প্রকৃতি, বৈচিত্র্য পূর্ণ। এই বৈষম্যময় জগতে যে ব্যক্তি বিশ্ব-পতির ঘনীভূত অস্তিত্ব সকল বস্তুতে দেখে, নিজের স্বার্থ বা অহং চিন্তা বিস্মৃত হয়, সে কাহাকেও অনাদর বা ঘৃণা করিতে পারে না। বৈচিত্র্য,

বৈষম্য, স্বাতন্ত্র্য—সৃষ্টির নিয়ম ; অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ করিলে চলিবে কেন ? বিধাতার লীলা উল্টাইবে, মানুষ তোমার সাধ্য কি ? তাহা পার না ; —পার, কেবল নিজেরা খাওয়া-খাওয়ি ও মারা-মারি করিয়া মরিতে ;— ঝগড়া বিবাদ দ্বারা পৃথিবীর শান্তিকে বিনাশ করিতে ! ছি, ইহাও কি প্রশংসা পাইবার যোগ্য ? মানুষ, কুকুরের স্বভাব কিছুতেই ভুলিতে পারিল না !

বিধাতা যাকে যেটী দেন, তার পক্ষে সেইটীকেই আদর করা যেমন উচিত, অন্যেরটীকে ঘৃণা করাও তেমনি অনুচিত। আমার ছেলেটীকে আমি আদর করিব, যত্ন করিব বটে, কিন্তু তোমার ছেলেটীকে ঘৃণা করা আমার পক্ষে নিতান্তই অনুচিত। আমারটী যেমন আমার, সেটীও ত তেমন তোমার। আমারটীকে যিনি আমার কোলে দিয়াছেন, তোমারটীকেও ত তিনি তোমার কোলে দিয়াছেন। এ সকল ত একেরই লীলা। তোমাকে যিনি লেখক করিয়াছেন, বা বক্তা করিয়াছেন, বা ধনী করিয়াছেন বা বিদ্বান করিয়াছেন, তিনিই ত আর একজনকে ডাক্তার বা উকীল বা নির্ধন বা মূর্খ করিয়াছেন। মানুষ নিজে কি কিছু ভাল কাজ করিতে পারে ? এক মুহূর্ত্তও মানুষ তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন জীবন ধারণ বা কোন রূপ সৎকার্য্য করিতে পারেনা। কে শ্রেষ্ঠ, কে বড়, সে বিচার তিনি ভিন্ন আর কে করিতে পারে ? দরিদ্রকে ধন না দিয়াও তিনি বড় করিতে পারেন, মূর্খকে জ্ঞান না দিয়াও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিতে পারেন ;—মানুষ একথা বিশ্বাস কর। খ্রীষ্ট নির্ধন ও মূর্খ ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজার রাজা। যে ভাবিতে শিখিয়াছে, যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াছে, যে আপনার ক্ষুদ্রত্ব এবং তাঁর মহত্ত্ব বুঝিয়াছে, সে অন্যকে ঘৃণা করিবে, নিন্দা করিবে, এ কথা শুনিলে লজ্জায় মরি। ব্যবসা-দারীর কথা, সংসারী লোকের কথা দূর হউক, এখনকার দিনে শুনি যে, যে বড় ধার্ম্মিক, সে নাকি বড় নিন্দুক, সে নাকি খুব অন্য ধর্ম্মের বিদ্বেষী ! কি সর্ব্বনেশে কথা ! এখনকার দিনে শুনিতে পাই, যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে গালি না দেয়, বিদ্বেষ চক্ষে না দেখে, সে নাকি সে ধর্ম্মে বিশ্বাসীই নয়। সেই জন্যই নাকি ব্রাহ্ম হিন্দুকে, হিন্দু ব্রাহ্মকে, খ্রীষ্টান হিন্দু ও মুসলমানকে, —পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষচক্ষে দেখে এবং গালাগালি দেয়। সে সকল জঘন্য কথা শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালাপালা হইয়া উঠিতেছে, সংসারটাকে বড়ই তিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। বক্তৃতায় গালাগালি, কাগজে গালাগালি ; মানুষ, মানুষের রক্তপান করিতে সদা উল্লসিত, লালায়িত। এক

ভাই অন্য ভাইকে অপদস্থ করিতে প্রফুল্লিত!! হা ধর্ম্ম, হা সত্য, হা ঈশ্বর, তুমি তোমার সৃষ্টি ছাড়িয়া আজ কোথায়?

জাতীয় মহাসমিতি যখন ভারতে একতার বিজয় ভেরী বাজাইয়া দিক্ কাঁপাইতেছেন, সেই সময়েই আমরা এই দুঃখের অবস্থা জগতে ঘোষণা করিতেছি। কবির কল্পনায় যে একতা, সে একতা, ভারতে অসম্ভব নয়। অহিফেন-সেবীর ক্ষণ-জাগরিত স্বপ্নে জাতীয় মিলন অসম্ভব নয়; কিন্তু এই স্বার্থপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, এই বিদ্বেষবুদ্ধি, এই হিংসা ও অহংজ্ঞান-সর্ব্বস্ব-ভাব ভারতের নর নারীর অস্থি মজ্জায় যত দিন অনুপ্রবিষ্ট, ততদিন একতা যে সুদূর-পরাহত, একথা আমরা বলিবই বলিব। যার ঘরে একতা নাই কেবল স্বার্থের তাড়নায়, যার দেশে একতা নাই কেবল অহংপূজার ধূমে, সে বাহিরে, সে বিদেশে যাইয়া মায়া-জাল বিস্তার করিয়া মানুষের মন ভুলাইয়া একতাসূত্রে বাঁধিতে চায়, একথা শুনিলেও হাসি পায়। ঐ পবিত্র নীলাকাশের ন্যায় অনন্ত প্রশস্ত, অনন্ত উদার, অনন্ত সহিষ্ণু ও স্বার্থ-শূন্য যতদিন এদেশের নর-নারীর হৃদয় না হইবে,—পবিত্র স্বচ্ছবারির ন্যায় যত দিন মানুষের প্রাণ নির্ম্মল না হইবে—এবং যত দিন বিশ্বজনীন প্রেমের ভাবে, অর্থাৎ সকলের ভিতরে সেই চিৎঘন আনন্দের প্রকাশ দেখিয়া, সকলকে আলিঙ্গন করিতে যতদিন মানুষের প্রাণ আকুলিত না হইবে, ততদিন জাতীয় মিলনের কথা বাতুলের কথা,—ততদিন একতা বিস্মৃতি-অবগুণ্ঠনে ঢাকা। কেবল বক্তৃতায় দেশ উদ্ধার হয় না, শুধু বক্তৃতায় মিলন হয় না;—প্রেম চাই, আপনাকে বিসর্জ্জন দেওয়া চাই, গভীর ভালবাসা চাই। বক্তৃতায় সদাব্রতের কথা বলিয়া গগণ ফাটাও, আর পিতা মাতা প্রভৃতি ঘরের লোকে টাকা চাহিলে জুতা দ্বারা প্রহার করা, ভণ্ডহিতৈষি, তোমার লজ্জা হয় না? বাহিরের লোকে চাঁদা স্বাক্ষর না করিলে কত গালাগালি দেও, আর তুমি দেশোদ্ধার-ব্রত-ধারী ব্যক্তি, তুমি তোমার পাওয়ানাদারকে শতবার হাটাইয়াও টাকা দেও না, ইহাতে তোমার একটুও লজ্জা নাই? তুমি ধর্ম্মসংস্কারক, অন্য ধর্ম্মের অপযশ ঘোষণা করিয়া রসনাকে কলুষিত করিতেছ, তুমি একবারও কি ভাবিবে না, তুমি কি ধাতুতে নির্ম্মিত? ধন গৌরবে উন্মত্ত যুবক, তুমি অন্যকে গালি দিতেছ, এক বারও কি ভাবিবে না, তোমার এ ধন চিরস্থায়ী নয়! কিসের অহঙ্কার কর? কিসের বড়াই কর? অন্তরে প্রবেশ কর, আত্মার মূলে যাও, দেখ, তুমি কি ধাতুতে নির্ম্মিত! অন্যের

দোষ গণিবার তোমার সময় নাই, সতর্ক হও; কারণ তুমি বিষম গরল পান করিয়াছ। প্রেমিক হও, সচ্চরিত্র হও। যাহা সত্য বুঝিয়াছ, নিজে পালন কর। নিজের স্বার্থকে বীরের পরের হিতের জন্য বলি দেও। তবে তোমার দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। নচেৎ তোমার ঐ কপটতা ও ভণ্ডামী-আচ্ছাদিত বক্তৃতা, ঐ লেখা, ঐ গালিগালাজ, নিশ্চয় বলিতেছি, কালের অনন্ত গর্ভে ডুবিয়া যাইবে। উদার হও, প্রেমিক হও, বিনীত হও, জিতেন্দ্রিয় হও, পবিত্র হও, সকলকে আপনার ভাই বলিয়া বুঝিতে শিক্ষা কর,—নচেৎ জাতীয় মিলন তোমার দ্বারা হইবে, কখনও মনে করিও না। তোমার ঐ অহঙ্কার-স্ফীত বক্ষের উপর দিয়া কত শত জাতির পদ-রেণু বহিয়া ও উড়িয়া যাইবে, তবুও মিলন আসিবে না। মিলন স্বর্গের জিনিষ; পবিত্রতা, উদারতা, বিশ্বজনীন প্রেম ভিন্ন তাহা পাওয়া অসম্ভব। স্বার্থ, সঙ্কীর্ণতা ও অহংজ্ঞানকে বলিদান না করিতে পারিলে কাহারও দ্বারা এই পবিত্র কার্য্য সাধিত হইবে না,—হইতে পারে না।

কপটতার ছবি।

বিগত বৎসর মান্দ্রাজে যে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গপ্রদেশ হইতে অনেক প্রতিনিধি গিয়াছিলেন। অধিকাংশ প্রতিনিধিই জাহাজে গিয়াছিলেন। বঙ্গের কোন জেলা হইতে একজন প্রতিনিধি, মান্দ্রাজ হইতে দেশে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, পিতা মাতার একান্ত অনুরোধে, জাতি রক্ষার জন্য, জাহাজে তিনি ফল মূলাহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার কোন সহ-যাত্রীর নিকট শুনিয়াছি, অন্যান্য অনেক যাত্রীর ন্যায় তিনিও মুসলমানের রন্ধনের কুক্কুট্ মাংস প্রভৃতি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়াছিলেন। এটী একটী সামান্য ঘটনা বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে এরূপ ঘটনা অনেক মিলে। এইরূপ সামান্য ঘটনায় মিথ্যা কথা বলিতেও আমরা এত প্রস্তুত! যাঁহারা কৃতবিদ্য, যাঁহারা দেশের প্রতিনিধিত্ব করিতে প্রয়াসী, তাঁহারাও সামান্য কারণে এরূপ

কপটতা ও মিথ্যার প্রশ্রয় দেন, ভাবিলেও কষ্ট হয়! কিন্তু অনুসন্ধান কর, হাজার হাজার এরূপ কপটতার প্রশ্রয়দাতা দেখিতে পাইবে।

কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করিলে লোকেরা মনে করে, ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার হইল। বাস্তবিক তাহা হয় না। সত্য বাহির করিতে হইলে ঘটনার উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। যা বল, যা লেখ, বলিবার বা লিখিবার সময় ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, অবশ্য কোন ঘটনা সম্মুখে আছে। শূন্য লইয়া, কেবল কল্পনা লইয়া মানুষ আজ পর্য্যন্ত সত্য আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ঘটনা বা অবস্থাই সত্য আবিষ্কারের পথ।

যত লোকের সহিত দেখা হয়, তাহাদের ভিতর এবং বাহিরে যেন—আকাশ পাতাল প্রভেদ। নিজের জীবন আলোচনা করিলেও দেখি, অন্যের চরিত্র সমালোচনা করিলেও বুঝি—মানুষ দিবানিশি কি যেন চাপা দিতে ব্যস্ত, কি যেন ঢাকিতে উল্লসিত। ভিতরে হিংসা, বাহিরে প্রেম-বিহ্বলতা; ভিতরে অহঙ্কার, বাহিরে বিনয়-প্রকাশ;—ভিতরে রিপুর উত্তেজনা, বাহিরে বৈরাগ্য ভাব। যার ভিতরে প্রেমের উদয় হইয়াছে, সে আর তার বাহ্য প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয় না; যার ভিতর অবনত হইয়াছে, সে আর বাহিরে বিনয় দেখাইতে ব্যস্ত হয় না: অথবা যার অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, সে বাহিরে গৈরিক বস্ত্র পরিয়া, ভেক ধরিয়া, উপবাসী থাকিয়া, ধর্ম্মের ঢাক বাজাইয়া বেড়াইতে ভালবাসে না। ভিতরে কেবল গরল, কেবল খোসা, কেবল ভণ্ডামী,—তাই মানুষ দিবানিশি কি যেন ঢাকিতে, কি যেন চাপা দিতে ব্যতিব্যস্ত।

আজ কালকার দিনে, ধর্ম্ম, চরিত্র, প্রেমপুণ্য—জীবনের অমূল্য ভূষণ, এ সকল নাকি বলিয়া মানুষকে বুঝাইতে হয়। প্রকৃত খাটী জিনিসের অভাব হইলেই এরূপ হয়। আমরা এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, যাহারা মানুষ দেখিলে উপাসনা করিতে বসে, যাহারা অবসর ও সুযোগ পাইলেই নিজ চরিত্র-গৌরব ঘোষণা করে। "আমি উপাসনা করি তখন, যখন আর কেহ কাছে না থাকে,"—এ কথা অতি অল্প লোকেই বলিতে পারেন। "ভিতরে মরিয়া রহিয়াছি, বাহিরে গৈরিক বস্ত্র পরিয়া বৈরাগী সাজিয়া কি করিব, অথবা ভিতরে যখন জীবিত রহিয়াছি, তখনই বা এ বাহ্য-প্রকাশের প্রয়োজন কি?" এ কথা এই বাহ্য-চটকের দিনে কই বড় একটা শুনিতে পাই না। এখন যে একখানি গৈরিক বস্ত্র পরে, যে দুই একটা মিষ্ট সঙ্গীত করে, যে দুই একটা

অনুষ্ঠান করে, বা যে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে, সে ব্যভিচারী হউক, আসক্তির দাস হউক, সে হৃদয়ে ভয়ানক নরক পোষণ করুক, তার আর এ ভব-বাজারে বিপদ নাই। সে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাজে সমাদৃত। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঘাটে দীর্ঘ তিলকধারী ব্রাহ্মণকে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি, অথচ দেখিয়াছি, তাহারা আড় নয়নে যুবতীর পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিতেছে! দেখিয়াছি, কত লোক গোপনে গো মাংস ভক্ষণ করিতেছে, অথচ বাহিরে নামাবলী গায় দিয়া নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। সঘন ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি, অথচ দেখিয়াছি, তাহারাই সুবিধা পাইলে অন্যের দ্রব্য অপহরণ করে, দুই দশ টাকার প্রলোভনেও ঘুষ লয়! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এই ধারণা জন্মিয়াছে, মানুষের ভিতর ও বাহিরে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ধারণা জন্মিয়াছে, যাহারা বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ করে, অন্তরে তাহারা নর-পিশাচ।

যে খাটী জিনিসের কাঙ্গাল, সে মেকি চায় না। যে চরিত্র পাইয়াছে, সে প্রতারণা জানে না। তোমার চক্ষে ধূলি দিতে পারি, কিন্তু বিধাতাকে বা নিজ আত্মাকে ত আর পারি না, তার প্রাণে দিবানিশি এইরূপ ভাব। তুমি তাহাকে ধার্ম্মিক বল বা না বল, তাতে তার বড় একটা আসিয়া যায় না;—কেননা সে সার এবং অসার বুঝিয়াছে। সে কথনও সত্য গোপন করিতে পারে না। "আমি জাতিভেদ মানি না,—মুসলমানের হাতের ভাতও খাই—তোমার ভয়ে তাহা অস্বীকার করিব? —না—তা কখনই পারিব না,"—সে ব্যক্তি এইরূপ বলে। আর যে প্রতারক, সে অন্যায় কার্য্য করে, কিন্তু তাহা চাপা দেয়। এইরূপ চাপা দেওয়ার ভাব আজ কাল এদেশে বড়ই বাড়িয়াছে। কপটতার আচ্ছাদনে বড় বড় ভণ্ড-তপস্বীরা আজ ভারতে দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচিত হইতেছে। এ সকল কথা কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে। খুব অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, খাটী জিনিস এ দেশে দিন দিন বড় দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া যাহারা চিৎকার করিয়া ফিরিতেছে, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে অতি অল্পই দেখি। দুই দশ দিন পরেই মেকি ধরা পড়িতেছে। যাহারা পরোপকার, দেশোদ্ধার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতির ধুয়া ধরিয়া বেড়াইতেছে, দেখি, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মধ্যে কেবল স্বার্থ-চিন্তা। টাকা, যশ, মান, প্রতিপত্তি, গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মান লাভ কামনা, দেশের বড় ছোট অধিকাংশ হিতৈষীর প্রাণে। ধর্ম্ম

বক্তৃতার জিনিস নয়, কিন্তু উপভোগের জিনিস; কিন্তু কয়জন লোক তাহা উপভোগ করে? সজন ছাড়িয়া, নির্জ্জনে বসিয়া, কয়জন লোক ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে? কয় জন তাঁকে পাইবার জন্য তাঁর চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করে? পরোপকার বা দেশোদ্ধার ব্রতও বক্তৃতার বিষয় নয়, তাহা জীবনে প্রতিপালনের জিনিস। কিন্তু কয়জন তাহা করে? গবর্ণমেণ্ট একটু খাতির করিলে. দেশোদ্ধার বা পরোপকারের কথা নিমেষের মধ্যে স্বার্থের প্রজ্জ্বলিত চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত হয়। এই যে এত বড় জাতীয় মহাসমিতি বসিতেছে, যাহার কার্য্যকলাপে হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে, কত ধুমধাম হইতেছে, আজ বড় বড় লোকদিগকে ডাকিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি বড় বড় উপাধি দেন, বা বড় বড় পদ দেন, অমনি মুখ বন্ধ হইয়া যায়। দেখিয়াছি, দশ দিন পূর্ব্বে যে খুব মহাসমিতির সপক্ষ ছিল, আজ সে গবর্ণমেণ্টের প্রসাদ লাভ করিয়া ইহার ভয়ানক বিরোধী হইয়াছে। একটু প্রসাদ লাভ করিবার জন্য যাহারা অপমানের বোঝা মস্তকে পাইয়াও, অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য লাটভবনে বারম্বার ধাবিত হয়, তাহারা গবর্ণমেণ্টের কৃপা পাইলে যে দেশের কথা ভুলিবে না কেন, জানি না। যিনি একবার গবর্ণমেণ্ট-প্রসাদ লাভ করিয়া বাঙ্গালীকে ঘৃণা করিয়াছিলেন, এবং যিনি হারিসন সাহেবের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী হইয়া করদাতাগণের রক্ত শোষণের টাকা জুবিলিতে অযথা ব্যয় করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তিনি আজ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য বা লাট সাহেবের সদস্য পদ পাইলে আবারও যে সেইরূপ মুখবক্র করিতে পারিবেন না, কেমনে জানিব? দশ টাকার জন্য যে দেশের লোক মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, একটু সম্মানের জন্য যে জাতি কপটতার জাল বিস্তারে সদা প্রস্তুত, সে জাতির উন্নতি কোথায়, কেবল বিধাতাই বলিতে পারেন।

এ দেশের সর্ব্বত্রই একরূপ দৃশ্য,—কেবল বাহিরের পোষাকের চাকচিক্য। হই-চই, কোলাহল, আন্দোলন,—সব আছে;—কিন্তু ভিতরে চরিত্র, ধর্ম্ম, বা কর্ত্তব্য-পরায়ণতারূপ খাটী জিনিসের একান্ত অভাব। তাই লোক গোড়ায় জল না ঢালিয়া মাথায় ঢালে। তাই লোক গৈরিক বস্ত্র পরিয়া, নিরামিষ-আহারী হইয়া বাহ্য-চটকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে চায়;—তাই লোক দেশের লোক দিগকে না জাগাইয়া,না তুলিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে চায়। বাহির—বাহির—বাহির—কেবল বাহির-সর্ব্বস্ব ভাব।

"মুখে জগৎ মারিব" ইহাই মূল মন্ত্র। কিন্তু জগৎ যে কেন ভুলেনা, এই ত বিষম দায়।

লর্ড ডফরিণ বিদায় ভোজ উপলক্ষে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবে। তাঁহাকে আমরা গালাগালি দিতেছি, কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন, তার মধ্যে কি সত্য কিছুই নাই? অশিক্ষার ঘোর অন্ধকারে কি ভারতের পোনের আনা লোক নিমগ্ন নয়? এই অশিক্ষার অন্ধকার না ঘুচিলে কি এ দেশের উদ্ধার হইবে? এই অশিক্ষার কলঙ্ক মোচনের জন্য আমরা কি দায়ী নই?—কিন্তু কে একথা বুঝিবে? জাতীয় মহাসমিতিতে এত ধূমধাম হইতেছে, কিন্তু কাজের ফর্দ্দ কি? কেবল কতকগুলি ফাঁকা প্রস্তাব! সে গুলির সার মর্ম্ম কি? না—গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেওয়া—"ইহা কর, তাহা কর?" বলি, গবর্ণমেণ্ট কি এতই নিরেট বোকা যে, তোমাদের এত আয়োজনের ও এত অর্থব্যয়ের ফলস্বরূপ একটু উপদেশ পুরস্কার পাইয়াই সব ভুলিয়া যাইবেন? দেখ—আশার কুহক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চতুর ডফারিণ সব বুঝিয়া লইয়া কি অক্ষয় গালাগালির-কবজ তোমাদের গলদেশে পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন! তোমাদিগকে গবর্ণমেণ্ট সাক্ষী মানে না, তবুও সাক্ষী দিবে? —এমন নিলর্জ্জ ব্যবহার ত আর কোথাও দেখি নাই! হায় এত আয়োজনের ফল কেবলই ফাঁকা আওয়াজ—একটিও প্রকৃত কাজের কথা নাই! আমাদের কর্ত্তব্য কেবল বক্তৃতা পর্য্যন্তই শেষ! কি শোচনীয় শিক্ষা! এত বড় বৃহৎ ব্যাপার হইতে একটা মহৎ কাজও প্রসূত হইল না। কিন্তু একথা কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে?

এখন কয়েক জন মাত্র দেশীয় মাজিষ্ট্রেট আছে, আন্দোলনের পর নয় ৫০ জন হইল; এখন অল্প কয়েক জন গবর্ণমেণ্ট সদস্য আছেন, আন্দোলনের পর নয় শত জন হইল;—তাতে আপামর সাধারণের কি উপকার হইল, বলিতে পার? তুমি বড় হইলে, বা সে বড় পদ পাইলে আপামর সাধারণের তাতে কি? দশজন দেশী লোক আইন করিল, কি বিদেশী লোক আইন করিল, তাতেই বা তাদের কি? তাদের উদ্ধারের বা উন্নতির পথ কিসে মুক্ত হইবে? এক মাত্র শিক্ষা ভিন্ন আর উপায় নাই। এই সাধারণের শিক্ষাব্রত কি জাতীয় মহাসমিতি লইতে পারেন না?—না—যত দিন বাহিরের চাকচিক্য, বা যশ মানের প্রতি লোভ, ততদিন কিছুতেই

এ কাজ হাতে লইতে পারেন না। কাজেই বলি, কেবল বাহির, কেবল বাহির লইয়াই মাতামাতি! ভিতর কে চায়, কে খোঁজে? অন্তরদৃষ্টি ভিন্ন, আপামর সাধারণের উন্নতি ভিন্ন কখনও কোন জাতির উন্নতি হয় নাই, হইবে না। কিন্তু এ সকল কথা বলিতে গেলে লোক বড়ই বিরক্ত হয়। কি দুঃখের বিষয়, একই ভাব, একই কথা, একই প্রণালী যেন সকলের মস্তিষ্ক প্রসূত। চারি বৎসর ভারতের মহা মহা ধুরন্ধর ব্যক্তিগণ মিলিয়াও একটা প্রকৃত উন্নতির পথ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। আবেদন-প্রস্তাব (Petition) ভিন্ন, ভিক্ষানীতি ভিন্ন আর ভারতবাসীর উন্নতির যেন কোন পন্থা নাই। শুন, কি মর্ম্মভেদী কথা! সব লোকের মুখে এক কথা, সব সংবাদপত্রে একই ভাষা, একই ভাব। একটু অন্য রকম লিখিলেই বিরক্তির উৎপত্তি। আমরা এ সকল বিরোধী চিন্তা লইয়া এখন দাঁড়াই কোথা, তাহাই ভাবিতেছি।

একজন প্রতিনিধির সহিত এই রূপ অনেক বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "আবেদন করা বা অন্যের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, তাহা কি আপনি জানেন না? বৎসরের মধ্যে ৪।৫ দিন ব্যয় করা সহজ, কিন্তু সমস্ত বৎসর দেশের উন্নতির চিন্তা লইয়া কি আমাদের পক্ষে থাকা সম্ভব? আমাদের দ্বারা তাহা হইবে না, তাহা পারিব না!" আমরা বলিলাম, "যাহা নিজেরা পারেন না, অন্যে তাহা কিরূপে পারিবে? দেশের উন্নতির জন্য আপনারা কোন স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবেন না, তবে অন্যকে উপদেশ দেন কেমনে? ইংরাজ-জাতি স্বার্থ সাধনের জন্য ভারতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে স্বার্থ ছাড়িতে এত উপদেশ দিতে যাইতেছেন, কিন্তু নিজেরা একটুও স্বার্থ ছাড়িতে প্রস্তুত নন। এ দেশ-হিতৈষিতা না করিলেই কি হয় না?" তিনি বলিলেন, "নয় প্রতিনিধি না হইলাম, দর্শকের ন্যায় সমিতিতে উপস্থিত থাকিব?" আমরা বলিলাম, "প্রতিনিধি হইয়া প্রতিনিধির কাজে অবহেলা করা ভয়ানক অন্যায়। যখন প্রতিনিধি হইয়াছেন, তখন প্রাণপণে প্রতিনিধির উপযুক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত;— নয় কার্য্য দ্বারা, নয় চিন্তা দ্বারা, নয় অর্থ দ্বারা দেশের মঙ্গল করুন; কেবল গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় দশ জনের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া যাইলে কখনও আশানুরূপ ফল পাইবেন না। কর্ত্তব্যবোধ ও দায়িত্ববোধ না জন্মিবার দরুণেই আমাদের অনেক কাজ বালকের ক্রীড়ার ন্যায় হইতেছে, তাহা

কি বুঝিতেছেন না? সাবধান হউন, দায়িত্ব বুঝুন, কর্ত্তব্য পালনে জীবন উৎসর্গ করুন;—নচেৎ ঠাট্টা তামাসা করিয়া হাসিয়া নাচিয়া কখনও দেশোদ্ধার করিতে পারিবেন না,—এরূপে কেহ কখনও দেশোদ্ধার করিতে পারে নাই।" এই কথাগুলি প্রতিনিধি মহাশয়ের প্রাণে বড় লাগিল, তিনি আপনার দায়িত্বহীন ব্রত গ্রহণে বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং শেষে বলিলেন—"এবার আমি জাতীয় সমিতির কার্য্যাদি পরিদর্শন করিব, তার পর আগামী বৎসর হইতে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিব।"

আমরা জানি, অনেক লোকই এইরূপ দায়িত্ববিহীন ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। আনন্দ, উল্লাস, দেশভ্রমণ,—যশ মানের কুহক,—এ সকলের আকর্ষণেই অনেকে "প্রতিনিধি" সাজিবার জন্য সভা আহ্বান করেন, এবং প্রতিনিধি হন। নচেৎ এক হাজার প্রতিনিধি যদি প্রকৃত পক্ষে দেশের উন্নতির জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিতেন, নিশ্চয় বলিতে পারি, দেশের অনেক দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাইত। একা ম্যাট্‌সিনি, একা ওয়াসিংটন জগতের কি না করিয়া গিয়াছেন! আর আমাদের দেশে এত প্রতিনিধি, এত দেশহিতৈষী, তবুও ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে—কি পরিতাপের বিষয়! যতদিন আমাদের দেশের লোকের দায়িত্ববোধ, কর্ত্তব্য-বোধ না জন্মিবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না।

ধর্ম্মবিশ্বাস ভিন্ন সেরূপ দায়িত্ববোধ, সেরূপ কর্ত্তব্য-বোধ জন্মিতে পারে কি না, প্রশ্ন এই। আমরা চিরকাল বলিয়া আসিয়াছি যে, তাহা অসম্ভব। মানুষ যতদিন মানুষ হইবে না, ততদিন তার কর্ত্তব্য-বোধ জন্মা অসম্ভব। ধর্ম্মবিশ্বাস ভিন্ন মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্ম ভিন্ন মানুষের প্রতারণা, ছলনা বা কপটতার জাল ছিন্ন হয় না,—মানুষের চরিত্র লাভ হয় না, মানুষ মানুষ হয় না। ধর্ম্মহীন মানুষ না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। মদ্য পান, ব্যভিচার, মিথ্যা কথা বলা, নরহত্যা, পরস্বাপহরণ, এ সকলেই মানুষ করিতে পারে, যতদিন তার ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মে নাই। যে নরহত্যা করিতে পারে, যে অন্যের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারে, যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতে পারে, তার দ্বারা জগতের উপকার হইবার আশা যে করে, সে মূর্খ। কারণ, মানুষকে যে ভাই বলিয়া না বিশ্বাস করিল, সে কেন তার উপকার করিবে? ঈশ্বরে বিশ্বাস ভিন্ন মানুষের ভিতরে তাঁর জলন্ত প্রকাশ দেখিতে পারা মানুষের পক্ষে অসম্ভব;

সুতরাং মানুষকে আদর করিতে পারাও অসম্ভব। মানুষকে ভ্রাতার ন্যায় না দেখিয়া যে পশুর ন্যায় ঘৃণা করে, তার দ্বারা মানুষের উপকার হওয়া অসম্ভব। যশ মানের কুহক, স্বার্থের আকর্ষণ এই পথে কিছুদিন মানুষকে চালাইতে পারে বটে, কিন্তু যখন সেই কুহক বা সেই আকর্ষণ ছিন্ন হয়, তখন, হায়, তখন মানুষ পা গুটাইয়া লয়, এবং তখন আর এক মুহূর্ত্তও পরের কথা ভাবিতে পারে না। অতএব—পরোপকার বল, বা দেশোন্নতি বল বা জাতীয় মিলন সংঘটনের কথা বল, ধর্ম্ম বিশ্বাস ভিন্ন এ সকল সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। ইতি মধ্যেই দেখিতেছি, আজ যিনি দেশ-সংস্কারক, কাল গবর্ণমেণ্টের প্রসাদ লাভ করিয়া তিনি দেশের শত্রু। সৈয়দ আমেদের কথাই বল বা শিবপ্রসাদের কথাই বল, আমরা অনেকেই যে গবর্ণমেণ্টের প্রসাদ লাভে অধিকারী হইলে এরূপ করিতে পারি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের মধ্যে কে এমন আছেন, যিনি জীবনের ঘটনার দ্বারা ইহার অন্যরূপ দেখাইয়াছেন? কই, খুঁজিয়া ত পাই না। আমাদের চরিত্রের এইরূপ চাঞ্চল্য দেখিয়াই লর্ড ডফারিণ এত গালাগালি দিয়া গিয়াছেন। একথা গুলি একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখা নিতান্ত উচিত। আমরা কি প্রকৃতি লইয়া দেশে হই-চই করিতেছি, একবার স্থির চিত্তে অনুধাবন করা একান্ত উচিত। বাহিরে এক ভাব, ভিতরে আর এক ভাব; বাহিরে দেশের উন্নতির কথা, ভিতরে নিজের স্বার্থ চিন্তা;— বাহিরে দেশ-সংস্কারক, ভিতরে দেশ-হন্তারক হইয়া আমরা যে কি অপদার্থতার পরিচয় দিতেছি, সকলেরই একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। মনুষ্যত্বহীন, চরিত্রহীন ব্যক্তি কতদিন কপটতার আচ্ছাদনে আপনাকে ঢাকিয়া জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে? আজ, নয় কাল, তার চাতুর্য্য ধরা পড়িবেই পড়িবে। মানুষ—আগে চরিত্রবান হও, ধার্ম্মিক হও, বিধাতার ইঙ্গিত বুঝ, তার পর কর্ত্তব্য-ব্রত গ্রহণ করিয়া বীরের ন্যায় তাহা পালনে জীবন বিসর্জ্জন কর। কেবল হুজুগ, কেবল স্বার্থচিন্তা, কেবল মুখ-সর্ব্বস্ব ভাব লইয়া আর কতদিন কাটাইবে? ছি, জগতের লোক যে তোমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে—বা ফেলিবে, অন্ততঃ এ ভাবনায়ও একবার আত্মদৃষ্টি কর। সর্ব্বোপরি বিধাতা যে সকল ভণ্ডামী দেখিতেছেন, ইহা জানিয়া আপনাকে সংশোধন কর। কপটাচারী হইয়া আর কত কাল উন্নতির অন্তরায় হইবে? উন্নতির সরল পথ নিজ

কপট ব্যবহারের দ্বারা আর রুদ্ধ করিও না, পায়ে ধরি সতর্ক হও। দেশের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত, পায়ে ধরি একবার তাহা চিন্তা কর।

নব্যভারতের কথা।

চারি বৎসর হইল, দেবোপম আর্য্যভূমি ভারতবর্ষকে আমরা নব্য-ভারত নামে অভিহিত করিয়াছি।—দেখিতে না দেখিতে, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, ব্রত উদ্যাপিত হইতে না হইতে, চারিটী বৎসর, অনন্ত কালের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে! সুখ এবং দুঃখ, আনন্দ এবং বিষাদ, সকলই অনন্তের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। শূন্য প্রাণে অবসন্ন হৃদয়ে আমরা কেবল সময়ের ঘোর ফের পরীক্ষা করিতেছি। কিন্তু বিধাতার লীলা কে বুঝিবে? আমাদের সকল পরীক্ষা শেষ হইতে না হইতেই, কামনা ফুরাইতেছে—স্বপ্ন ভাঙ্গিতেছে। আমরা অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। তবুও সময় ফেরে না—অবিরাম-গতি অবিশ্রান্ত বেগেই অনন্তের পথে চলিয়াছে!!

মহাত্মা কটন সাহেবের প্রসাদে নব্যভারত নামের প্রতি আর লোকের বীতরাগ নাই। তিনি দুই বৎসর হইল বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ভারত এখন নব বেশ ধারণ করিয়াছেন। এখন অনেকেই এই নামের পক্ষপাতী। সুতরাং আমাদের একটী কথায় সুফল ফলিয়াছে। মহাত্মা কটনের নাম সেই সঙ্গে সঙ্গে এদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। কালের গতি কে বুঝিবে? একের ছিন্ন আশার স্বপ্নে অপরের গৌরব! কালের মহিমা কে বুঝিবে!!

এই চারি বৎসর ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। মানুষের কাজে শত দোষ, সহস্র কালিমা থাকিতে পারে, তাতে কিছুই আসে যায় না। সহস্র কালিমা, সহস্র কণ্টক বা সহস্র কলঙ্ক থাকিলেও আকাশের চাঁদ বা কাননের গোলাপ, মৃণালের পদ্ম বা বসন্তের কোকিল, মানুষের নিকট চিরকাল আদরের জিনিস! সেইরূপ ধর্ম্ম কথা ও ধর্ম্মা-ন্দোলন, স্বার্থযুক্ত হইলেও, চিরকাল আদরের। দেশ-সংস্কার বা দেশ

উদ্ধার, একতা বা সাম্য, স্বাধীনতা বা মৈত্রী, চরিত্র, নীতি ও ধর্ম্মের উৎকর্ষ ভিন্ন এ সকলই সুদূরপরাহত। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমরা একথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি—এই চারি বৎসর আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য দিগন্তব্যাপী আন্দোলন উঠিয়াছে! সম্প্রদায় বিশেষ দুঃখিত হইতে পারেন, কিন্তু আমরা এই শুভ লক্ষণের ভিতরে ভারতের উন্নতির এক মহৎ শক্তিশালী বীজ নিহিত বলিয়া বুঝিতেছি। সুতরাং আমরা আশাতে আরো বুক বাঁধিতে পারিতেছি। এ সম্বন্ধে নব্যভারতের ক্রন্দন বৃথা হয় নাই।

ভারতে কি কেবল ধর্ম্মের দুন্দুভি-নিনাদ ধ্বনিত হইতেছে? না—কেবল তা নয়। গত দুই বৎসর ভারতে মিলনের এক অপরূপ স্বর্গীয় ছবি আমরা দেখিয়াছি। ভারতের জাতীয় মহাসমিতির মহা মহা বিরাট অধিবেশনের পর কে, আর সন্দেহ করিবেন যে, এই ভারতে জাতীয় মিলন অসম্ভব? এক তানে, এক তন্ত্রীতে, এক ভাবে, এক মদে আজ ভারত মাতোয়ারা। এখনও অসম্পূর্ণ আছে, তা জানি। এখনও নিম্ন শ্রেণীর উত্থান হয় নাই, এখনও দরিদ্রের চক্ষের জল ঘোচে নাই, সে সব জানি। কিন্তু সকলই সময়-সাপেক্ষ। জাতীয় অভ্যুত্থানের এক বিজয় ভেরী ভারতে বাজিয়া উঠিয়াছে। যুবা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, মানী—আজ একপ্রাণ, একমন। এই একপ্রাণতায় সহৃদয়তা, চরিত্র বল ও ধর্ম্মবল যখন সংযোজিত হইবে, তখন না জানি কি অপূর্ব্ব শ্রী হইবে,—না জানি কি এক অপূর্ব্ব শ্রীতে আবার ভারত সজ্জিত হইবে! নব্যভারতের আশার কথা কেবল কুহেলিকা নয়, ইহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তারপর জাতীয় ভাষা; ভাষার একতা যে জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথায় কাহারও বড় আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই ভাষা যে জাতীয় ভাষা হওয়া চাই, এ কথাতে অনেকের আজও গভীর সন্দেহ আছে। আছে থাকুক। কিন্তু এই চারি বৎসরে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কত উন্নতি হইয়াছে, সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় না। বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র আজ ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে দুই এক জন ইংরাজি ঘেঁষা লোকের কথা তুলিও না, আপামর সাধারণ লোক যে বাঙ্গালা ভাষার আদর করিতে শিখিতেছে, এই চারি বৎসরের সাময়িক পত্রের উন্নতিতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যে প্রকার দ্রুত গতিতে এই ভাষার উন্নতি হইতেছে, কালে এই ভাষা যে ভারতের মিল-

..নের মধ্য-বিন্দু হইবে, তাতে সন্দেহ রাখা দূরদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে আর উচিত নয়।

সংস্কৃতের চর্চ্চা অনেক কমিয়া গিয়াছিল, এই চারি বৎসরে অনেক বাড়িয়াছে, জাতীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি একান্ত অনুরাগ দেখিয়া এখন গবর্ণমেণ্ট টোলের সাহায্য করিতে অগ্রসর! সংস্কৃত ভাষার অমৃতময় অনন্ত প্রস্রবণ যে ভাষার প্রাণ, সেই মধুর হইতে মধুর বাঙ্গলা ভাষা কালে যে ভারতের অস্থি মজ্জা গ্রাস করিবে, আমাদের এখনও আশা আছে। তাই এই ভাষার উন্নতির জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি। নিন্দা, তিরস্কার মুসল ধারার ন্যায় বর্ষিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তবুও এই ভাষার উন্নতি চিন্তার বিরাম নাই। লক্ লক্ লক্ করিয়া সর্ব্বগ্রাসিনী হুতাশনের ন্যায়, রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিবে যে বাঙ্গালা ভাষা, তাহার প্রতি আজও যিনি বীতস্পৃহ, তিনি হিতৈষী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনও সহৃদয় প্রেমিক নহেন। নব্যভারত বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে আজও আশায় প্রদীপ্ত। কিন্তু সমগ্র দেশ এ কথায় আজিও সায় দেয় নাই; তাই দুঃখ। কিন্তু এসকলও আশার অবান্তরিক আয়োজন মাত্র। নব্যভারতের লক্ষ্য যাহা তাহা এখন বহু দূরে! শতাব্দীর পর শতাব্দী, তারও পরে। এখন আয়োজনের প্রয়োজন, তাই এখন আয়োজনের কথা লইয়া আলোচনা করিয়া থাকি। লক্ষ্য-সিদ্ধি এখনও বহুদূরে।

লক্ষ্য এখনও ঘোরতর গভীর মহা আঁধারে সুষুপ্ত। এখন কেবল পূর্ব্বাভাস মাত্র। পূর্ব্বাভাসে যে প্রকার আয়োজন হইতেছে, ইহা কিছুই নয়। ইহা বালকের ক্রীড়া মাত্র। নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা নাই, অথচ তাদের উত্থানের কথা, প্রেম নাই মিলনের কথা, প্রকৃত জ্ঞান চর্চ্চা নাই জাতিত্বের কথা—চারিত্র্য বল ও নীতি বল নাই স্বাধীনতার কথা, এ সকল বালকের ক্রীড়মাত্র। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের পরীক্ষা শেষ হইতে না হইতেই কামনা ফুরাইতেছে, কত দুঃখে দিন কাটাইতেছি! এখনও যে লোক পাশব বলের প্রতীক্ষা করিতেছে, চারিত্র্য-শাসনের পরিবর্ত্তে পাশব শাসনের আয়োজন করিতে চাহিতেছে, ইহাতে প্রমাণ হয় যে, প্রেম এখনও অনেক দূরে। সংসারের কঠোর যুদ্ধে মানুষকে বিজয়ী করিতে পারে—একমাত্র প্রেম। প্রেম আত্ম-সংযমের মূল মন্ত্র, প্রেম শত্রু-পরাজয়ের মহা অস্ত্র। কে শত্রু, কে মিত্র, কে আপন কে পর? প্রেমের নিকট সব একাকার। প্রেমের

অভ্যুদয় ভিন্ন আমিত্ব ঘুচে না, স্বার্থ নিবে না, মহা জ্ঞান জন্মে না। প্রেমের অভ্যুদয় না হইলে জীবনাহুতি দিতে কেহই পারে না। তাইত কেহই গা ঢালে না। তাইত সকলেই হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, কিন্তু কিছুতেই মজে না। সভায় অসার বক্তৃতা—এখন দেশোদ্ধারের মূল অস্ত্র; সংবাদ পত্রে হৃদয়-শূন্য অত্যাচার-কাহিনী লেখা এখন জাতিত্ব-গঠনের অমোঘ ঔষধ। সকলেই প্রাণ দানের কথা বলে এবং লেখে, কিন্তু দেশের জন্য কেহই প্রাণ দিতে চায় না। সকলেই বলে প্রেম নাই,—কিন্তু নিজে কেহই প্রেমিক হইতে চায় না। সুখ-বিসর্জ্জন, আত্ম-ত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, সকল যেন নিজের জন্য নয়, কেবল অন্যকে বুঝাইবার জন্য, কেবল সভার বক্তৃতার জন্য! বিসর্জ্জন—আত্মত্যাগ—স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কি কখনও কোন দেশ জাগিয়াছে? কিন্তু সে সকল এখনও এদেশে স্বপ্নের কথা। ডিনার ক্লবের নৃত্য গীতে, বক্তৃতা সভার বৃথা করতালিতে, উচ্চ প্রশংসার কুহক মন্ত্রে এখনও হিতৈষীদলের মন প্রাণ মন্ত্রমুগ্ধ। এখনও আত্মত্যাগের কথা—বাতুলের ক্রীড়া। তাই বলিতেছিলাম, লক্ষ্য-সিদ্ধি এখনও অনেক দূরে। আত্মত্যাগ শিখাইতে যে নব্যভারতের জন্ম, তাহা এখনও শত শত বৎসরের পশ্চাতে লুক্কায়িত। আশায় নিরাশা,—সুখে দুঃখ জাগিবে না, তবে কেন বলত?

আমাদের এক একবার ইচ্ছা হয়, এ স্বার্থ-কলঙ্কিত মুখ অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলি। মরণকে কতবার তাই উল্লাসে আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু মরণ কিছুতেই আমাদের আবদার শুনে না। এত নিরাশা, এত ক্রন্দন, এত বুক-পোরা হাহাকার—তবুও পোড়াপ্রাণ দেহ মমতা, সংসার মমতা ছিঁড়িতে পারে না। বিধাতার লীলা কে খণ্ডন করিবে! মরিতে যাইয়াও মরা হয় না। এতই সংসার-বিলাস-মমতা? কত মরণ আসে আবার কত মরণ নিবিয়া যায়। তোমরা যে আমাদের মরণের জন্য চেষ্টা করিতেছ, সে ত মঙ্গলের জন্যই! তাহা বুঝিয়াছি। থাকিয়া ফল কি, বাঁচিয়া লাভ কি! যদি অহেতুকী প্রেমই না পাইলাম, স্বার্থ ভুলিয়া যদি জগতের হইয়া যাইতে না পারিলাম—তবে জীবন ধারণ ত বৃথাই! তাই আমরা আরো মরণ, আরো অন্ধকার চাই, কিন্তু পাই কই? যে বুকপোরা আসক্তি! এই নিদারুণ আসক্তির সেবা করিতে, এ শুষ্ক জীবন ধারণ করিয়া কি হইবে? তাই বন্ধু! পায়ে ধরি শত মরণের শত বজ্র সঘন নিক্ষেপ কর। আমাদের কাছে তোমাদের ঐ হিংসার বাণ নিক্ষেপ

পুষ্প বর্ষণ! আমরা মরিতে চাই। আমরা অন্ধকার হইতে আরো অন্ধকারে যাইতে চাই। হিংসার আলোকে আর কাজ নাই! আমরা সব মায়া মমতা ভুলিতে চাই। ভালবাসা, মায়া, মোহ,—সব অন্ধকার হউক। আত্মীয় বন্ধু সব পর, আরো পর, আরো পর হউক। আমরা আসক্তিহীন মহা বৈরাগ্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আত্মত্যাগের মোহিনী মন্ত্রে দীক্ষিত হই। তোমরা আমাদের ধারে না ই বা বসিলে, আমাদের কথা না ই বা শুনিলে! চাই না, তোমাদের পবিত্র দেহ মনে আমাদের কলঙ্ক ঢালিতে চাহি না! মরণ, মরণ, কেবল মরণ; দুঃখ, দুঃখ, কেবল দুঃখ; অশ্রু, অশ্রু, কেবল অশ্রুপাত, আঁধার, আঁধার, কেবল আঁধার! দুঃখের সেবা করিয়া, অশ্রুতে ভাসিয়া, আঁধারে আমিত্ব ডুবাইয়া—স্বার্থ নিবাইয়া জগতের হইতে না পারিলে কিছুতেই আর নিস্তার নাই।

নব্যভারত আজও যে আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই, এ কথা কি আবার লিখিয়া বুঝাইতে হইবে? এখনও আপনার উজ্জ্বল কলেবরের প্রতি দৃষ্টি, এখনও প্রশংসার দিকে কর্ণ, এখনও অবস্থার প্রতি মনোযোগ, এখনও হিংসার প্রবল পরাক্রম! কি ভণ্ডামী! আমরা চাই, কেহ আমাদের কথা শুনিতে চাহিবে না, কেহ আমাদের প্রতি করুণার কটাক্ষপাত করিবে না, কেহ প্রশংসার স্তুতিবাদ উপহার দিবে না, কেহ ভালবাসার আদর করিবে না; সকলের ঘৃণা, সকলের অনাদর সত্ত্বেও, ঐ মরণের কোলে বসিয়া দিবানিশি দেশের মঙ্গল চিন্তা করিব; প্রাণের কথা গাইব! না থাকিয়া থাকিব! মরিয়া বাঁচিব! বাঁচিয়া অমর হইব।

রূপ না দেখিয়া মজা, ভালবাসা না পাইয়া ভালবাসা,—স্বার্থহীন হইয়া অন্যের উপকারের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া নব্যভারতের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যসিদ্ধি এখনও বহুদূরে। অহেতুকী প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ এখন: বহু শতাব্দীর পশ্চাতে! তাই নব্যভারতের হাহাকার এবং বিষাদ-সঙ্গীত, তাই এখনও পরাধীনতার তীব্র কষাঘাত নব্যভারতের অস্থি মজ্জাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে! নব্যভারত যদি বৈকুণ্ঠবাসী হইত, তবে এ হাহাকার থাকিত না। শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান! আগুন, আগুন, আগুন! আঁধার, আঁধার, আঁধার! মহাবৈরাগ্যের এইরূপআগ্নেয় মন্ত্রে মাতোয়ারা না হইলে নব্যভারতের কিছুতেই মঙ্গল নাই। স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের মহাব্রত এখনও অন-উদযাপিত রহিয়াছে। অনুন্নত নব্যভারতের তাই আজও পৃথিবীতে অবস্থিতি।

বিধাতার লীলা কে বুঝিবে? কিছুতেই দেহ-মমতা, জীবন-মমতা,—সংসার মমতা ছাড়িয়া নব্যভারত জগতের হইতে পারিল না। এ দুঃখ কে বুঝিবে?

জাতীয় ভাষার আবশ্যকতা।

মানুষ কথা কয়, মানুষ শুনে। মানুষ মনের ভাব ব্যক্ত করে, মানুষ কাণ পাতিয়া শুনিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করে। মানুষের মনের ভাব যদ্দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাকেই শব্দ বলে। কতকগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ শব্দের নাম পদ। সুশৃঙ্খলাবদ্ধ পদ সমষ্টির নাম ভাষা। সুতরাং যদ্দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত হয়, তাহাই ভাষা। ভাষা ভিন্ন মানুষ মানুষকে চিনিতে বা বুঝিতে পারে না। একতার প্রথম জিনিস, পরস্পরকে জানা, বুঝা। যাহাকে জানা যায় নাই,—সে ব্যক্তি কল্পনার আঁধার-মাখা ছায়াজগতে জীবিত, তার সহিত আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইতে চাওয়া মহাভ্রান্তি। যাহাকে জানিয়াছি, দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি,—স্থূলত তাহাকেই ভালবাসি। পরিচিত বা জানিত লোককে ভালবাসাই মানুষের স্বভাব। অর্থাৎ প্রেমের মূলে জ্ঞান। ভাষা, জ্ঞান-সোপান। অতএব বুঝা যাইতেছে, ভাষাই মানুষকে আত্মীয়তার জগতে বা মিলনের জগতে টানিতেছে। যে জগতে ভাষা নাই, সে জগতে মিলন নাই, একতা নাই,—প্রেম নাই, কিছুই নাই।

এই জগত ভাষাময়। জড়ই বল আর চেতনই বল,—সকলই যেন কি একটা ভাবে বিভোর। কেহ কথা কয়, কেহ কয় না—কিন্তু সকলই ভাবে বিভোর। ফুল হাসে, পাখী গায়, সূর্য্য জ্যোতি ঢালে, নক্ষত্র মধুর চাহনি চায়, নদী চলে, সময় বয়—এ সকলই কি জানি একটা মহা ভাবে বিভোর! কেহ কেহ বলেন, চেতন বস্তু ভিন্ন আর কোন কিছুতে মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারে না। মিথ্যা কথা। সকলই ভাবে বিভোর—সকলই আপন আপন বিশেষত্ব জগতে ঢালিতেছে। সকলই কি যেন এক অলক্ষিত গুপ্ত শক্তির মহিমা-গীতি গাইতেছে। তাই বলি, এই জগত ভাষাময়,

কাব্যময়। ভাষাময়ই বল বা সঙ্গীতময়ই বল। যা খুসি। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে,—চেতন এবং অচেতন, সমস্তই আমাদিগকে নূতন নূতন রাজ্যে লইয়া যাইতেছে। ফুলটী বাগানে ফুটিয়া, পাতাটী মৃদু দোলনে দুলিয়া—কি যেন অমৃত ঢালিল, কি করিয়া যেন প্রাণ কাড়িয়া লইল। তোমরা বলিতে পার, ওত সব জড়, প্রাণ কাড়িবার ওদের কোনই শক্তি নাই। কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সকলেরই প্রাণ কাড়িবার শক্তি আছে। সকলই কোন না কোন রূপে প্রাণ কাড়িতেছে। প্রাণ কাড়িয়া আপন প্রাণে বাঁধিতেছে। ফুলটীকে কেন বল ত মানুষ অত দেখে,—কেন বলত দেব-সেবায় দেয়,—কেন বলত হৃদয়ে পরে? ফুলটী কি যেন এক মধুর কথায়, মধুর আকর্ষণে মানুষকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। তাই তাকে মানুষ এত ভালবাসে। মানুষ কন্টকের ভয় করে না—মানুষ ফুল তুলিয়া গলে পরে। যে যাকে ভালবাসে, সে তাকে ফুল দেয়। সুসভ্য এবং অসভ্য—সকল লোক এই ফুলের নিকট আত্মবিক্রীত। এইরূপে দেখা যায়, জগতের সকল অণু পরমাণু, জীব জন্তু আপন ভাষায় অপরকে পরিচয় দিয়া, আপন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সকলকে প্রাণের পানে টানিতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জীব জন্তু,—জড় অজড়, সকলই আপন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া এক মহাপ্রাণতায় সকলকে বাঁধিতেছে। কেহবা নীরবে, কেহবা সরবে, আপন তত্ত্ব জগতে ঘোষণা করিতেছে! কার ইঙ্গিতে কে জানে, সকলই হাসে, গায়, কথা কয়, ভাব ঢালে।

তবে বুঝা যাইতেছে,—ভাষা সরব, এবং নীরব। জীবের ভাষা, সরব; জড়ের ভাষা,—ফুলের ভাষা, চন্দ্র সূর্য্যের ভাষা—নীরব। ভাষার কাজ প্রাণের পরিচয় দেওয়া,প্রাণ কাড়া, প্রাণে প্রাণ বাঁধা। সে কাজ কিন্তু এই নীরব এবং সরব,উভয় ভাষার দ্বারাই সাধিত হয়। বহুদিন পর প্রণয়ী যুগলের মিলন হইয়াছে,নয়নে মাত্র দুই বিন্দু জল,মুখে কথাটী নাই ;—তবু উভয়ে উভয়ের প্রাণের ভাষা বুঝিয়া লইতেছে ; উভয়ে উভয়ের প্রাণে ডুবিতেছে। পরস্পরকে বুঝিয়া লওয়া যদি কথা, তবে উভয়ের দেখা সাক্ষাতেই বুঝা শুনা হইয়াছে। এখানেও নীরব ভাষার নীরব কার্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু অনেক সময় মানুষ কথা না বলিয়া প্রাণের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। পারিলেও তাহা মানুষ সব সময় বুঝে না। এই জন্যই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

ভাষার সৃষ্টিতে মানুষের মিলনের যে একটা অতি আশ্চর্য্য জগৎ খুলিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। নীরব ভাষার শক্তি কেবল বর্ত্তমান লইয়া, সরব ভাষার শক্তি অতীত এবং ভবিষ্যতের পরপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নীরব ভাষা দেখা সাক্ষাতে মাত্র কার্য্যকরী; কিন্তু সরব ভাষা লিপিবদ্ধ হইয়া অনন্ত কাল মানবজগতে শক্তি বিকীর্ণ করিতেছে। একটা ক্ষণস্থায়ী,—এই আছে, এই নাই;—মাদকতা,—উন্মত্ততা,—বা কেবল ভাবময়। আর একটা অনন্তকাল স্থায়ী,—ভাবের অতীত,—চিন্তাময়, জীবনময়।

ইংরাজ জাতি আজ জগতের সকলের প্রিয়। কেন বল্ ত?—বাহুবলে, ধনবলে, ঐশ্বর্য্য বলে? মিথ্যা কথা। ইংরাজজাতি প্রধানত ভাষার মোহিনী সঞ্জীবনী মন্ত্রে জগতকে এক প্রাণে বাঁধিতেছে। জগতের সকলকে এক প্রাণে বাঁধিতে ভাষা যেমন কার্য্যকরী, এমন আর কিছুই নয়। ফরাসী ভাষা এখনও জগতের এক প্রাণতার মধ্যবিন্দু। পৃথিবীর দশ জাতি একত্রে মিলিত হইলে ফরাসী ভাষাতে কথা বার্ত্তা চলে। সেইরূপ ইংরাজী ভাষার প্রতাপ বিস্তার হইতেছে। কোথায় কোন্ যুগে সেক্ষপিয়র বা মিল্টন জন্মিয়াছিলেন, আজও তাঁহারা যেন জীবিত। তাঁহারা জীবিতের ন্যায় কত কথাই বলিতেছেন, কত ভাবই ঢালিতেছেন, কত মিলনের সংবাদই আনিতেছেন। অতীত জগত—বর্ত্তমান জগতে বাঁধা। বর্ত্তমান—ভবিষ্যতের করে বাঁধা। অনন্তকাল ব্যাপিয়া ঐ মধুর সঙ্গীতরব উঠিতেছে—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎকে বাঁধিতেছে। ভাষা কালের অতীত। কেবল কি তাহাই? ভাষা যাকে পায়, তাকেই মাতায়, তাকেই বাঁধে, তাকেই কাঁদায়। ইংলণ্ড আজ পৃথিবীর প্রাণের জিনিস। ইংলণ্ড আজ পৃথিবীতে একীভূত। ইংরাজী ভাষা আজ দেশে দেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, মিলনের মূল মন্ত্র। ইংরাজী ভাষার গৌরব আজ সকলের মুখে কীর্ত্তিত হইতেছে। পৃথিবীকে এইরূপ এক-প্রাণতার স্বর্গীয় মন্ত্রে দিক্ষা দিতেছে যে ইংরাজী ভাষা, ইহা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল? মাত্র দুটী দশটী লোকের মুখের অস্পষ্ট অস্ফুট শব্দে নিবদ্ধ ছিল। আর আজ দেখ, পৃথিবীর আর সকল ভাষা যেন নিবিয়া যাইতেছে, ইংরাজী ভাষা নব জীবন পাইতেছে। অথবা আর সমস্ত ভাষা যেন আপন অস্তিত্ব ইহাতে মিশাইয়া কলেবর ত্যাগ করিতেছে। আজ লাটিন, গ্রীক, এবং

দেব-ভাষা সংস্কৃতের এত অনাদর, আর দেখ আসুরিক ভাষা ইংরাজীর কত আদর!

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশক। যখন যে দেশে মানুষের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখনই সে দেশে একটা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। জড় অবস্থায় নীরব ভাষা। অসভ্য অবস্থা জড় অবস্থার একটু উপরে। সেখানেও ভাষা আছে, কিন্তু তাহা লিপিবদ্ধ নয়। বিবর্ত্তনবাদের মূলে যত দূর যাইতে চাও, যাও, দেখিবে, সর্ব্বত্রই ভাষা আছে, কিন্তু কোথায় সরব, কোথাও নীরব, এইমাত্র প্রভেদ। কোথাও মৃত, কোথাও ক্ষণস্থায়ী,—কোথাও জীবন্ত, কোথাও অনন্তকালস্থায়ী। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি হইতেছে। অথবা জড় ও চেতনের মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম স্থান আছে, যাহা নির্ণয় করিতে মানুষের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়। চেতন আবার নানারূপ অবস্থা ও রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া সুসর্ব্বাঙ্গ মানবদেহ ধারণ করিতেছে। সৃষ্টিতত্ত্বের এ গূঢ় রহস্যে লোকের সন্দেহ থাকে, থাকুক, কিন্তু একথায় কাহারও সন্দেহ থাকিবার উপায় নাই যে, মানুষ যতই সভ্য হয়, ততই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। অর্থাৎ ততই লোকের মনোভাব প্রকাশের সহজ উপায় আবিষ্কার হয়। কিম্বা যত দিন মানুষ জীবিত, ততদিনই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন, তৎপরই ভাষার হীনাবস্থা। প্রাচীন লাটিন, গ্রীক এবং সংস্কৃত ভাষার স্থানে যে ইংরাজি ভাষা বৈজয়ন্তি উড়াইতেছে, ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হয় যে, প্রাচীন রোমক, গ্রীক বা হিন্দু-জাতি মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। বস্তুত কথাও তাই। যে সময় হইতে পবিত্র সংস্কৃত ভাষা, লাটিন এবং গ্রীক ভাষার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে পৃথিবীর প্রাচীন-গৌরব ঐ উন্নত জাতি সকলের মহাপতন হইয়াছে। সেই সময় রোম জাতির অবনতি, গ্রীক জাতির হীনাবস্থা, এবং আর্য্য-জাতির মহাপতন হইয়াছে। আর্য্য-জাতি নাই—তাই আর্য্য ভাষার গৌরব নাই; তাই ভারত ভূমে ইংরাজির এত আদর! কোন জীবিত জাতি যে পরমুখে কথা কহিতে পারে না, এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া আর উপায় নাই।

মানুষ জীবিত নয় মৃত? একথার প্রমাণ কিসে পাওয়া যায়! মানুষ কথা কয় কি না কয়;—ইহাতে। নিশ্বাস বহে কি না বহে, এও জীবন মরণের একটা পরীক্ষার বিষয় বটে, কিন্তু যে জীবন মরণ শরীর সম্বন্ধীয়। মানুষ

শরীর ধারণ করিয়াও মরণের কোলে পড়িয়া থাকিতে পারে। মানুষ বাঁচিয়াও মৃতের ন্যায় থাকিতে পারে। যে বীজে মানুষের উৎপত্তি হয়, সে বীজে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবিত অনেক পরমাণু থাকে; কিন্তু কথাও বলে না, নিশ্বাসও ফেলে না। এই জন্য তাহাদিগকে কেহ জীবিত বলে না, বুঝিলাম। শিশু যখন জরায়ু গর্ভে অল্পে অল্পে সর্ব্বাবয়ব পাইয়াছে, তখনও সে কথা বলে না, কিম্বা নিশ্বাস ফেলে না। বলত সে জীবিত কিনা? সকলেই বলে, জরায়ু গর্ভে শিশু জীবিত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্যতার ইতিহাসে তার নামে একটা মরণের কালির দাগ অঙ্কিত রহিয়াছে,—সে সভ্যতার জগতে আজিও জীবিত মানুষ বলিয়া পরিচিত হয় নাই। তার পর পৃথিবীতে কত কোটি কোটি অসভ্য মানুষ শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে তাহারা মৃতের ন্যায় ব্যবহৃত। পৃথিবীতে এইরূপ কত মানুষ জীবন ধারণ করিয়াও সভ্যতার জগতে বা মনুষ্যত্বের বাজারে যে মরিয়া রহিয়াছে, কে তাহার গণনা করিতে পারে! অনেক মানুষ বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু জীবন ধারণের কোন স্মৃতি রাখিয়া যায় না, তাহারা মৃত অপেক্ষাও মৃত। তাহারা জীবন্মৃত। আর যাহারা মানুষ, তাহারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, কার্য্য করে। জীবন্ত মানুষের সমষ্টিতে জীবন্ত জাতির অভ্যুদয়। জীবন্ত জাতির অস্তিত্ব যেখানে, সেই খানেই জীবন্ত ভাষা। অথবা জীবন্ত ভাষাই জীবন্ত জাতির অস্তিত্ব ঘোষণা করে। জীবন্ত জাতির অভ্যুত্থান হইয়াছে, অথচ ভাষা জীবন্ত হয় নাই, অথবা সেই জাতিকে একপ্রাণতায় বাঁধিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কোথাও নাই। সকল জীবন্ত জাতির সভ্যতার ইতিহাস খুলিয়া পাঠ কর,—জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, বুঝিতে পারিবে, জাতীয় অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার সৃষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। জাতীয় ভাষার উন্নতিতে জাতির উন্নতি, আবার জাতির উন্নতিতে ভাষার উন্নতি। দুই মেশামেশি, ঘেসাঘেসি। একের অবনতি যেখানে, সেখানে অপরের উন্নতি অসম্ভব। ভাষা নাই, জাতীয় অভ্যুত্থান হইয়াছে,—একতা আসিয়াছে, ইহা কোথায়ও পাঠ করা যায় নাই। অথবা জাতি আছে, জীবন্ত মানুষ আছে, অথচ জাতীয় ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, ইহাও দেখা যায় নাই। জাতির উন্নতিতে ভাষার উন্নতি, ভাষার উন্নতিতে জাতির উন্নতি। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই

এই নিয়ম। যাহা পৃথিবীতে আর কোথাও হয় নাই, তাহা ভারতে কেমনে সম্ভব হইবে? তাহা হওয়া অসম্ভব। ভারতে এক ভাষা যত দিন না হইবে, ততদিন ভারতে একপ্রাণতার মধুর মিলন বা জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব। জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যাহারা পরাঙ্মুখ, তাঁহারা দেশের পরম শত্রু।

গত বৎসর জাতীয়-মহা-সমিতিতে একজন মহাত্মা বলিয়াছেন, *— সর্ব্বাগ্রে মানুষের ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কার করা উচিত। তারপর যদি আর কিছু বাকী থাকে, তবে তাহা রাজনীতি-সংস্কার। লর্ড ডফারিণ প্রভৃতিও এই কথা বলেন। আমরা বলি, সর্ব্বাগ্রে ভাষা-সংস্কার মানুষের লক্ষ্য, তারপর আর সকল সংস্কার। আগে মানুষ কথা কহিতে এবং কথা শুনিতে শিখে, তারপর অন্যান্য প্রকার উন্নতি সাধন করে। কথা বলা বা শুনার সুবিধা যার নাই, সে কেমনে উন্নতি লাভ করিবে বলত? সব মানুষ কিছু মাটীতে পড়িয়া বড় হয় না। মানুষকে মানুষ করিতে হইলে—মানুষের দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে, মানুষের কথা শুনাইতে হইবে। মানুষকে মানুষ করিতে হইলে প্রাণময় জীবন্ত মানুষের প্রাণের কথা বলিতে হইবে;—কীর্ত্তিময় মানুষের মহা কীর্ত্তিকাহিনী শুনাইতে হইবে। ভাষার সাহায্য ভিন্ন ইহা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং ভাষার উন্নতি ভিন্ন মানুষের উন্নতি অসম্ভব। ব্যক্তিগত উন্নতি ভিন্ন জাতির উন্নতি অসম্ভব। যেখানে ভাষা নাই, সেস্থানে উন্নতিও নাই। ভাষা শূন্য জাতি পৃথিবীতে মরণের কোলে মহাকালনিদ্রায় চিরনিদ্রিত!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পর মুখে কথা বলিয়া কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নাই। ইংরাজ জাতির অভ্যুত্থান একথা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে যে, যদি জাতিত্ব গঠনে চেষ্টা করিতে হয়, তবে জাতীয় ভাষার গঠনে সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিতে হইবে। এক দিন দুদিনের কথা নহে। এক শত দুশত বৎসরেরও কথা নহে। কোন জাতির উন্নতি একশত বা দুশত বৎসরে হয় নাই। সহস্র বৎসরের চেষ্টার পর সুফল ফলে। ভারতবর্ষে নানা জাতির নানা ভাষা। এই সমস্ত ভাষা মিলাইয়া এক করা বড় কঠিন ব্যাপার। তাত বটেই। সোজা হইলে সকলেইত একটা মিলন ঘটাইতে পারিত। কঠিন বলিয়াই তাহা

* ১২৯৩ সালে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হয়।

সহজে হইতেছে না। কঠিন বলিয়াই হুজুগে বা বাল-চাপল্যের ক্রীড়ায় ও বাহ্য আন্দোলনে তাহা হইতেছে না। প্রকৃত উপায় অবলম্বন না করিলে তাহা হইবেও না। পৃথিবীতে যে ইংরাজী ভাষা এত পরিব্যাপ্ত হইবে, কেহ কি দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা কল্পনাও করিতে পারিয়াছিল? কিন্তু আজ তাহা জগতে সংসাধিত হইয়াছে। ভারতের এক ভাষা হইবে, ইহা কল্পনা করিতেও এখন অনেকে ভীত হন। বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহারাই কিন্তু ভারতকে স্বাধীন করিবার আশা-কুহকে মাতোয়ারা। যেটা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, সেটাকে সহজ মনে করেন; কিন্তু যেটা অপেক্ষাকৃত সহজ, অথচ জাতিত্ব গঠনের মূলভক্তি, সেটাকে কল্পনার ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দেন। ভাষার উত্তেজনা ভিন্ন কোন দেশের কোন পরিবর্ত্তন,—কোন প্রকার আমূল সংস্কার-কার্য্য সংসাধিত হয় নাই। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের কথাই বল, বা ফরাশি বিপ্লবের কাহিনীই বল, এ সকলই ভাষারূপ মহাশক্তির উদ্গীরণের ফল। ভল্টেয়ার, রুসো, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি অতি সামান্য সামান্য ব্যক্তির লেখনী এই ভাষার সাহায্যে পৃথিবীকে কিরূপ আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, দেখ। যেদেশে ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, সে দেশের উন্নতি হইয়াছে শুনিয়াছ কখনও? আমরা কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে দৃষ্টান্ত পাইতেছি না।

ভারতকে একপ্রাণে বাঁধিতে ইচ্ছা থাকিলে, জাতীয় প্রাণের ভাষা সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। প্রাণের ভাষা, এ কিরূপ কথা?—কেহ কেহ বলিতে পারেন। কথাটা এই। পৃথিবীতে দেখা যায়, দেশ কালের বিভিন্নতাতে, অবস্থাগত পার্থক্যে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্বর, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন লোকের আকৃতি এবং প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। সবই পৃথক্ পৃথক্। যে দেশের যেমন প্রাণ, সেই দেশের তেমন প্রাণের কথা। যার প্রাণে দুঃখ, সে দুঃখের কথাই বলে; যার প্রাণে সুখ, সে সুখের কথাই কয়। যার প্রাণে বীরত্ব—সে বীরত্বই প্রকাশ করে, যার প্রাণে প্রেমের কোমলতা, সে তাহাই জগতের লোককে জানায়। ভাষা প্রাণের ছায়া, তা নীরবই হউক, আর সরবই হউক। নীরব ভাষাও প্রাণের ছায়া, সরব ভাষাও প্রাণের ছায়া। যার প্রাণ যেমন, তার প্রাণের ছায়াও তেমনি। এই জন্যই দেখা যায়, পৃথিবীর নানা লোকের নানা ভাষা। আমার ভাষা তুমি বুঝ না, তোমার ভাষা আমি বুঝি না। তোমাকে আমি চিনি না, তুমিও আমাকে বুঝ না। আমি যা বলি তুমি তা অন্যরূপ বুঝ। আমি

বলি, তোমাকে ভালবাসার কথা; তুমি বুঝ, আমি শত্রুতার ফন্দি বিস্তার করিতেছি! প্রাণের কথা একেবারে অন্যেকে খুলিয়া বুঝাইতে পারে, পৃথিবীতে আজও ভাষার তেমন শক্তি জন্মে নাই। সেই জন্যই ভাষাকে অনেক সময়েই অসম্পূর্ণ বলি, তবে যত টুকু মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারা সম্ভব, তাহা কিন্তু এই ভাষাই পারে। প্রাণের সব কথা ভাষা প্রকাশ করিতে পারে না বটে, কিন্তু কতক ত পারে। এই জন্যই ভাষার মহিমা কীর্ত্তন করি। ভাষা নানা জাতির নানারূপ। নানা জাতি নানা রূপ। একরূপ ভাষা জগতের বিধান নয়—প্রকৃতি বা আকৃতিও জগতের সমস্ত জাতির একরূপ নয়। ধর্ম্ম সকলের এক নয়, ভাষাও এক নয়। তবে মোটামুটি ধরিতে গেলে, এক এক দেশের এক একটা মিলনের ঠাঁই পাওয়া যায়,—এক ধর্ম্ম বা এক ভাষার অর্থ ইহাই। সকলই পৃথক্ বটে, কিন্তু মিলনেরও ত ঠাঁই আছে। আছে বলিয়াই বলি, ইংরাজ জাতির যেমন ইংরাজি ভাষা, ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির তেমনই সংস্কৃত ভাষা ছিল। যে সংস্কৃত ভাষা এক সময়ে এক-প্রাণতায় আর্য্যাবর্ত্তের সকল নর-নারীকে বাঁধিয়াছিল, সেই দেশে নাকি ভাষার একতা আজ অসম্ভব! রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীতে ভারতের কাহার প্রাণ মোহিত নয়? কালীদাস, ভবভূতির লেখায় কার প্রাণ সরস হয় না? বেদ বেদান্তের স্বর্গীয় তত্ত্ব পাঠেই বা কাহার হৃদয় আনন্দিত হয় না? অধিকাংশ লোকেরই হয়। কারণ এই, অধিকাংশ লোকেরই প্রাণের কথার একটা মিলনের মন্ত্র যেন ঐ সকলে কীর্ত্তিত হইয়াছে;—অবস্থাগত, সমাজগত, দেশগত বা ধর্ম্মগত একতাতে ভারতভূমির নর-নারীর মিলনের একটা জমাট ঠাঁই আছে। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে গান্ধার দেশ ও আরব সাগর, পূর্ব্বে বঙ্গ উপসাগর ও মগমুল্লুক,—ইহার মধ্য-ভাগের অবস্থা অনেকটা একরূপ। এক আর্য্যজাতির শোণিতযোগে ভারতের অধিকাংশ মিশ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা এই দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম। এক হিন্দু সমাজের বক্ষে এক আচার প্রণালীতে সকলে লালিত, পালিত ও দীক্ষিত। এক সংস্কৃত ভাষা সকলের মূল ভাষা। এক ইতিহাস, এক কাব্য, এক শাস্ত্র, এক তন্ত্র সকলের উপদেষ্টা। এই ত অধিকাংশ লোকের কথা বলা হইল। মুসলমান সম্প্রদায়কে বাদ দিয়াই এ কথা বলিলাম। রাজনীতির ধুয়া ছাড়িয়া দিলেও ভারতবর্ষে হিন্দুর প্রাণ

হিন্দুর প্রাণে মিলাইবার এই সকল উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সকল সত্ত্বেও মিলন হইবে না কেন, আমরা কিছু বুঝি না। মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত কি সূত্রে মিলিবে, সে কথাও সংক্ষেপে বলি।

বিদেশ হইতে আসিয়াও এখন মুসলমান সম্প্রদায় ভারতের জল বায়ুতে জীবিত থাকিয়া থাকিয়া আর্য্যজাতির কতকটা ধাতু প্রাপ্ত হইয়াছে। নানা রূপে আর্য্যজাতির অনুপ্রাণনে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে জাতি যখন প্রবল হয়, সেই জাতির সংঘর্ষণে দুর্ব্বল জাতির পৃথক অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়। (Survival of the Fittest) মতের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, অনেক দুর্ব্বল জাতি প্রবলতর জাতির সংঘর্ষণে পড়িয়া কালের গর্ব্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। আর্য্যজাতি আবার যদি মস্তক উত্তোলন করিতে সক্ষম হয়, আর্য্যজাতির সংঘর্ষণে মুসলমান জাতির পৃথক্ অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সময়ে মুসলমান সম্প্রদায় আর্য্যধাতুতে বিমিশ্রিত হইয়া কলেবর ত্যাগ করিবে। এখনই এ কথার কতক আভাস পাওয়া যাইতেছে। ক্রমেই হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাব জন্মিতেছে। হিন্দুর ভাষা, হিন্দুর আচার-প্রণালী, হিন্দুর ধর্ম্ম অনেক মুসলমানকে দীক্ষিত করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বে মুসলমান রাজা ছিল বলিয়া এই একীকরণ একটু মন্দীভূত ছিল। এখন হিন্দু মুসলমান এক অবস্থায় উপনীত। হিন্দুর ভাষা হইতে মুসলমানের ভাষা বা ধর্ম্ম আর সহস্র বৎসর যে পৃথক থাকিবে, তাহা বোধ হয় না। মুসলমান ও হিন্দু এক ভাষায় কথা বলিয়া একসময়ে এক প্রাণে যে আবদ্ধ হইবে, এখনই তাহার কতক আভাস পাওয়া যাইতেছে।

এই জাতীয় ভাষা কিরূপ হইবে, ইহাতে লোকের সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা ঠিক কথা, এদেশের উপযোগী হওয়া চাই। ইংরাজী ভাষা বীরত্ব-ব্যঞ্জক, সংস্কৃত ভাষা প্রেমব্যঞ্জক,—সঙ্গীতময়, ধর্ম্মময়, মধুময়। ভারতে যে ভাষা কালে প্রাণের ভাষা হইবে, অর্থাৎ প্রাণ-বিনিময়ের মূল মন্ত্র হইবে, সে ভাষাকেও সঙ্গীতাত্মক মধুর হইতে হইবে। সংস্কৃত ভাষা হইতে খুব পৃথক হইলে কখনই তাহা ভারতের ভাষা হইবে না। বাঙ্গালা ভাষা যেরূপে গঠিত হইতেছে, নানা কারণে এই ভাষাকেই ভারতের একপ্রাণতার ভাষা বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে! এই ভাষা সংস্কৃতের ন্যায় মধুর; এই ভাষা সর্ব্বতোভাবে ভারতের উপযোগী। কেন উপযোগী, সে কথা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়। পূর্ব্বে আমরা

এই বিষয়ের কতক আলোচনা করিয়াছি, ভবিষ্যতে পৃথক প্রবন্ধে আবার করিব। বাঙ্গালা ভাষা এখন সজীব ভাষা। বাঙ্গালা ভাষা যে কালে ভারতের ভাষা হইবে, "Survival of the Fittest" মতের দ্বারা তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত যে দেশের প্রাচীন ভাষা, সেই দেশে বাঙ্গালা ভাষা যে কালে একপ্রাণতার মূল সোপান হইবে, এ কথায় আমাদের মনে সন্দেহ নাই। হিন্দি, উড়িয়া, বা আসামী ভাষা, এ সকলই একরূপ বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ। বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণের অধিকাংশ বিষয়ে মিল আছে। সামান্য সামান্য অমিলে কিছু আসিয়া যায় না। হিন্দিভাষা যে কালে ভারতের ভাষা হইবে না, তাহার কারণ, এই ভাষার তেমন উৎকর্ষ বা উন্নতি নাই। বাঙ্গালা ভাষাই এখন ভারতের জীবিত ভাষা—এই ভাষারই উন্নতি হইতেছে। এই ভাষা ভারতের নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় কালে ভারতকে সার্ব্বভৌম রশ্মিজালে ঘিরিবে, আশা আছে। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক।

আমাদের নিকট কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, ভারতের প্রকৃত মহাপুরুষ কাহারা? আমরা বলিব, যাঁহারা ভারতে ভাষার সংস্কার এবং উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কেহ যদি বলেন, কাহাদের নাম জগতে স্থায়ী হইবে? আমরা এক কথায় বলিব—যে সকল দীন দরিদ্র গ্রন্থকার অনাহারের ক্লেশ ও নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা মস্তকে বহন করিয়াও এই প্রাণের ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন করিতেছেন, তাঁহারাই এদেশের প্রকৃত মহাপুরুষ; তাঁহাদের নামই জগতে থাকিবে। ধর্ম্মহীন সমাজ-সংস্কার বা রাজনীতির সংস্কারের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহাদের নাম আজ আছে, আর ত্রিশ বৎসরের পর থাকিবে না। কিন্তু যাঁহারা জাতীয়ত্ব গঠনের মূলভিত্তিতে চুণ সুরকি ঢালিতেছেন, অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভে তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইতেছে। আজ তাঁহারা অজানিত, লুক্কায়িত অন্ধকারে বসিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যাইতেছেন, তাহাই এ দেশের ভাবী ভাষার মূল বীজ। আজ তাঁহারা অপদস্ত, কিন্তু সময়ে তাহাদের গৌরবে এ দেশ গৌরবান্বিত হইবে।

আমাদের এখন কর্ত্তব্য, ভারতে ভাষার সংস্কার করা। ইহাই একমাত্র সঞ্জীবনী শক্তি। যাহার যে শক্তি থাকে, এই মহা ব্যাপারে ঢালিয়া দেও। এই মহাযজ্ঞে ভারতকে আহ্বান কর—নচেৎ উন্নতি, মিলন, অসম্ভব,—স্বপ্নের কাহিনী।

প্রাণের কথা ব্যক্ত করিতে না পারিলে মিলন অসম্ভব। প্রাণের ভাষা

ভিন্ন প্রাণের কথার প্রকাশ হয় না। কোথায় সেই ভাষা পাই, যাহার সাহায্যে প্রাণকে খুলিয়া দেখাইতে পারি? এখনও বাঙ্গালা ভাষা অসম্পূর্ণ। আমরা এক কথা বলি, লোকে অন্য কথা বুঝে। ইংরাজী পরের ভাষা—তাতে প্রাণের কোন গূঢ়ভাবই বলা যায় না, বলা সম্ভব নয়। উহাকে স্বদেশের করিয়া লইতে পারিলে হয় কি না, জানি না; কিন্তু তাহা অসম্ভব। প্রাণের কথা কোন্ ভাষায় তবে ব্যক্ত করি? কোন্ কথা কাকে বুঝে? কোন্ ভাবে লোক মজে?—কিছুই ঠিক নাই। তবে কে যেন একটা স্বপ্নের স্বরে বলিতেছে, এই বাঙ্গালা ভাষাই প্রাণের সুখ সংবাদ—মধুর হইতেও মধুর, হৃদয়ে হৃদয়ে যেন কি মধুর স্বর ঢালিতেছে। এই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি এখনও লোকের আদর নাই, তাহা জানি। এখনও ভারতের অসংখ্য জাতি ইহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তাহাও জানি। জানি, পর-মুখাপেক্ষী, ইংরাজির নকল-নবিস অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ইহার প্রতি অনাস্থাবান। কিন্তু যখন কতিপয় উৎসাহী গ্রন্থকার এবং এইরূপ উৎসাহদাতা সভাসমিতির একান্ত একাগ্রতা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের প্রতি তাকাই, তখন হৃদয় আশায় মাতোয়ারা হয়। বাঙ্গালী জাতি বুদ্ধিবিদ্যায় ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি। এই জাতির প্রতিভা-প্রসূত কীর্ত্তিকলাপ যে ভারতের সমগ্র জাতির উপর যশ-পতাকা উড়াইতে সমর্থ হইবে, ইহাতে নিরাশার কথা নাই। বাহুবলে নহে, ঐশ্বর্য্যবলে নহে, কিন্তু প্রতিভা বলে এই জাতি সকলের শ্রেষ্ঠ। এই সময় হইতে সকলে যদি স্বদেশের হিতব্রত গ্রহণ করিয়া ভাষা-সংস্কাররূপ মহাযজ্ঞে জীবন উৎসর্গ করেন, কালে দেশের একতার মূল দৃঢ়ীভূত হইবে। মহামতি স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমরা বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হই। বিধাতার কৃপায় কালে মহা সুফল ফলিবে। জাতীয় ভাষার উন্নতিকল্পে, বঙ্গবাসি, প্রাণ, মন উৎসর্গ কর। জাতীয় ভাষার উন্নতি না হইলে জাতীয় মিলন বা একতা অসম্ভব। জাতীয় মিলন ভিন্ন জাতির উন্নতি অসম্ভব।*

---

* এই প্রবন্ধটি সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয়ের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন কালে পঠিত হইয়াছিল।

কে শত্রু, কে মিত্র।

এই বিস্তৃত পৃথিবীর মধ্যে কে কাহাকে শাসন ও তিরস্কার করিতে বা উপদেশ দিতে অধিকারী?—না—যে যাহাকে ভালবাসে। যে যাহাকে ভালবাসে না, যে যাহার মঙ্গল চায় না, সে তাহার কোন ছিদ্র দেখাইয়া তিরস্কার করিতে অধিকারী নয়। পিতা পুত্রকে তিরস্কার বা শাসন করিতে অধিকারী, কেননা, পিতা পুত্রকে ভালবাসে। বন্ধু, বন্ধুর দোষ সংশোধনের জন্য যত্ন করিতে অধিকারী, কেননা, বন্ধু বন্ধুর মঙ্গল চান। যে যাকে ভলেবাসে না, তার শাসন বা তিরস্কারে কোনই উপকার দর্শেনা। এই যে পিতা বা বন্ধু, সন্তান বা বন্ধুর মঙ্গলের জন্য সময়ে সময়ে শাণিত অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন; ইহার মধ্যে কি তাহাদের কোন ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বার্থ আছে? না, অনেক স্থলেই তাহা থাকে না। যার মধ্যে ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বার্থ আছে, সে অন্যের শাসন করিতে বা অভাব দেখাইতে অধিকারী নয়। আপনাকে যে অন্যের মঙ্গলের জন্য বিসর্জ্জন দিতে না পারে, অথবা যে অন্যের মঙ্গলের সহিত একাত্মক না হইতে পারে, সে অন্যকে শাসন করিতে বা উপদেশ দিতে অধিকারী নয়। প্রেমমূলক শাসন ভিন্ন অন্য শাসনে পৃথিবীর মঙ্গল নাই।

মহাত্মা ঈশার জীবনে দুটী বিসদৃশ ভাব দেখা যায়। একদিকে তিনি উপদেশ দিতেন,—শত্রুকেও ভালবাসিবে এবং যে তোমার বাম গণ্ডে আঘাত করিবে, তাহাকে তুমি দক্ষিণ গণ্ড ফিরাইয়া দিবে (১)" "বারম্বার তুমি বন্ধুর অপরাধ ক্ষমা করিবে (২)," তিনিই স্থানান্তরে ফেরুসী ও সাডিউসি-

---

(১) But I say into you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you.

Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you.

And unto him that smiteth thee on the one cheek, offer also the other.

St. Luke, Chap. VI. 27, 28, 29,

(২) Then came Peter to him, and said Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?

Jesus saith unto him, I say not unto thee Until seven times, but Until seventy times seven. St. Mathew. Chap. XXIII-21-22,

দিগকে কত তীব্র তিরস্কার, কত গালাগালি দিতেন (৩)। যে খ্রীষ্ট নিজের বিচারের সময় একেবারে নির্ব্বাক ছিলেন, আত্মরক্ষার জন্য একটী কথা বলেন নাই, তিনিই, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন ভ্রাতা চলিতেছেন, কি কপটতার বেশ পরিধান করিতেছেন দেখিলে ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন। এই বিশদৃশ চিত্রে আমরা কি শিক্ষা পাই? এক সময়ে যিনি সিংহের ন্যায় তেজে অন্যকে তিরস্কার করিতেছেন, তিনিই সময়ান্তরে মেষশাবকের ন্যায় কোমলস্বভাব। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? খ্রীষ্টের জীবনের এই দুটী ভাবে আমরা প্রধানত এই শিক্ষা পাই, যেখানে তাঁর নিজের স্বার্থ, নিজের লাভালাভ, সেখানে তিনি নীরব। কিন্তু যেখানে তাঁর পিতার জিনিসের অবমাননা বা অন্যের অনিষ্ট, সেখানে তিনি সিংহাবতার। পিতার বিরুদ্ধে মানুষকে চলিতে দেখিলে, কপটতার আচ্ছাদনে লুকাইয়া কাহাকেও অমঙ্গল করিতে দেখিলে তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন;—মানুষ নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতেছে দেখিলেও তিনি অধীর হইতেন। ফেরুসী ও সাডিউসিদিগকে যিনি তীব্র নিন্দা করিতেন, তিনিই পতিত বেশ্যাকে আদর করিয়া হৃদয়ের প্রেমালিঙ্গন দিতেন। এরূপ কেন করেন, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"এক দল কপটী, আর একদল নিজ কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত।" অনুতপ্ত ব্যক্তির জন্য তাঁর প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত, কিন্তু কাহাকেও কপটতা আচরণ করিতে দেখিলে ক্রোধে অধীর হইতেন। আপন সন্তানের দোষ দেখিলে যে প্রেমিক পিতা ক্রোধে অধীর হন, তিনিই সময়ান্তরে শত শত লোকের দোষ উপেক্ষা করেন। ইহারই বা কারণ কি? কারণ এই, শিশু যে পিতার আপন জিনিস,—ঈশ্বরের সন্তান. পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক। শিশুর দোষ বা ত্রুটী পিতার প্রাণে অসহ্য। এখানে পিতার ব্যক্তিত্বপূর্ণ কোন স্বার্থ নাই, এখানে তিনি কেবল অন্যের মঙ্গল কামনা বা ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত।

মানুষ যখন সৎইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্যকে তিরস্কার করে,

(৩) See Mathew, Chap XXIII. 13, 14, 15,16 to 28

(৪) And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.

And he answered him to never a word in so much that the governor marvelled greatly. St. Mathew, XXVIII. 12 to 14.

তখন স্বর্গ সেখানে অবতীর্ণ হয়। এইরূপ তিরস্কার না থাকিলে, সমাজের কোন প্রকার উপকার হইত না। সন্তানের সমক্ষে পিতার তিরস্কার রূপ শাণিত অস্ত্র যেমন মঙ্গলের একমাত্র সোপান, জাতি এবং সমাজের সমক্ষে তেমনি তীক্ষ্ণশাণিত অস্ত্রাধারী সমালোচকেরও নিতান্ত প্রয়োজন। যে অন্ধ হইয়া খোসামুদী করে, বৃথা প্রশংসায় করতালি দেয়, তার চেয়ে, যে দোষ প্রদর্শন করে, সে অধিক উপকারী। সে বন্ধু বন্ধুই নয়, যে কেবল প্রশংসা বা স্তুতিবন্দনা করিয়া বন্ধুর প্রাণে অহঙ্কারের বীজ বপন করে; কিন্তু সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু, যে দোষ প্রদর্শন করে, এবং তাহা সংশোধনের পথ দেখাইয়া দেয়। এই প্রলোভনপূর্ণ সংসারে মোহ মায়ার অধীন মানুষ পদে পদে পদস্খলিত হয়। সব সময়ে নিজের দোষ ক্রটী মানুষ দেখিতে পায় না; মোহ মায়ায় সে আচ্ছন্ন থাকে। বন্ধুরাই এ সময়ে দোষ প্রদর্শন করিয়া সৎপথ প্রদর্শন করেন। এই জন্য, ব্যক্তি সম্বন্ধে এবং সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ উপকারী বন্ধুর নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপ সমালোচক বন্ধু জগতে না থাকিলে জগতের কোনরূপ উন্নতি হইত না।

ইংলণ্ডের অভ্যুদয়ের ও উন্নতির মূল কারণ যাঁহারা নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন এবং অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, রাজনৈতিক জগতে লিবারল (উদার-নৈতিক) ও কন্‌সারভেটিভ (স্থিতিশীল) দলের পরস্পর শত্রুতা আচরণের জন্য ও দোষ ক্রটি প্রদর্শনের জন্যই ইংলণ্ডের গৌরব এত বৃদ্ধি হইয়াছে। সেখানে উভয় দলেই মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণের অভ্যুদয় হইয়াছে (১)। যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাস পাঠ ও আলোচনা করিয়াছেন,তাঁহারাও জানেন যে, প্রবল জন সাধারণের উত্তেজনা, কঠোর সমালোচনা এবং নির্যাতনে এই ধর্ম্মের কত উন্নতি হইয়াছে। মহাপুরুষদিগকে জীবন-পরীক্ষার অটল ভিত্তিতে এই সকল লোকেরাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা দোষ প্রদর্শন করে, তাহারাই যেন উন্নতির পথ-প্রদর্শক। আপন মতের বা চরিত্রের দোষ নিজের পক্ষে দেখা সব সময়ে সম্ভবপর নয়। এই জন্যই, সমালোচক বা দোষ-প্রদর্শকের প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের স্বভাব এই, সে আপন দোষ শুনিলে ক্রোধে অধীর হয়। এই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে উন্নতি সুদূর-পরাহত হইয়া পড়িতেছে, দেশের হীনাবস্থা ঘুচিতেছে না।

(১) See English Politics and Party Leaders, Vol 1.

পৃথিবীতে একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা, যাহা আছে, কেবল তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চান;—অনন্ত উন্নতির পথ ধরিতে চান না। অনন্ত উন্নতির পথে যাইতে হইলে অনন্ত অভাব-বোধ নিতান্ত প্রয়োজন। হইল না, পাইলাম না, যাহা করা উচিত ছিল, তাহা করা হইল না—এইরূপ অনন্ত-পিপাসা প্রাণে না জাগিলে মানুষ অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে ধাবিত হয় না, সুতরাং উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যাহা পাইয়াছি,—খুব পাইয়াছি, খুব জ্ঞানী হইয়াছি, খুব ধার্ম্মিক হইয়াছি,—খুব কাজ করিয়াছি, উন্নতির আর বড় কিছু বাকী নাই,—এই পরিতৃপ্তি-বোধ জন্মিলে মানুষ কেন বলত আর উন্নতির জন্য লালায়িত হইবে? কিন্তু, কি জানি কেন, মানুষ আত্ম-তৃপ্তি, আত্ম-প্রশংসা, আত্ম-গরিমা লইয়াই থাকিতে ভালবাসে, অভাবের কথা শুনিতে সে নিতান্ত বিরক্ত। সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়া অহঙ্কারী মানুষ মনে করে, কত বড় জ্ঞানী হইয়াছি; সামান্য একটু দেশের হিতকর কার্য্য করিয়া ঢোল ঢাক কাঁদে করিয়া দেশে বিদেশে প্রচার করে—কত মহৎ কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি। যেন সেরূপ মহৎ কার্য্য আর কেহ কখনও করে নাই! নিজের মুখেই নিজের প্রশংসা, নিজের পত্রিকাতেই নিজের গৌরব-ঘোষণা! কিছু কাজ না করিয়াও কত ব্যক্তি কর্ম্মার শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া বেড়ায়! লম্বা লম্বা বক্তৃতা, উচ্চ উচ্চ কথা, তাহাদের মুখে সর্ব্বদা শোনা হয়। ধর্ম্মপ্রচারক দীর্ঘ দীর্ঘ প্রার্থনা দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ করে, দেশ-সংস্কারক উচ্চ কথার দ্বারা নিজের কীর্ত্তিকলাপের গুণ কীর্ত্তন করিয়া জীবনকে সার্থক করে, এদিকে তাহাদের চরিত্রহীনতার দুর্গন্ধে আকাশ যে পরিপূর্ণ, তাহা একবারও ভাবে না। যাহা করিবার ছিল, সব যেন করা হইয়া গিয়াছে;—আর যেন কিছুই করিবার বাকী নাই! ইহাদের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে কথা বল, তোমার প্রতি সকলে ক্রোধান্ধ হইবেন, এবং যে কোন রূপেই হউক, তোমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিয়া মহা অনিষ্ট সাধন করিবেন। এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াই খ্রীষ্ট অকালে ক্রুস কাষ্ঠে দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ম্যাট্‌সিনি কারাবাসী হইয়াছিলেন, রবার্ট এমেট অকালে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন! হায়! পৃথিবীর কত সোণার চাঁদ এইরূপ মানুষের উপকার করিতে যাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! পৃথিবী! বুঝিল না, কে প্রকৃত শত্রু, কে বা মিত্র।

আর একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা প্রতিনিয়ত অতৃপ্তির আগুনে জর্জ্জরিত। কিছুই হইল না, কিছুই পাইলাম না—তাঁহাদের কথা এইরূপ। জ্ঞানরাজ্যে নিউটন, ভাবরাজ্যে শ্রীরাধিকা; প্রেমরাজ্যে শ্রীচৈতন্য ও সেবার রাজ্যে হাওয়ার্ড, ম্যাট্‌সিনী, পার্কার ইত্যাদি। ইঁহারা এই অনন্ত অতৃপ্তির ভিতর দিয়া উন্নতির অনেক উচ্চ সোপানে উঠিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে ইঁহাদের ন্যায় লোক অতি বিরল।

আমরা দেখিতেছি, আমাদের দেশে প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকই অধিক। যে দিকে চাই—দেখি, যে যাহা করে, তাহাতেই সে তৃপ্ত;—আর যেন কিছুই করিবার নাই! ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা প্রেমহীন চরিত্রহীন হইয়া দিন দিন ঝগড়া বিবাদের ভীষণ অনলকুণ্ড সৃজন করিয়া তাহাতে দগ্ধ হইতেছে, তবুও ভাবে, বেশ উন্নতি হইতেছে! ব্রাহ্মপ্রচারক বক্তৃতা করেন,—"খুব উন্নতি হইতেছে, যাহা আশা করা যায় নাই, তাহা হইয়াছে।" অহঙ্কার, বিলাসিতা সব সাধুতা, নিষ্ঠা, চরিত্র ও পুণ্যের সৌরভ বিলোপ করিল, তবুও অশান্তি নাই, অনুতাপ নাই, উদ্ধারের জন্য ব্যাকুলতা নাই,—প্রাণে অনন্ত অতৃপ্তি-বোধ নাই। কেমনে উন্নতি হইবে বলত? হিন্দু সমাজের মধ্যে কপটতা দিন দিন ভয়ানক রূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। যার যা ইচ্ছা করিতেছে, এবং লোক জিজ্ঞাসা করিলে অম্লানচিত্তে অস্বীকার করিতেছে;—অখাদ্য খাইয়া, অনাচার কদাচারে কলুষিত হইয়াও "না" কথার সাহায্যে রক্ষা পাইতেছে। এদিকে পুনরুদ্ধারকারী প্রচারকেরা বলিতেছেন—"হিন্দুধর্ম্মের খুব উন্নতি হইতেছে, কিছুই অবনতি নাই।" দেশ-সংস্কারক যাহারা, তাহারা গগন কাঁপাইয়া বক্তৃতা করিয়া দেশোদ্ধার করিতে চাহিতেছে—কিন্তু দুঃখী দরিদ্রের প্রতি সহৃদয়তা, দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা, হায়, সে সকলের বড়ই অভাব। কিছু কাজ না করিয়াও তাহারা বাহাবা পাইতেছে, নিজেদের প্রশংসা নিজেরাই অসঙ্কুচিত চিত্তে আপন আপন সংবাদপত্রে ঘোষণা করিতেছে! যদি কেহ কোন বিরুদ্ধ কথা বলে, অমনি তাহাকে ধরিয়া ফাঁসি দিতে প্রস্তুত! হা ধর্ম্ম, হা দেশোপকার-ব্রত, তোমাদের আজ এ কি হীনাবস্থা দেখিতেছি!! কোথায় মানুষ ঈশ্বরে মনপ্রাণ সঁপিয়া, স্বার্থ ও সংসার-কামনা বিরহিত হইয়া কাজ করিবে;—না এখন দেখি, মানুষ সংসারকে মন প্রাণ সঁপিয়া, দুটা চারটা ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান লইয়া মাতামাতি করিতেছে, বাহাদুরী দেখাইতেছে!

মন তাঁতে, কাজ এখানে ;—না—মন এখানে, দুই চারিটা অনুষ্ঠান তাঁর! এতে আর কি হইবে বলত? আমরা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে দুই চারিটী অভাবের কথা বলিয়াছি,—জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধেও দুই দশটী কথা বলিয়াছি। ভালবাসি, এবং উন্নতি চাই বলিয়া অভাবের কথা বলিয়াছি। বলি হিতৈষি, তাতে তুমি এত বিরক্ত হও কেন, বলত? তোমাদের কোন অভাব না থাকে, এই গরীবের কথায় কর্ণপাত করিও না, আর যদি প্রকৃত পক্ষে অভাব থাকে, তবে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে না কেন? আমরা বৃথা কেবল খোসামুদী করিব?—কেবল প্রশংসা করিব? না—তা পারিব না। কাজ দেখি না, জীবন দেখি না, নিঃস্বার্থতা দেখি না ;—যা দেখি, কেবল হই-চই। হই-চই করিয়া দেশোদ্ধার করিবে, ভাবিয়াছ? তাহা হইবে না। কাজ না করিয়াও যে প্রশংসার জন্য লালায়িত, তার প্রশংসা না পাওয়াই উচিত। বিশেষত সে কাজের ভার নিজেরাই যখন গ্রহণ করিয়াছ, তখন আর সেজন্য চিন্তা কি? নিজেদের পত্রিকায়ই যখন নিজেদের প্রশংসা গাইতে শিখিয়াছ, তখন আর ভয় কি? প্রশংসার ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে, চতুর্দ্দিকের মানুষ হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতেছে, কি যেন একটা ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু হায় কোথায় বা কাজ, কোথা বা উন্নতি! উন্নতির চেষ্টা করিতেছ?—সে ভাল কথা, কিন্তু উন্নতির পূর্ব্বভাস যে আপন অভাব স্মরণ করা, আত্মত্যাগ করা, তাহা একবার ভাবিবে না কেন? তোমরা তোমাদের অভাব দেখ না, স্বার্থ ছাড় না, তাই তোমাদের অপযশ গাই। জাতীয় মহাসমিতিতে যাইয়া যাঁহারা মূকের ন্যায় বসিয়াছিলেন, কোন কাজই করেন নাই, তাঁহাদেরও প্রশংসার স্তুতিবাদে আকাশ ফাটিতেছে! না জানি, কিছু কাজ করিয়া আসিলে বা দেশোদ্ধার হইলে কি না হইত! যে প্রকৃত কাজ করে, বিনয়ে তার মস্তক নত নয়, সে মনে করে, যাহা করা উচিত ছিল, তাহার কিছুইত করা হয় নাই। আর যে কিছু না করে, তাহারই যত বাহাদুরী। প্রকৃত হৃদয়বান ব্যক্তি বৃথা বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ প্রশংসা চান না, কিন্তু অকর্ম্মা চুণাপুঁটিদের প্রশংসা না করিলে তাহারা অমনি মুখভার করে, কত কথাই বলে। ছি, এ কিরূপ ব্যবহার! তোমরা অহঙ্কারে যদি আটখানি না হইতে, কিছু ব্রত বা কর্ত্তব্যপালন না করিয়াও যদি করিয়াছ বলিয়া জগতে ঘোষণা না করিতে;—এইরূপ হই-চই দ্বারা যদি

মাতৃঋণ পরিশোধ করিতে না চাহিতে, তবে আমরাও কোন কথা বলিতাম না। কিন্তু যে ভাবে তোমরা ঘুরিতেছ, ফিরিতেছ, ইহার তীব্র প্রতিবাদ না করিলে আমাদের কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু মনে রাখিও, আমরা তোমাদিগকে ভালবাসি বলিয়াই তোমাদিগকে দেশের অনন্ত অভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিই। বুঝ আর না বুঝ, আমরা আত্মীয় বলিয়াই তোমাদের দোষের, ও দেশের অভাবের উল্লেখ করি। তাতে যদি বিরক্ত হও, নাচার, কি করিব! প্রকৃত কথা বলিতে কি, যতদিন আমাদের দেশের প্রচারকেরা, দেশ-সংস্কারকেরা, দেশের হিতৈষীরা দোষের কথা, অভাবের কথা শুনিলে ক্রোধান্বিত হইবেন, ততদিন বুঝা যাইবে যে, তাঁহারা কেবল দেশের লালসায় ও স্বার্থ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত,—নচেৎ কেন দোষের কথা শুনিতে পারেন না? যতদিন তাঁহারা দোষপ্রদর্শনকারীকে প্রকৃত বন্ধু জানিয়া কোল পাতিয়া উদার-বক্ষে আলিঙ্গন করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহারা যে যশ মান পিপাসু, একথা বলিবই বলিব। প্রকৃত গুণের পুরস্কার কোথায় না হইয়াছে? প্রকৃত গুণ থাকে, মহত্ত্ব থাকে, আপনি তাহা জগতে প্রচারিত হইবে;—সে জন্য এত ব্যতিব্যস্ত কেন? প্রশংসার কিছু থাকে, দশ মুখে অন্যে প্রশংসা করিবে, সে জন্য চিন্তা কি? মানুষ, তুমি যদি প্রশংসার স্তুতিবাদ না ভুলিয়া যাইতে পারিলে, তবে তোমার দেশ-হিতৈষিতা বা ধর্ম্ম কর্ম্ম যে কেবল কথার কথা, তাতে আর সন্দেহ নাই। যদি মানুষ হও, অনুসন্ধান করিয়া, যে যে ব্যক্তি দোষ বা ছিদ্র বাহির করিয়াছে, সৈয়দ আমেদই হউন, আর লর্ড ডফারিণই হউন, তাঁহাদিগকে আনিয়া প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় পূজা কর। মনে রাখিও, যে স্তুতিবাদ করে, সে অহঙ্কারের রাজ্যের পথ-প্রদর্শক; আর যে অভাব দেখায়, সে উন্নতির পথ-প্রদর্শক। বিনীত হৃদয়ে তাঁর পূজা কর। নিশ্চয় বলিতেছি, চাটুকারিতা, আত্ম-প্রশংসা না ভুলিতে পারিলে, তোমার এই কঠোর দেশহিতকর ব্রত গ্রহণের অধিকার নাই।

বড়ই দুঃখের বিষয়, শিশু যাহা বুঝে, আমাদের দেশের প্রবীণ ব্যক্তিরাও তাহা বুঝে না। শিশুকে বারম্বার মা প্রহার করিলেও শিশু মা মা বলিয়া কাঁদিয়া মাকে ধরিয়া আদর করে;—একবারও সে ভাবে না যে, মা পর। আমাদের দেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের কোন দোষের কথা বলিলে তাঁহারা মনে করেন যে, এ ব্যক্তি আমাদের শত্রু! যে ব্রাহ্মসমাজের

উন্নতি আমাদের জীবনের লক্ষ্য, সেই ব্রাহ্মসমাজের দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজের শত্রু বলিয়া অভিহিত হইয়াছি! জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে কয়েক বৎসর কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি বলিয়া মহাজনেরা মনে করিতেছেন, আমরা জাতীয় মহাসমিতির শত্রু, সুতরাং দেশের শত্রু। গভীর প্রাণের টানে, ভালবাসার আকর্ষণে যে এই গুরুতর অভাব প্রদর্শন করিয়াছি. কপটতার জাল মুক্ত করিয়া দিয়াছি, এ কথার বিচার কে করিবে, এ কথা কে বা বুঝিবে !!

ব্রাহ্মসমাজের ও জাতীয় মহাসমিতির বিজয়ঢক্কা যাঁহারা গভীর গর্জ্জনে বাজাইতেছেন, তাঁহাদিগকে একান্ত অনুরোধ করি, আত্মানুসন্ধান করুন, দেশের অভাবরাশির বিষয় পর্য্যালোচনা করুন, আত্ম-প্রশংসা ও আত্ম-কামনা, যশ মানের লালসা ভুলিয়া, দেশের অনন্ত অভাব রাশির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সেই সকল অভার দূর করিতে চেষ্টিত হউন। কেবল ভিক্ষা-নীতি অবলম্বনে দেশোদ্ধার হইবে না। আপন আপন কর্ত্তব্য পালনে, অভাব দূর করিতে চেষ্টিত হউন। নীতি, পুণ্য ও চরিত্র লাভ করুন, দরিদ্রের অভাব দূর করুন, অহঙ্কার ও বেশ ভূষা ছাড়িয়া সাধারণ লোকের সহিত একাত্মক হউন, কপটতা পরিহার করুন, বৃথা হই-চই, বাহ্যাড়ম্বর পরিহার করিয়া প্রকৃত কর্ত্তব্য পালনে বদ্ধপরিকর হউন। দেশের উন্নতির জন্য জীবনকে আহুতি দিন—স্বার্থ বিসর্জ্জন দিন, প্রকৃত বীরের ন্যায় কার্য্য করুন। দেশের অভাব দূর হইবে, ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবে। তখন বুঝিবেন—কে শত্রু, কে বা মিত্র;—কে আপন, কে বা পর। সেই দিন অভাব-স্মরণে অনুতপ্ত, সুতরাং অনন্ত উন্নতির অধিকারী হইবেন।

জাতীয় মহাসমিতি। *

(১)

এবার মান্দ্রাজের পালা,—মান্দ্রাজ সহরে খুব ধুম ধামের সহিত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। যাহা জাতীয়, তাহাই আদরের। কাজেই

* ১২৯৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে লিখিত।

মহাসমিতি অল্পে অল্পে এদেশে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। প্রতিপত্তি লাভের কথাও বটে। এক বৎসর, দুবৎসর, তিন বৎসর চলিয়া যাইলেও যাহার অস্তিত্ব লোপ পাইল না, বরং এক গুণ উৎসাহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইতে চলিল, সে সভা যে এই হুজুগ-প্রিয়তার দিনে সর্ব্ব সাধারণের আদর পাইবে, তাহা বিচিত্র নয়। বিশেষত কে কবে মনে করিতে পারিয়াছিল যে, এক-প্রাণতার স্বর্গীয় মনোমোহন ছবি ভারতে এত শীঘ্র দেখা যাইবে? আজ হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান, —দেশ কাল, জাতি সম্প্রদায় ভুলিয়া এক মহা যজ্ঞে আহূত,—এক মহাব্রতে ব্রতী। ইতিহাসের উজ্জ্বল ঘটনা,—স্বপ্নের অতীত চিত্র। ভারতে আজ স্বর্গের বিজয় ভেরী বাজিতেছে। আজ ভাই ভাই একপ্রাণ, একহৃদয়— আজ ভারতে একতার স্বর্গীয় ছবি প্রস্ফুটিত। এই আনন্দের দিনে গৃহে গৃহে আনন্দের কোলাহল—দেশে দেশে আনন্দের শুভবার্ত্তা। ধন্য ভারত, ধন্য ইংরাজী শিক্ষা!

মান্দ্রাজ সহর মহাযজ্ঞের আয়োজনে আজকাল খুব ব্যস্ত। অতিথি-সেবা ভারতের এক প্রাচীন কীর্ত্তি। মান্দ্রাজ অতিথি সেবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন। চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিনিধিগণ মান্দ্রাজাভিমুখী হইতেছেন। চতুর্দ্দিকে মহা আয়োজন চলিতেছে। শিক্ষিত সমাজ আজ জাগরিত; বেশ ভূষায় সজ্জিত। ভারত আজ পৃথিবীকে আহ্বান করিয়া যেন ডাকিয়া বলিতেছেন—দেখ আবার আমার একতার দিন, আবার সত্যযুগ আসিতেছে। পৃথিবী চকিত হইয়া ঐ দিকে উকি ঝুকি মারিতেছেন। সাহেব মহলে একটু ফিস্ ফাস্ চলিতেছে—ইংলণ্ডের যেন একটু মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডও একটু সচকিত হইয়া উঠিতেছেন। আর পৃথিবী? পৃথিবী কেবল আশার কাহিনী শুনিবার জন্য কর্ণ উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন।

শিক্ষিত সমাজ জাগরিত—আর অশিক্ষিত সমাজ?—ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে। হাসে, নাচে, গায়, মাতে—সকলই শিক্ষিত শ্রেণী, কিন্তু অশিক্ষিত সমাজ?—যে নিদ্রিত, সেই নিদ্রিত। দলে দলে শিক্ষিত শ্রেণী আজ চলিয়াছেন,—কিন্তু নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধি, একটী মোড়ল বা একটী সর্দ্দারও যাইতেছেন না। গ্রাম্যসমিতির কথাই বল, বা প্রজা সভার আন্দোলনের কথাই পাড়,—এ দেশের নিম্ন শ্রেণীর গতি মুক্তি নাই। এক

দিন, দুদিন, তিন দিন বল, তাদের জন্য একটু খাটিতে পারি, কিন্তু চিরকাল তাদের জন্য কে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া থাকিবে বলত ?—সুতরাং তাহাদের আর জাগরিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা না জাগিলে ভারতই বা কেমনে জাগিবে ? তাই দেখ, ভারত জাগিয়াও আজ জাগে না। তাই দেখ, ভারত হাসিয়াও হাসে না। কি যেন বিষাদ-রেখা এই শুভ দিনেও দেখা যাইতেছে। মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন—"এদেশের নিম্ন শ্রেণীর গতি না ফিরিলে দেশের গতি ফিরিবে না। নিম্নশ্রেণীর গতিও ফিরিবেও না, সুতরাং দেশের মঙ্গলও হইবে না।" বাস্তবিক যে দেশের পনের আনা লোক অশিক্ষিত, যে দেশের পনের আনা লোক মহা কালনিদ্রায় নিদ্রিত, (১) সেই দেশের পরিণাম ভাল হইবে কিরূপে ?—আমরা কিছুই জানি না। পৃথিবী, এই নিম্ন শ্রেণীর গতি ফিরে কি না, দেখিবার জন্য চাহিয়া আছেন। ভারত কি উত্তর দিবে ?

মহাসমিতি সাধারণের অশিক্ষার অন্ধকার দূর করিবার কি একটা উপায় করিবেন না ?—আমরা এখনও কিন্তু তাহার বড় কিছু পরিচয় পাইতেছি না। লাট সভায় দেশের প্রতিনিধি পাঠানের কথা, স্বায়ত্তশাসনের কথা, সিবিল সার্ব্বিসের কথা, স্বেচ্ছাসৈনিকের কথা—ইত্যাদি যে কথার আলোচনা কর, এ সমস্তই শিক্ষিতদের সুবিধার কথা মাত্র। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য কোন কথা নয়। যদি বল কেন, এ সকলে তাহারা প্রতিনিধি দিক্ না কেন ? প্রতিনিধি দিবে বা কে ? তাদের ডাকে বা কে ? তাহারা যে মহা নিদ্রায়, না জাগাইলে তাহারা কখনও উঠিবে না। এখন কথা এই, ডাকে কে, তাদের জন্য খাটে কে ? এক সময়ে আশা ছিল, শিক্ষিত লোকেরা অশিক্ষিত লোকদিগের শিক্ষার অভাব ঘুচাইবে। কিন্তু সে আশার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে ; এখন দেখিতেছি, শিক্ষিত ব্যক্তিরা জোট বাঁধিয়া

(1) General statement showing the Educational attainments of the people of Bengal.——

Under instruction.	Not under instruction.	
	Able to read and write	Unable to read and write.
Males—2·92 Per cent,	5·77	91· 29
Females ·10 Per cent.	·17	99· 72

Census Report, Bengal, 1881. Vol. I. P. 190.

শিক্ষিতদের সুবিধা করিবার জন্যই ব্যতিব্যস্ত। কাজেই বলি, এ মহাসভাকে জাতীয় মহাসমিতি নাম না দিয়া, শিক্ষিতদের মহাসমিতি নাম দিলেই ভাল হয়।

এ স্থলে আমাদের মনে একটী কথা জাগিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা কোন এক বিরাট প্রজা-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। সে সভায় অনেক প্রজা উপস্থিত ছিল। প্রায় ১৫০০০ হইবে। বড় বড় ব্যক্তিরা অনেক বড় বড় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কেহ ইংরাজীতে, কেহ বা বাঙ্গালায়। যাহারা তাহা শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা অনেকেই তাহা বুঝে নাই। আর অনেকে কিছুই শুনিতে পায় নাই। সভা ভঙ্গ হইলে প্রজারা পরস্পরের নিকট বলাবলি করিতে লাগিল যে, কি হইল? নানা জনে নানা রূপ উত্তর করিল। তন্মধ্যে এক জন বলিল, ইংরাজের রাজ্য এখন বাবুরা হাতে নিতে চান। এই কথাটী শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। বাস্তবিক, এই সভা সমিতিগুলি যেরূপ ভাবে আহুত বা গঠিত হইতেছে, যেরূপ ভাবে ইহাদের কার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হইতেছে, ইহাতে মনে হয়, বাবুরা যেন কি একটা রাজ্য বা পদ-লাভের জন্যই ব্যস্ত। নচেৎ নিম্নশ্রেণীর মঙ্গলের কথা এরূপে উপেক্ষিত হয় কেন? যশ বা পদলাভের প্রস্তাব লইয়াই সকল সভা ব্যস্ত। কি বিভ্রাট!

নিরাশার কথা বলিলাম ত আরো একটু বলি। এটী একটী জাতীয় সভা বটে, কিন্তু আলোচনা হইবে—সকলই বিজাতীয় রকমের। বিজাতীয় ভাষায় কথা চলিবে, বিজাতীয় সাজে সাজিয়া যাইতে হইবে, বিজাতীয় রাজার নিকট অধিকার লাভ করিবার জন্য আবেদনের বন্দোবস্ত হইবে। কিন্তু নাম "জাতীয় মহাসমিতি।—"কি অদ্ভুত সৃষ্টি!"

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "জাতীয় আলোচনা আবার কিরূপ? একটা কি জাতীয় ভাষা আছে?" আমরা বলি, আছে। আর যদি না থাকে, তবে একটা ভাষা সৃষ্টি কর না কেন, চিরকাল পরমুখে কথা বলিবে? আমরা বলি, যাহাতে জাতির অভ্যুত্থান হইতে পারে, তাহাই জাতীয় বিষয়। জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের কথা হউক, জাতির চরিত্র গঠনের প্রস্তাব হউক, জাতির শিক্ষার বন্দোবস্ত হউক, জাতীয় শিল্পের উন্নতির সূত্রপাত হউক, জাতীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের আলোচনা হউক, জাতীয় সাধারণ লোকের উন্নতির চেষ্টা হউক। একেবারে সমস্ত না হয়, ইহার যে কোন একটা হউক। সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য জাতীয় মহাসমিতি দশ

লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া একটা বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্থাপন করুন। জাতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য কুড়ি লক্ষ টাকা তুলিয়া বোম্বে, মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় অন্তত তিনটা বড় শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করুন। বক্তৃতার মিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কাজে মিলন চাই। জাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে না, অথচ বলিবে,জাতীয় মহাসমিতি !! জাতির জন্য কিছু কাজ কর, তবে ত বুঝিব, জাতীয় সভার নামের সার্থকতা। সাহেবকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য, বা সম্মান পাইবার জন্য, বা শিক্ষিত সমাজের অধিকার বিস্তারের জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মিলনের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু সেটা বড় প্রশংসার কাজ নয়। সেটা জাতীয় কাজ মোটেই নয়। এত গুলি প্রবীণ মহা মহা ধনী ও জ্ঞানী ব্যক্তি মিলিত হইয়া, একহৃদয় একপ্রাণ হইয়া খাটিলে ২০।৩০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা বড় একটা কঠিন কথা নয়। যদি তাহা অসম্ভব হয়, তবে জাতীয় অভ্যুত্থানও অসম্ভব। তবে কেন বৃথা আশার ছলনা, মায়ার খেলা দেখাইয়া ভুলাইতে চাও? হিতৈষিগণ, তোমাদের পায়ে ধরি, আমাদিগকে একটু বিশ্রাম, একটু নিদ্রা যাইতে দাও।

কর্ত্তব্যের টানে, প্রাণের বেদনায় এই সকল নিরাশার কথা বলিতেছি। হই-চই-পূর্ণ হুজুগ বা বক্তৃতার ছড়াছড়ি প্রচুর হইয়াছে। এখন একটু কাজের প্রয়োজন। কথায় চিরকাল কে ভুলিবে?—জীবন চাই। নিম্নশ্রেণীর পরিত্রাণের জন্য, উদ্ধারের জন্য কেহ প্রাণ দিতে চাও, এস। নিম্নশ্রেণীর মঙ্গলের জন্য যদি কোন আলোচনা করিতে চাও, এস; বুক পাতিয়া আলিঙ্গন করিব, মাথায় তুলিয়া নাচিব। নচেৎ তোমার আমার স্বার্থপূর্ণ নাচানাচির কথা, যশ উপাধিলাভের কথা, ঐ রাজা-তাড়ানে বা প্রজা-পীড়নের কথা,—ঐ জীবন-শূন্য বক্তৃতা রূপ মহা কলঙ্কের বোঝা, ঐ কর্ম্ম-নাশার জলে ফেলিয়া দাও।

"জাতীয়" শব্দ শুনিতে মিষ্ট, বলিতে মিষ্ট, কিন্তু জাতীয় কার্য্যরূপ মহা ব্রত পালন বড় সোজা কথা নয়। আত্মত্যাগ—স্বার্থত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত না হইতে পারিলে এ ব্রত পালনে কেহই সক্ষম হইতে পারে না। জীবন, প্রাণ,ধন ঐশ্বর্য্য—সব দেশের নামে উৎসর্গ করিতে না পারিলে এ ব্রতে দীক্ষা হয় না। আর সর্ব্ব কামনা পরিহার করিতে না পারিলে, এ ব্রতে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। কিন্তু এদেশের ব্যবস্থা কিছু স্বতন্ত্র। যে ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধির উপায় আবিষ্কারে মজবুত, তার নামই হিতৈষী; এ দেশে

যে ব্যক্তি মূর্খ অজ্ঞানীকে ঘৃণা করিতে পারে, তার নামই মহাপুরুষ! এদেশে জাতীয় ধর্ম্ম বা জাতীয় ভাষার প্রতি যে উপেক্ষা বা ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারে, তার নামই সংস্কারক!! এদেশের পরিণাম কি, বিধাতাই জানেন।

আশায় নৈরাশ হইলে যে কথা বলা সম্ভব, আমরা তাহাই বলিতেছি। এ সকল কথা, উন্মাদের প্রলাপের ন্যায়, আজ কালকার দিনে উপেক্ষিত হইবে, তা জানি। কিন্তু আজ হউক, কাল হউক, এমন দিন আসিবে, যে দিন এই হুজুগ-প্রিয়তার পরিবর্ত্তে প্রকৃত জীবনের অভ্যুদয় হইবে। তখনই ভারতের শুভদিন আসিবে। তখনই ভারত মুখ তুলিয়া হাসিবে। সে হাসিতে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র,—দেশ বিদেশ আনন্দে পরিপ্লুত হইবে।

আর আজ? আজ কাঁদিবার দিন, কাঁদিতেই থাকিব। তোমরা আনন্দই কর, আর যাহাই কর—ঐ দেখ ভারতমাতা কোটী কোটী অশিক্ষিত মলিন জীর্ণ শীর্ণ সন্তান ক্রোড়ে করিয়া নয়ন জলে ভাসিতেছেন! যদি মায়ের ভক্ত সন্তান কেহ থাক,—একবার নিম্নশ্রেণীর দুঃখ স্মরণ কর—অন্তত একবার এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেল। তারপর—ইচ্ছা হয়, জাতীয় মহাসভায় হ্যাট কোট পরিয়া মহানৃত্যে, মহা আস্ফালনে যোগ দিও।

জাতীয় মহাসমিতি।*

(২)

প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন "নব্যভারত" গুরুতর কর্ত্তব্যভার মস্তকে লইয়া বঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন কতজন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গোপনে কত কথাই না বলিয়াছিলেন,—কত টিট্‌কারী—কত উপহাসই না করিয়াছিলেন! মহাত্মা লর্ড রিপণের সময় হইতে যে মৃত ভারতের নবজীবন লাভ হইয়াছে, এ কথা যখন আমরা লিখিয়াছিলাম, তখন এ কথাটী অনেকেরই ভাল লাগে না। এমন কি, অনেকে "নব্যভারত" নামেই বিরক্ত হইয়াছিলেন!! স্বদেশ-প্রেমিক অনেক সহৃদয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তিও

* ১২৯৩ সালের মাঘ মাসে লিখিত।

তখন নব্য-ইটালীর (Young Italy) কথা উপমা স্থলে তুলিয়া উপহাস করিতে একটুও সঙ্কুচিত হন নাই। নব্যভারত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব তিন বৎসর পর যখন উদারচরিত কটন সাহেব ‘নব্যভারত’ (New India) নাম দিয়া ভারতের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন-যুগের মহাকাহিনী, * আপন সরল, তেজো-পূর্ণ, উদার ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলেন, তখন ভারতের মহা মহা পণ্ডিতগণও স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হইলেন !! কটনের ‘নব্যভারতে’ যে সকল কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে, ‘নব্যভারত’ শির্ষক প্রবন্ধে তিন বৎসর পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এ কথা ইংরাজ-ঘেসা শিক্ষাভিমানী বঙ্গবাসী স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত !! সে অতীত কাহিনী এ সময়ে তুলিলাম কেন?—একথার একমাত্র উত্তর এই,—তিন বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে আশার কথা ক্ষীণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম, আজ অংশত তাহারই অনুরূপ চিত্র ভারতে অভিনীত হইতেছে। বর্ত্তমান আনন্দের দিনে, অতীত স্মৃতি জাগাইয়া আজ মহানন্দে নৃত্য করিতে আমাদের ইচ্ছা হইতেছে। নব্যভারতের আজ আনন্দের দিন, ভারতের আজ উল্লাসের সুপ্রভাত। চারি বৎসর পূর্ণ না হইতে এমন সকল শুভ ঘটনা ভারত ইতিহাসে ঘটিতে চলিল যে, আমরা একেবারে আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি! জাতীয় মহামিলন প্রত্যক্ষ দেখিয়া যে আনন্দিত হয় নাই, সে বিলাসের দাস। ভারতের এই ঘটনা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে জাতীয় ইতিহাসে লিখিত থাকিবে।

জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন ভারত-ইতিহাসের একটী সামান্য ঘটনা নহে। যদিও আমরা আবেদন-প্রেরণের তত পক্ষপাতী নহি, যদিও আমরা বাহ্য আড়ম্বরের তত পক্ষপাতী নহি, যদিও আমরা আপন-উন্নতি, জাতির আভ্যন্তরিক উন্নতিকেই এরূপ সভার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত মনে করি, কিন্তু তবু এই ঘটনাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারি না। চতুর্দ্দিকে এক তার বিশ্ববিমোহিনী তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছে,—সাম্যের বিজয়ভেরী নিনাদিত হইতেছে;—হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন; যুবা, বৃদ্ধ; বম্বে মান্দ্রাজ; বঙ্গ এবং পাঞ্জাব আজ এক মহাক্ষেত্রে ভাই ভাই মিলিয়া, পাশে পাশে দাঁড়াইয়া, আবার নবযুগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে,

* "My object in writing this book (New India) is to draw attention to the great changes which are taking place in India—changes political, social, and religious. &c.
H. J. S. Cotton.

.আবার দেশের উন্নতি ঘোষণায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ; এ দৃশ্য ভারতের একটি উজ্জ্বল দৃশ্য ; এরূপ দৃশ্য ভারতে আর কখনও ঘটে নাই। ভারত আশার স্বপ্নে আবার মাতোয়ারা,—আবার মৃতজীবনে নবশক্তির অভ্যুত্থানে ভারত আনন্দ-বিভোরা। ধন্য ভারত,ধন্য ইংরাজি শিক্ষা,ধন্য ব্রিটিস শাসন !!

এতগুলি শিক্ষিত লোক জাতিবর্ণ ভুলিয়া, মান অভিমান দূরে ঠেলিয়া, দেশহিতকর মহাযজ্ঞে আজ স্বার্থাহুতি দিতে ভাই ভাই প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছেন, স্বর্গের এ অপরূপ দৃশ্য দেখিয়াও, যাঁহারা কুটিলভাবে, ঘৃণার চক্ষে, এই উজ্জ্বল ঘটনার প্রতি সঘন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বৃথা গালিগালাজ দিয়া অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় হস্তকে কলুষিত করিতে চাহি না। তবে এই মাত্র বলি যে, তাঁহারাও আমাদের ভাই, আজ তাঁহারা যে দূরে রহিয়াছেন, ইহাতে ঘৃণা অপেক্ষা দুঃখ করিবার অনেক কারণ আছে। দশজন মিলিল ত আর দুজন কেন দূরে রহিল ! হায়, একতার মধুর তন্ত্রী বাজিল ত আবার পর-পর-ভাব, আবার একটু ঘৃণা বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল কেন ? এ কথাটী প্রত্যেক চিন্তাশীল সহৃদয় ব্যক্তিরই চিন্তা করা উচিত। এবং যাঁহারা এই মহাযজ্ঞে মান অভিমান রূপ স্বার্থ আহুতি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর একটু অগ্রসর হইয়া উদার প্রেম-বাহু বেষ্টন দ্বারা বিপথগামী ভ্রাতাদিগকে এই মহা আলিঙ্গন ও এই মহা কোলাকোলির ক্ষেত্রে মিলাইতে হইবে। বড়কেই ডাকিব, ছোটর আদর করিব না,—ধনীর সম্মান করিব, দরিদ্র নাই বা আসিল, —জ্ঞানী প্রতিভাশালীর গুণ গাইব, মূর্খ দূরে রহিলই বা—এ অনুদার ভাব, এ কলঙ্কের কালিমা হিতৈষীদিগের হৃদয়ে স্থান পাইলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। একটু স্থান পাইয়াছে বলিয়া আমরা কিছু দুঃখিত হইয়াছি। ঘৃণায় ঘৃণা, প্রহারে প্রহার, নিন্দায় নিন্দা প্রচার করিতেই যদি মতি থাকিয়া যাইল, তবে আর কি হইল ! তবে আর এ মহাযজ্ঞের আয়োজন কেন ? তবে আর এ হই-চই, এ নাচুনি, এ আস্ফালন কেন ? কেবল উদরতা, কেবল গভীর প্রেম —কেবল স্বার্থত্যাগ,এ মহাযজ্ঞের অবলম্বন ;—যদি এসকল জীবনের অবলম্বন না হয়, তবে এই মহা আন্দোলনরূপ ব্যাপার বৈষম্যের কোলাহলে ডুবিয়া যাইবে.ভবিষ্যতে কেহ চিহ্নও দেখিবে না। তাই বলি,মিশিয়াছ ত আরও মিশিতে থাও,—ভেদাভেদ ভুলিয়া পরস্পরে প্রাণে প্রাণে ডুবিয়া যাও। ভারতের আকাশে আবার একতার জয় কোটী কোটী কণ্ঠে ঘোষিত হউক।

আমাদের আরো একটি দুঃখের কারণ আছে, তাহা বলিয়া রাখাই ভাল। আনন্দের দিনে দুঃখকে স্মরণ করা একান্ত উচিত। আমাদের আর একটি দুঃখ এই—এই মহাসভায় এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কেহই, দেশের দুর্দ্দশা অপনয়নের জন্য, গবর্ণমেণ্টের নিকট কেবল আবেদন প্রেরণ করা ভিন্ন, আর কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারিলেন না! গবর্ণমেণ্টত অনেক করিয়াছেন—এই হতভাগ্য দেশের জন্য আমাদের নিজেদের কি কিছুই করিবার নাই? গবর্ণমেণ্টের মুখ-তাকান ভিন্ন আর কি গত্যন্তর নাই? একথার আলোচনা এ মহাসভায় হইল না!! আমাদের এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। অন্যান্য সভায়ও যেমন হইয়া থাকে, এ সভায়ও তাহাই হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের খোসামুদী করা যেন আমাদের দেশের সমস্ত সভাগুলি সংস্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য! লর্ড ডফারিণকে অপদার্থ লোক বলিয়া যেখানে সেখানে গালিগালাজ দিতেছি, কিন্তু আবার তাঁহারই দ্বারে দলবল লইয়া অভিনন্দন দিতে সাজিয়া উপস্থিত হইতেছি! তাঁহার মুখের তীব্র ভর্ৎসনা না শুনিলেই যেন নয়! আমরা আশা করিয়াছিলাম, এতগুলি ভারতের কৃতবিদ্য ব্যক্তির সম্মিলন যেখানে, সেখানে আমরা অন্যরূপ কার্য্যের পরিচয় পাইব। কিন্তু সে আশা গিয়াছে। "ইহা কর, তাহা কর"—গবর্ণমেণ্টকে এবম্প্রকার উপদেশ দিবার জন্যই যেন এই মহাসমিতির মহা অধিবেশন হইয়াছিল! অন্যের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সহায়তা করার অপেক্ষা সহজ কার্য্য আর কিছুই নাই, এবং ইহাপেক্ষা মুর্খের কার্য্যও আর হয় না। আমি কিছু করিব কি না, সে কথা ভাবিবও না, কেবল বলিব—তুমি ইহা কর, তুমি তাহা কর। কেমন সোজা ব্রত! আমার কি কর্ত্তব্য আছে, তাহা একবারও ভাবিয়া কার্য্যে গা ভাসাইব না;—তোমার বিবেকবুদ্ধির স্ফুটনের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিব। কেমন মুর্খের কাজ!! আমাদের একমাত্র দুঃখ এই—যাহা আপামর সাধারণ সকলেই করে,—এই মহাসমিতির মহা মহা কৃতবিদ্যগণ তাহাই করিলেন!! গবর্ণমেণ্টকে সংশোধনের সংবাদ শ্রবণ করানই যেন এই মহাসমিতির প্রধান উদ্দেশ্য!! এই ক্ষণস্থায়ী যৎসামান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, এই মহাব্যাপার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আমরা একটুও বুঝি না। বুঝি না বলিয়াই দুঃখ করিতেছি। মুর্খের দুঃখ করা ভিন্ন আর কি আছে!!

এই সকল কথা বলার পরে কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে "তুমি কি করিতে বল? একটার দোষ দেখাইতে আসিয়াছ, একটা পথ দেখাও না কেন? "একথার উত্তর দিতে আমরা খুব প্রস্তুত নই, কারণ কে বা কবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে? কেবা কবে আমাদের উত্তর শুনিয়াছে? শুনুক বা না শুনুক, আজ বলিলেই বা দোষ কি? কাঙ্গালের প্রলাপ বিজ্ঞের কর্ণে পৌঁছিবে না, তা জানি: কিন্তু তবুও বলি না কেন? যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে—ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে তুমি কি করিতে বল? এককথায় আমার উত্তর এই—সাধারণের সুশিক্ষা বিস্তার করিতে বলি এবং শিক্ষিতগণের চরিত্রগঠনে সচেষ্ট হইতে বলি। সিবিলসার্বিসে দেশীয় অনেক লোক ঢুকিলে ভারতের মঙ্গল হইবে, অস্ত্র আইন উঠিয়া যাইলে কৃষকের শূকরের ভয় যাইবে, জুরীর বিচার সর্ব্বত্র চলিলে অপরাধীর প্রাণ বাঁচিবে, আইন দ্বারা আসাম কুলীর দুর্দ্দশা ঘুচাইলে পরম উপকার হইবে, এ সকল খুব ভাল কথা। কিন্তু সকলের পূর্ব্বে সুশিক্ষা ও চরিত্র চাই। সুশিক্ষা ও চরিত্র ভিন্ন মানুষ পশু। সমস্ত ভারতে যদি মিলনের কোন ক্ষেত্র থাকে,তবে তাহা এই সুশিক্ষারূপ ক্ষেত্র। যে শিক্ষার প্রভাবে আজ বাঙ্গালী পঞ্জাবী, হিন্দু মুসলমান মিলিয়াছে, এই শিক্ষা যদি আরো বিস্তৃত হয়, আরো উদার হয়, তবেই একতা এক দিন সম্ভব হইবে। এখন কেবল সুশিক্ষাই চাই। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিস্তারের জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন; স্বদেশী দুই দশ জন লোকও যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন,সন্দেহ নাই। কিন্তু সে শিক্ষাতে অনেক দোষ আছে:—সে শিক্ষা নীতিহীন শিক্ষা। ভবিষ্যতে জাতীয় মহাসমিতি কেন ভারতের কল্যাণের জন্য সুশিক্ষার ভার হাতে লইবে না,আমরা বুঝি না। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কেমন সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে.এই মহাসমিতি পঞ্জাবের,শিক্ষার ভার হাতে লইলে দোষ কি? দারিদ্র্য বল,আর চরিত্রহীনতা বল,ইহার মূল কারণ সুশিক্ষাহীনতা। কেবল সৎ শিক্ষা চাই। কুশিক্ষা মোটেই চাই না। যে শিক্ষায় মানুষ মানুষ হয়, সেই শিক্ষা চাই। সকল সংস্কার আপনিই সংসিদ্ধ হয়—এই শিক্ষা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম ও নীতিহীনতা ভারতকে বড়ই মলিন করিয়া ফেলিতেছে, ইহারও মূল কারণ সৎশিক্ষার অভাব। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা অসম্পূর্ণ, তাহা অর্থকরী বিদ্যা, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। তাহা ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত শিক্ষা। এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া

ভারতের মহা অনিষ্ট হইয়াছে। সেই জন্য, শিক্ষার ভার ভারতের নিজের হাতে গ্রহণ করা একান্ত উচিত। এই মহা সভা যদি এখন জাতীয় শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন, মনে হয়, ভারতের শুভদিন আরো নিকটবর্ত্তী হইবে।

আরো কর্ত্তব্য কার্য্যের নাম করিতে পারি ; কিন্তু তাহা বলিয়া আজ আর কোন ফল নাই। এই অভাবপূর্ণ বিশাল ভারতক্ষেত্রে কার্য্য অনেক, কাজের লোকেরই কেবল অভাব। এত কার্য্য, এত অভাব থাকিতে যাঁহারা কিছু কর্ত্তব্য খুঁজিয়া পান না, তাঁহারা যে কিরূপ হিতৈষী, তাহা বুঝি না। কেবল বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইলে দেশের উপকার করা যায় না। খাটিয়া খাটিয়া হাজার হাজার লোকের মরিয়া যাওয়া চাই, তবে ত দেশ উদ্ধার হইবে। এত কাজ থাকিতেও এই মহাসভা আপন হাতে কোন কার্য্য-সমাধার ভার রাখেন নাই বলিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। এ দুঃখ রাখিবার আর ঠাঁই নাই।

যতদিন একতার বলে স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হয়, রাজনীতি ততদিন কল্পনা। একতার মূলে শিক্ষা, শিক্ষার মূলে ধর্ম্ম ও নীতি, নীতির মূলে চরিত্র, চরিত্রের মূলে স্বাধীনতা। সৎশিক্ষা নাই, সুনীতি নাই, চরিত্র নাই, কিন্তু স্বাধীনতা আছে, পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত নাই। নিহিলিষ্ট, সোসিয়া-লিষ্টগণ তাহা হইলে এত দিন জগতে স্বাধীন হইতে পারিত! ফরাশী-বিপ্লবের ইতিহাস তাহা হইলে রূপান্তরিত হইত! নেপোলিয়নের রাজ্য-বিস্তারের প্রভা তাহা হইলে চির উজ্জ্বল থাকিত! ওয়াসিংটনই বল, আর ম্যাটসিনিই বল, গ্যারিবলিডই বল, গ্লাডষ্টোনই বল, আর ব্রাইটই বল, ইঁহারা নীতি ও চরিত্রের মহত্বে স্বীয় স্বীয় প্রদেশে ধর্ম্মের ও নীতির সমতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন এবং পারিতেছিলেন বলিয়াই আমেরিকা, ইটালি, ইংলণ্ড দারুণ ধর্ম্মহীনতারূপ বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়াও শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে। হাজার হাজার লোকের ধর্ম্মহীনতার বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের জলন্ত বিশ্বাস পৃথিবীর সমতা রক্ষা করিয়াছে। হাজার হাজার লোকের বিরুদ্ধে একা ম্যাটসিনির শক্তি কার্য্য করিয়া জয়ী হইয়াছে। হাজার হাজার লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়া বিশ্বাস ও চরিত্রবলে মহম্মদ পৃথিবীকে অধি-কার করিয়া রাজ্যবিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। অতএব ধর্ম্মনীতি ভুলিয়া যে একতার কথা বলিতে চাও, তাহা এ জগতে অসম্ভব। তাহা কখনও হইবে না।

মানুষকে চরিত্রবান না করিতে পারিলে একতা, শান্তি, সাম্য এবং স্বাধীনতা অসম্ভব ব্যাপার। চরিত্রহীনতা বশতঃই নিপোলিয়নের মহাপতন হইয়াছে। (১) সকল সংস্কারের মূলে সৎশিক্ষা ও চরিত্র না থাকিলে কিছুতেই মঙ্গল নাই। এই জন্যই বলি, শিক্ষাবিস্তার ও চরিত্রের পথ উন্মুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করা, প্রতি হিতৈষীর একান্ত উচিত। এক ভিন্ন দুটী পথ নাই। স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ লোকের শিক্ষার অভাবে এবং বর্ত্তমান ধর্ম্মনীতিহীন শিক্ষার দোষেই ভারতে পশুত্বের অভিনয় হইতেছে। জিতেন্দ্রিয়তা এক অতুল মহাশক্তি। এই শক্তি-সাধনে সিদ্ধি লাভে যত্ন হও, সৎশিক্ষা বিস্তাররূপ মহাব্রত গ্রহণ কর। আবার স্বাধীনতা এবং তৎসহ রাজনীতির যুগ অভ্যুদিত হইবে। বৃথা হই-চই পূর্ণ আবেদন দ্বারা ইংরাজনীতির সংস্কার-ব্রত পরিহার করিয়া, একবার আপন আপন জাতির সংস্কার কার্য্যে, এই মহাসভা, সময় থাকিতে প্রবৃত্ত হউন। খোসামুদী ও আবেদন প্রেরণের হুজুগ ছাড়িয়া প্রকৃত কার্য্যস্রোতে গা ভাসাইয়া দিন। আবার ভারতে শুভ দিনের উদয় হইবে। নচেৎ আজ না হইলেও, দশ বিশ বৎসর পরে ইহার কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা বা একতা সুদূর-পরাহত হইবে। যে কারণে সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতাকে শত শত বৎসরের পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছে, সেই কারণে, জাতীয় মহাসমিতিও ভারতের উন্নতিকে শতাব্দীর পশ্চাতে ফেলিবে। যখন যাহার প্রয়োজন, তখন তাহাই করা উচিত। এখন চরিত্র লাভ, এখন সুশিক্ষাবিস্তার, এখন দেশ-সংস্কার, এখন ভাষা-সংস্কার করাই একান্ত উচিত। এই পথ ধরিয়া চলিলেই তবে মহামিলনের দিন,—স্বাধীনতার দিন আসিবে। আগের কাজ আগে, না পরের কাজ আগে?

---

(1) "It was not Bonaparte's fault. He did all that in him lay, to live and thrive without moral principle. It was the nature of things, the eternal law of the man and the world, which balked and ruined him; and the result, in a Million experiments, would be the same." Emerson on Napoleon.

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত।

মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত আর নাই। ১২৯৩ সালের প্রথম নিদারুণ ঘটনা—অক্ষয়কুমারের স্বর্গারোহণ। বঙ্গবাসী ১২৯৩ সালকে কখনও ভুলিতে পারিবে না। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বঙ্গ-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। এই দিন বাঙ্গালার অমূল্য নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে,—সাহিত্য-বাজারে রোদন ধ্বনি উঠিয়াছে।

বঙ্গদেশে প্রকৃত আড়ম্বরশূন্য মহৎ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। যে দুই চারি জন লোকের জীবন লইয়া আমরা গৌরব করিতে পারি—৺অক্ষয়কুমার তাঁহাদের মধ্যে এক জন। অক্ষয়কুমারের জীবন নিতান্ত আড়ম্বরশূন্য। এমন কি, বাঁচিয়া থাকা কালীন যাঁহার নামের বিশেষ কোন মহিমা লোকে বুঝিত না ;—আজ তাঁহার জন্য ঘরে ঘরে আলোচনা—ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল। পবিত্রাত্মা অক্ষয়কুমারের জন্য অশ্রুপাত করিয়া বঙ্গভূমি আজ পবিত্র হইয়াছে।

দরিদ্রের গৃহে অমরাত্মা বিনা আড়ম্বরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিনা আড়ম্বরে দেশের জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিয়া পীড়িত হইয়া নির্জ্জন গৃহে রোগের সেবা করিতে ছিলেন—বিনা আড়ম্বরে অমরাত্মা অমর ধামে বিশ্রাম লাভ করিলেন। বঙ্গের সুসন্তান আজ মায়ের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। স্বর্গে আজ আনন্দধ্বনি, কিন্তু বঙ্গে আজ হাহাকার !

আমরা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, দেশের কোন কোন সুযোগ্য সম্পাদক তাঁহার ধর্ম্মমত লইয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত ছিল, স্বধর্ম্ম পালন করাই লোকের কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্ম—পিতামাতার বা দেশের ধর্ম্ম নহে। মানব প্রকৃতি অসংখ্য—ধর্ম্মও অসংখ্য, মতও কাজেই অসংখ্য। প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, স্বধর্ম্ম, স্বমত রক্ষা করা। এই মহাত্মাও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মের সহিত কাহারও ধর্ম্মের মিল নাই, মিল থাকিতে পারেনা। প্রত্যেকের ধর্ম্মই পৃথক পৃথক। একটু সূক্ষ্ম ভাবে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, প্রকৃত ধর্ম্মে দল নাই—সম্প্রদায়

---

* ১২৯৩ সালের আষাঢ় মাসে লিখিত।

নাই—কলহ নাই, বিবাদ নাই—তাহা উদার। স্বধর্ম্ম পালন করাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। কিন্তু "স্ব" শব্দকে এখন পিতামাতা বা পূর্ব্বকালের লোকদিগের স্থলে প্রয়োগ করা হইতেছে। ইহা কথনই সঙ্গত নহে। আপন আপন শক্তির বিকাশই যখন ধর্ম্ম, তখন অন্যের ধর্ম্ম কখনই আমার লক্ষ্য হইতে পারে না। এই স্থানে সকলেরই উদারতা অবলম্বন করা উচিত। বিশেষত এই শোকের দিনে, ঐ প্রকার কথা প্রয়োগ করা নিতান্তই রুচিবিরুদ্ধ। অক্ষয়কুমার স্বধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব। তোমার কিম্বা আমার ধর্ম্ম পালন করিলে তিনি কথনই মহৎ লোকের আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন না; তিনিও তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া যাইতেন। আপন পথে, অসঙ্কুচিত চিত্তে যিনি চলিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি। অক্ষয়কুমার এ সম্বন্ধে একজন প্রকৃত বীর। যশ নিন্দা, মান অপমান, সকল তুচ্ছ করিয়া. অবিচলিতভাবে তিনি আপন লক্ষ্যপথে চলিয়াছিলেন। সেই জন্যই আমরা তাঁহার নামের গৌরব করি। আপন পথে চলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, এই মহাত্মার তিরোধানে আজ বঙ্গবাসী এত শোককাতর। আপন মনে আপন পথে যে চলিতে পারে, সেইত মানুষ। মহাত্মা অক্ষয়কুমার প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিজয় নিশান বঙ্গভূমিতে প্রোথিত রাখিয়া প্রকৃত বীর বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। ধন্য বঙ্গবাসী, ধন্য অক্ষয়কুমার।

তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় মহত্ত্ব—সাহিত্যজগতে। একশ্রেণীর লোকের ন্যায় তিনি লোকের রুচি অনুসারে অন্যের মুখ চাহিয়া পুস্তক লেখেন নাই, বরং রুচি মার্জ্জিত করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। লোকের রুচির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অন্যকে কত কষ্ট পাইতে হয়, কিন্তু দেখ, প্রকৃত বীর অক্ষয়কুমারকে সে জন্য কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই; আপন ভাষায় আপন মার্জ্জিত রুচিপূর্ণ জীবনের মহামূল্য কথা সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার পুস্তকের কত আদর! তাঁহার এক একখানি পুস্তক ধর্ম্মজগতে এক একখানি অমূল্য রত্নবিশেষ। সাহিত্য ও ধর্ম্মকে একত্রিত করিয়া এই মহাত্মাই বঙ্গভূমিকে এক উজ্জ্বল পরিচ্ছদ দিয়া গিয়াছেন। যতদিন ভাষার আদর থাকিবে, যতদিন ধর্ম্মের নামে লোকের মন ভিজিবে, ততদিন এই মহাত্মার নাম অক্ষয়। কাহার সাধ্য—অক্ষয় রত্নভাণ্ডারকে বঙ্গদেশ হইতে তিরোহিত করিবে? অক্ষয়কুমার—এখানেও অক্ষয়;—পরলোকেও।

অক্ষয়। দেশ, কালের অতীত অক্ষয় অমর-ধামে—স্বর্গ-মর্ত্ত্যে তাঁহা কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছে। আর কিছু স্মৃতি চিহ্ন স্থাপিত হয়, ভাল না করিলেও কোন ক্ষতি নাই—আপনার মহত্বেই মহাত্মা চিরকালের জ অক্ষয় হইয়া রহিয়াছেন। ধন্য বঙ্গভূমি, ধন্য অক্ষয়কুমার, ধন্য বঙ্গসাহিত্য ধন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ধন্য উপাসক সম্প্রদায়!

মহাত্মা অক্ষয়কুমারের তৃতীয় মহত্ত্ব, বেদের অভ্রান্তবাদ হইতে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করা। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে যে কয়েকজন মহৎ ব্যক্তির নাম চি উজ্জ্বল, মহাত্মা অক্ষয়কুমার তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইঁহার অভ্যুদয় না হই ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সংস্কৃত মত সকল শতাব্দীর পশ্চাতে লুক্কায়িত হইত অক্ষয়কুমার বীরের ন্যায় ধর্ম্মমতের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হইয়াছেন।

প্রকৃত মহৎ লোকের জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশ হওয়া অনেক কা সাপেক্ষ। অক্ষয়কুমারের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিবার দিন এখনও বহুদূরে। যখ উপযুক্ত সময় আগমন করিবে—তখন ভারতের আর্য্যঋষিগণের পার্শ্বে এ মহাত্মার নাম—প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত বীর, প্রকৃত স্বার্থত্যাগী হিতৈষী বলিয়া পূজিত হইবে। তখন ঘরে ঘরে এই মহাত্মার নাম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহি পূজিত হইবে।

সমাপ্ত।